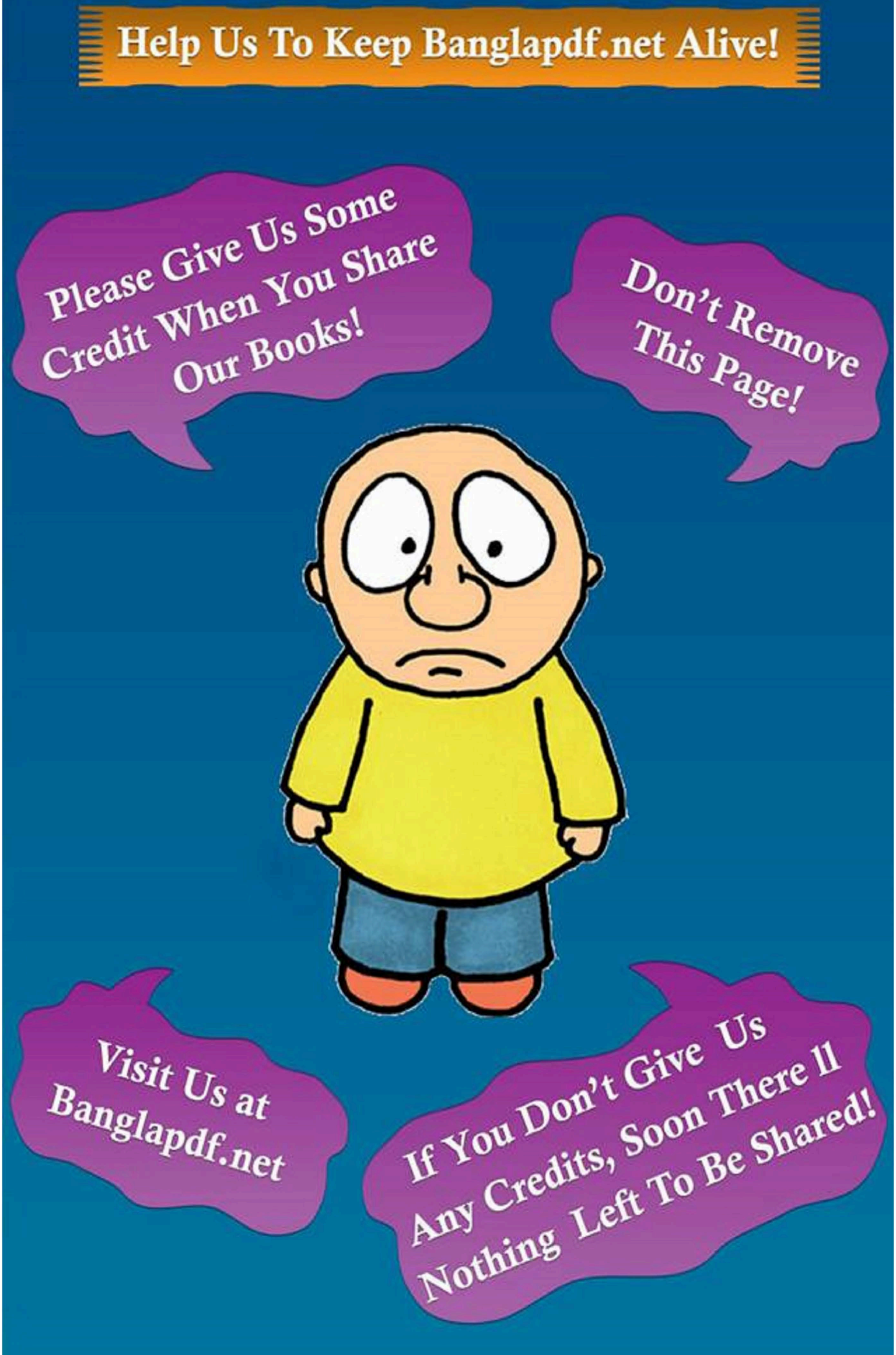

মাসুদ রানা
সাউদিয়া ১০৩
দুইখণ্ড একত্রে
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী



Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সাউদিয়া ১০৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

আর সবার মত নয় সে। সদ্য তৈরি মর্গে কর্তব্যরত ডাক্তার ব্যাপারটা সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলেন। লাশ দুটো দেখার সময় তার চেহারায় কোন ভাব থাকল না। আর সবাই শোকে কাতর হয়ে পড়েছে, কেউ কেউ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু এই লোকটা একদম নির্লিপ্ত। অদ্ভুত একটা স্থির, অচঞ্চল ভাব রয়েছে তার মধ্যে, প্রয়োজন ছাড়া শরীরের কোন অংশ এক চুল নড়ে না। তার গালে দুটো কাটা দাগ, একটা বাঁ চোখের নিচে, আরেকটা কপালের ডান দিক ঘেঁষে। সারা মুখে দিন দু'য়েকের না কামানো দাড়ি, গায়ের রঙ রোদে পোড়া তামাটে। সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি কাড়ে চোখ জোড়া। মায়াভরা দুই চোখের মাঝখানে একটু যেন বেশি দূরত্ব, ভারি পাতা—সরু হয়ে আছে, যেন সিগারেটের ধোঁয়া এড়াবার চেষ্টা করছে, অথচ লোকটা এই মুহূর্তে ধূমপান করছে না। হয়তো কখনোই করে না।

দশ বছরের মেয়েটিকে দেখল সে, গায়ে একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত নেই। টেবিলে সে শুয়ে আছে, যেন শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। এমন কি তার লম্বা কালো চুলও পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় লোকটার মনে কি ঘটে যাচ্ছে বোঝা গেল না। এরপর সে সরে এসে মহিলার লাশটা দেখল। প্রথমে মুখ ও মাথা থেকে সরানো হলো চাদরটা, তারপর গোটা শরীর থেকে। চাদরের নিচে লাশের গায়ে কিছু নেই। সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। চাদরটা আবার শরীরের ওপর টেনে দিল সে।

ডাক্তার বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে, স্যার; মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। কেউই খুব বেশিক্ষণ কষ্ট পায়নি।'

পরে এক সময় ডাক্তার চিন্তা করবেন, লোকটাকে তিনি 'স্যার' বললেন কেন। কাউকে স্যার বলা তো তাঁর অভ্যাস নেই।

ইউনিফর্ম পরা একজন পুলিস এগিয়ে এল, হাতে প্যাড। মহিলার লাশের দিকে একবার তাকাল সে, তারপর বলল, 'ওঁর অভিভাবকরা লাশ দুটো সনাক্ত করলেও, সবাই এত মুষড়ে পড়েছিলেন যে সই করানো হয়নি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন, স্যার...'

সই করে প্যাডটা ফিরিয়ে দিল সে, ডাক্তার ও পুলিসের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল, তারপর অন্যান্য লাশের লম্বা সারির মাঝখান দিয়ে হেঁটে চলে গেল।

ডাক্তার ও পুলিস তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকল। লোকটা দীর্ঘদেহী। তার হাঁটাটা অদ্ভুত, প্রথমে মাটি ছোঁয় পায়ের বাইরের অংশ বা কিনারাগুলো। দু'জনেই ওরা তার চেহারা চিরকাল মনে রাখবে। প্যাডের ওপর চোখ বুলাল

পুলিস, বলল, 'ইমরুল হাসান। তারমানে মুসলমান। তাহলে আত্মীয় হতে পারে না। মহিলা আর বাচ্চাটা তো খ্রিস্টান।' একটু থেমে আবার বলল সে, 'দেখে কিন্তু মনে হলো না···মনে হলো না···' সঠিক শব্দ খুঁজে না পেয়ে চুপ করে গেল।

'হ্যাঁ,' সায় দিয়ে বললেন ডাক্তার। 'চেহারায় বা আচরণে কিছুই প্রকাশ পেল না।'

মর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, ঘাড় ফিরিয়ে ছোট্ট একটা ভিড়ের দিকে তাকাল লোকটা। এখানেও একজন ডাক্তার রয়েছেন, টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে প্রৌঢ়া এক মহিলার লাশ। চাদরে ঢাকা লাশের ওপর মাথা ঠেকিয়ে চিৎকার করে কাঁদছে এক ছেলে। ষোলো কি সতেরো বছর বয়েস হবে, চেহারা দেখে মনে হলো ভারতীয় বা বাংলাদেশী। ডাক্তার, দু'জন পুলিস ও একটা মেয়ে লাশের ওপর থেকে টেনে তোলার চেষ্টা করছে তাকে। ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার মিল আছে চেহারায়, আবার লাশের সঙ্গেও ওদের দু'জনের চেহারার মিল আছে। ওরা বোধহয় ভাই-বোন, লাশটা সম্ভবত ওদের মায়ের। দীর্ঘদেহী ইমরুল হাসান একবার তাকিয়ে সবই লক্ষ করল, তবে থামল না, বেরিয়ে গেল মর্গ থেকে।

সারা জীবন চাষবাস করেছে, কঠিন পরিশ্রমে অভ্যস্ত, কিন্তু অন্তরে জো ফ্রেজার অত্যন্ত আবেগপ্রবণ মানুষ। ছোট্ট স্কটিশ শহর মিড্‌লটনের কাছাকাছি দেড়শো একর পাহাড়ী জমিনের ওপর ভেড়া চরায় সে। সাউদিয়া এয়ারলাইন্সের জাম্বো জেট ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে বিস্ফোরিত হবার পর অনেকগুলো লাশ তার জমিতে ছড়িয়ে পড়ে, ভেড়াগুলোর মাঝখানে, সেগুলোর সঙ্গে প্লেনটার প্রায় অক্ষত নোজ কোন-ও ছিল। সেই রাত থেকে তার দুঃস্বপ্ন শুরু হলো, জীবনের বাকি দিনগুলো এই আতঙ্ক তাকে বয়ে বেড়াতে হবে।

ঘটনার তিন দিন পর তার ফার্মে এল লোকটা। এই ক'দিন ধরে বহু লোক আসছে, লাশের বর্ণনা দিয়ে জানতে চেয়েছে কোনটা কোথায় পাওয়া গেছে। ছোট্ট মেয়েটার আত্মীয়-স্বজনরাও আজ সকালে এসেছিল, কেউ তেমন কথা বলতে পারেনি, শুধু কান্নাকাটি করেছে। কাজেই আরেক লোক এসে মেয়েটার কথা জানতে চাওয়ায় একটু অবাকই হলো জো ফ্রেজার। লোকটার সঙ্গে বিষণ্ণ চেহারার একজন পুলিস রয়েছে। মর্গের ডাক্তারের মত ফ্রেজারও উপলব্ধি করল, এই লোকটা আর সবার মত নয়। আগে যারা এসেছে তাদের সঙ্গে সে ও তার স্ত্রীও কান্নাকাটি করেছে।

কিন্তু এই লোকটা কাঁদছে না।

পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর পুলিস বলল, 'বাচ্চা মেয়েটাকে যেখানে পাওয়া গেছে, জায়গাটা একটু দেখিয়ে দেবেন? লাল জাম্পস্যুট পরা মেয়েটার কথা বলছি।'

মাঠের ওপর দিয়ে আধমাইল হেঁটে এল ওরা। শীতকাল, তার ওপর উত্তুরে বাতাস বইছে। পুলিস ও খামার মালিকের গায়ে গরম কাপড় তো আছেই, গ্রেটকোটও পরে আছে তারা। লোকটার পরনে গ্রে রঙের ট্রাউজার, উলেন চেক শার্ট, আর একটা ডেনিম জ্যাকেট; করুণ হাল দেখে মনে হলো এ-সব পরেই ঘুমিয়েছিল। দূরে দেখা গেল সৈনিকদের লম্বা একটা সারি ওদের দিকে পিছন ফিরে

ধীর পায়ে হাঁটছে, প্রত্যেকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছে পায়ের সামনে জমিন।

কয়েকটা ছোট ঝোপের সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। আঙুল তুলে দেখাল খামার মালিক। 'মেয়েটাকে আমি এখানে পাই। এই ঝোপ-গুলোর ভেতর। প্রথমে আমি তার লাল কাপড় দেখি।' তার গলা খাদে নেমে গেল, 'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তাৎক্ষণিক...মানে, কিছুই সে অনুভব করেনি।'

লোকটা মাঠের চারদিকে একবার চোখ বুলাল। 'আপনার ভেড়াগুলো নিশ্চয় খুব ভয় পেয়ে যায়,' মৃদু গলায় বলল সে।

এই কথার খেই ধরে যে আলাপটুকু হলো, সারা জীবন তা ভুলবে না জো ফ্রেজার। প্রায় দশ মিনিট খামার ব্যবসা ও চাষাবাদ সম্পর্কে কথা বলল ওরা। লোকটা এ-সব বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখে। চেহারা দেখে ল্যাটিন আমেরিকান মনে হয়, অথচ ইংরেজি উচ্চারণে কোন টান নেই। খুব মেপে কথা বলে সে, গলার আওয়াজটা ভারি ও ভরাট। বেশ কয়েকবারই চোখ তুলে তার দিকে তাকাল ফ্রেজার, লোকটার দৃষ্টি ঝোপগুলোর ওপর যেন চুম্বকের মত আটকে গেছে। হঠাৎ করে ফ্রেজার পুরো দৃশ্যটা আরেকবার পরিষ্কার দেখতে পেল। ঝোপের ভেতর লাল রঙ দেখে দু'হাতে ডালপালা সরিয়ে ব্যস্তভাবে এগোয় সে, খানিক দূর এগোতেই দেখতে পায় মেয়েটাকে। গায়ে কাটা-ছেঁড়ার কোন দাগ নেই দেখে সে ভেবেছিল বেঁচে আছে। দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নেয় মেয়েটাকে, মাঠের ওপর দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে ছুটে চলে আসে ফার্মহাউসে। আগে থেকেই একজন ডাক্তার অপেক্ষা করছিলেন ওখানে, মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরীক্ষা করেই মাথা নাড়লেন তিনি। মেয়েটার চেহারায় যে স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাব ছিল, জীবনে কোনদিন ভুলবে না ফ্রেজার। সব কথা মনে পড়ে যেতে চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল, ভেঙে গেল গলাটা।

তার কাঁধে হাত রাখল লোকটা, আলতোভাবে নিজের দিকে ঘোরাল। ধীর পায়ে ফার্মহাউসের দিকে এগোল তারা।

ফার্মহাউসে পৌঁছে ফ্রেজারের স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাল লোকটা। 'ওর নাম ছিল বৃষ্টি। বৃষ্টি ছিল আমার বন্ধুর মেয়ে। নামটা আমার দেয়া। আপনারা বৃষ্টির জন্যে যা করেছেন, আমি কোনদিন ভুলব না।'

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চড়বে লোকটা, এই সময় আবার তাদেরকে দেখতে পেল। সেই একই কাপড়ে রয়েছে ছেলেটা, এখনও কাঁদছে সে। তাকে জড়িয়ে ধরে আছে মেয়েটা, গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়ার বৃথা চেষ্টা করছে। কয়েক পা এগিয়ে এসে ওদের সামনে দাঁড়াল সে, ভাল করে দেখল দু'জনকে। ছেলেটার বয়েস যা আন্দাজ করেছিল তাই, ষোলো কি সতেরো। মেয়েটার একটু বেশি, ছাব্বিশ কি সাতাশ। ভাই-বোন দু'জনেই খুব সুন্দর। 'পরশু মর্গে বোধহয় আপনাদের মাকে দেখলাম, তাই না?' তরুণীকে জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বী...ইয়েস,' বলল তরুণী, চেহারায় ইতস্তত একটা ভাব ফুটে উঠল।

'আপনারা বাঙালী?' লোকটা জানতে চাইল।

'জ্বী...আপনাকেও আমার তাই মনে হয়েছে।'

ছেলেটাকে ইঙ্গিতে দেখাল ইমরুল হাসান। 'আপনার ছোট ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে কাঁদতে নিষেধ করুন। পুরুষমানুষদের কাঁদতে হয় না। শুধু আপনাদের দু'জনকেই দেখছি, আর কেউ নেই? আপনার বাবা···?'

বোনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এতক্ষণে মুখ তুলল ছেলেটা। 'বাবা বেঁচে থাকলে ওদেরকে ছাড়ত না··· ঠিকই প্রতিশোধ নিত···,' তারপর আবার ফুঁপিয়ে উঠল সে।

'প্রতিশোধ তুমি নিতে চাও না?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

হঠাৎ কান্না ভুলে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকল ছেলেটা। 'কিভাবে নেব? কারা দায়ী, কোথায় তাদের পাব, কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়, কিছুই তো আমি জানি না!'

'চেষ্টা করলে সবই জানা যায়,' বলল লোকটা, পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বের করল। 'যদি কথা দাও আর কাঁদবে না, তাহলে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারি। এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো।' কথা শেষ করে লোকটা আর দাঁড়াল না, গাড়িতে উঠে চলে গেল।

পরে, সেদিনই রাতে, জো ফ্রেজার তার স্ত্রীকে বলল, 'উনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন।'

'কে?' জিজ্ঞেস করল তার স্ত্রী।

'লাল সুট পরা মেয়েটার বন্ধু। যে ভদ্রলোক তোমাকে ধন্যবাদ জানালেন।'

'ওর তো মাত্র দশ কি এগারো বছর বয়েস! ওই ভদ্রলোক ওর বন্ধু হয় কি করে? কি বলছ?'

'উনি তো তাই বললেন। বললেন, বৃষ্টি আমার বন্ধু ছিল। আসলে বন্ধুর মেয়ে। বাপ মারা যাবার পর মেয়েটাই ওঁনাকে বলে, এখন থেকে আমিই তোমার বন্ধু। বৃষ্টি নামটাও তো ওঁরই দেয়া।'

'বৃষ্টি নামের অর্থ কি গো?'

'তা তো আমি জিজ্ঞেস করিনি। তবে শব্দটা খুব মিষ্টি, তাই না?'

'তা তোমাকে উনি কেন সান্ত্বনা দেবেন?'

'বৃষ্টি আর বৃষ্টির আন্টিকে উনি খুব ভালবাসতেন। বললেন, ওরা ছিল আমার হৃদয়ের একটা অংশ। অথচ দেখো তারপরও উনি আমাকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, আপনি অনেকগুলো ভেড়া হারিয়েছেন, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত।'

স্বামীর কান্না পাচ্ছে বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো মহিলা, বুকে টেনে নিয়ে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়।

খালি একটা প্ল্যান্টে অস্থায়ী অফিস সাজিয়েছেন মাইকেল ম্যানডেক্স, এটার মালিক কোন এক কেমিকেল কোম্পানী। স্কটল্যান্ড পুলিস বিভাগের একজন সিনিয়র অফিসার তিনি, আর সাউদিয়ার ফ্লাইট একশো তিন তাঁর এলাকায় বিধ্বস্ত হওয়ায় তদন্তের দায়িত্ব তাঁকেই দেয়া হয়েছে। গত দু'দিনে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমাবার সুযোগ পেয়েছেন তিনি। শরীরটা আর চলতে চাইছে না, মাথার ভেতরটাও ফাঁপা লাগছে। তাঁর ডিস্ট্রিক্ট সাধারণত শান্তই থাকে, গোটা ব্রিটেনের মধ্যে অপরাধের হার

সবচেয়ে কম এখানে, তবু এমন একজন পুলিসও পাওয়া যাবে না আইন-শৃংখলার দিকে যার কড়া নজর নেই। ক্লান্তিতে চোখ খোলা রাখা যাচ্ছে না, তারপরও তালিকাগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলাচ্ছেন তিনি। প্যাসেঞ্জার লিস্ট, নিকটতম আত্মীয়ের লিস্ট, আইডেনটিফিকেশন লিস্ট—এর যেন কোন শেষ নেই। পুলিসের সঙ্গে এল লোকটা, তাঁর ডেস্কের সামনে দাঁড়াল। মুখ তুলে তাকালেন তিনি। আগন্তুককে দেখে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অচেনা একজন লোককে দেখে কেন তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন, নিজেও বলতে পারবেন না। পুলিসটাই পরিচয় করিয়ে দিল। লোকটার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন তিনি। বললেন, 'সত্যি আমি ভয়ানক দুঃখিত। আপনাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। আপনার নামটা শোনার পর একটা কথা মনে পড়ছে। আবর্জনা থেকে আমরা একটা ফটো পেয়েছি। মেয়েটার··· বিরিস্টির ফটো। তাতে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা, "আমার বন্ধু ইমরুল হাসানকে।" বোঝাই যায়, মেয়েটা তার এই ছবি আপনাকে প্রেজেন্ট করত···'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল লোকটা।

ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখালেন ম্যানডেক্স। 'বসুন না, প্লীজ।'

লোকটা বসল, তরুণ পুলিস কনেস্টবল ওদের দিকে পিছন ফিরল। 'কি ঘটেছে, কোন ধারণা করতে পারছেন?' প্রশ্ন করল লোকটা।

মাথা নাড়লেন ম্যানডেক্স। 'আরও সময় দরকার,' জবাব দিলেন তিনি। 'প্লেনটা টুকরো টুকরো হয়ে বিশাল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশাল জায়গা মানে অন্তত দু'শো বর্গ মাইল। সব এক জায়গায় জড়ো করতে কয়েক হপ্তা সময় লেগে যাবে। তার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

এত কথার উত্তরে যে শব্দটা উচ্চারণ করা হলো, শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন ম্যানডেক্স।

'বোমা।'

শুধু যে শব্দটা বিস্মিত করল ম্যানডেক্সকে, তা নয়; গলার স্বরটাও তাঁর মনোযোগ কেড়ে নিল। নিচু ও গম্ভীর কণ্ঠস্বর, অনুরণন বা প্রতিধ্বনি সমৃদ্ধ। উচ্চারণের ভঙ্গিতে দৃঢ়তা আছে, যেন নিশ্চিত হয়েই বলা হলো কথাটা। ম্যানডেক্স লোকটার চোখে চোখ রেখে বললেন, 'এখনও আমরা এ-ব্যাপারে নিশ্চিত নই। সব ফ্যাক্টস না জেনে এখন আমি কোন বিবৃতিও দিতে পারছি না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে চেয়ার ছাড়ল লোকটা। 'ওটা একটা বোমাই ছিল,' বলল সে। 'সমস্ত ফ্যাক্টস জানার পর আপনিও তা বুঝতে পারবেন।'

ম্যানডেক্সও চেয়ার ছাড়লেন। 'যদি বোমাই হয়, আমার কাজ হবে যে সেটা প্লেনে রেখেছিল তাকে খুঁজে বের করা।'

পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওরা, তারপর ম্যানডেক্স আবার বললেন, 'আপনার কি ফটোটা দরকার? ওটা পেতে হলে আপনাকে একটা অ্যাপ্লিকেশন···'

লোকটা মাথা নাড়ল। 'ধন্যবাদ।'

'আমি কি আপনার অন্য কোন সাহায্যে আসতে পারি?'

'প্যাসেঞ্জারদের একটা তালিকা পেলে ভাল হত, নিকটতম আত্মীয়দের নাম-ঠিকানা সহ।'

'সেটা আপনাকে দেয়া যাবে কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'কেন?'

ম্যানডেক্স কাঁধ ঝাঁকালেন। 'নিয়মটা আমার জানা নেই। আমার ডিস্ট্রিক্টে এ-ধরনের ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।'

'আসুন, প্রার্থনা করি আর যেন কখনও না ঘটে। কিন্তু একটা কথা, বীমার দাবি আদায়ের জন্যে আত্মীয়-স্বজনদের সবাইকে তো এক হয়ে একটা সমিতি করতে হবে, তাই না? পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে তাদের, ঠিক?'

মাথা ঝাঁকালেন ম্যানডেক্স। 'হ্যাঁ, তা-ও তো সত্যি। ঠিক আছে, দেখি আপনি স্কটল্যান্ড ত্যাগ করার আগে তালিকাটা আপনাকে দিতে পারি কিনা।' হ্যান্ডশেক করলেন তিনি।

দু'সারি ডেস্কের মাঝখান দিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে লোকটা। হঠাৎ অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করলেন ম্যানডেক্স। ডেস্কগুলোর পিছনে বিশ-বাইশজন পুরুষ ও মহিলা পুলিস বসে আছে, ফাইল-পত্র নিয়ে কাজ করছে, আবার কেউ রেডিওতে কথা বলছে। লোকটা চলে যাচ্ছে দেখে সবাই তারা চুপ করে গেল, বন্ধ করে দিল হাতের কাজ। কারও চোখে পলক পড়ল না, তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। তার পিছনে দরজাটা বন্ধ হবার পর আবার তারা যে যার কাজে মন দিল।

প্যাডের কাগজে ইমরুল হাসান নামটা লিখলেন ম্যানডেক্স। একজন সহকারীকে ডেকে কাগজটা দিয়ে বললেন, 'স্পেশাল ব্রাঞ্চের আর্থার কেনিংটনকে এই নামটা জানাও, বলো এই ভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজ নিতে হবে।'

সহকারী কাগজটা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। মাইকেল ম্যানডেক্স তারপরও দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাকিয়ে আছেন বন্ধ দরজার দিকে। সামান্য শিউরে উঠলেন তিনি। ঘর গরম রাখার জন্যে আরও হিটার চাইতে হবে তাঁকে।

দুই

অন্ধকার রাত। ডোবারম্যান কিছু দেখেনি, শোনেনি বা কোন গন্ধও পায়নি। তবে একটা কিছু অনুভব করল। শরীরের এক পাশে তীক্ষ্ণ, জ্বালাময় একটা ব্যথা। ঝট করে দাঁড়িয়ে রাগে গর্‌গর্‌ করে উঠল সে, সুইমিং পুলের পাশ ঘেঁষে কয়েক পা এগোতে পারল কোনরকমে, তারপর নেতিয়ে পড়ল পা, কাত হয়ে পড়ে গেল। আধ মিনিট মোচড় ও ঝাঁকি খেলো শরীরটা, তারপর স্থির হয়ে গেল।

ত্রিশ ফুট দূরে কালো কাপড় পরা একটা মূর্তি পাঁচিলের মাথা থেকে তরতর করে নেমে এল রশি বেয়ে।

বাগানের ভেতর কয়েক মিনিট নড়ল না সে, গুড়ি মেরে অপেক্ষা করছে, লক্ষ রাখছে চারদিকে। দূরের স্ট্রীট লাইট থেকে ম্লান একটু আভা এসেছে এদিকে, বাড়ির

কোন আলো বাগানে পৌঁছায়নি। এক সময় নড়ে উঠল কালো মূর্তি, নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে এল সুইমিং পুলের কাছে, এক মুহূর্ত থেমে পরীক্ষা করল কুকুরটাকে, তারপর সাবধানে চলে এল বাড়ির পিছনে, মিশে গেল গাঢ় অন্ধকারে।

টিভিতে 'আই লাভ লুসি' দেখছিল আলবিনো। মুগ্ধ হয়ে ডেসি আমাজ-এর স্প্যানিশ উচ্চারণ শুনছে সে, তার ধারণা এই বাচন ভঙ্গিতে সে-ও কথা বলে। হেসে উঠল সে, হাসিটা থামার আগেই ক্লিক করে আওয়াজ শুনল দরজা থেকে। অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাল আলবিনো। হাসির আওয়াজটা মাঝপথে থেমে গেছে। কালো কাপড় পরা লোকটাকে দেখল সে। দেখল ভোঁতা চেহারার হ্যান্ড-গানটা তার দিকে উঁচু হচ্ছে। পুট করে একটা আওয়াজ ঢুকল কানে, তীক্ষ্ণ জ্বালাময় ব্যথাটা অনুভব করল বুকে। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, চেহারায় আতঙ্ক, এক হাতে বুক হাতড়াচ্ছে। কালো কাপড় পরা লোকটা আবছা হয়ে গেল। একটা কণ্ঠস্বর ঢুকল তার কানে। 'চিন্তা কোরো না। তোমার কোন ক্ষতি হয়নি। শুধু ঘুমিয়ে পড়ছ।' আলবিনোর শরীরটা ভেঙে পড়ল। কার্পেটে ঢলে পড়ার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

ডিনারটা একঘেয়ে, তবে ভদ্রতার কারণে এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না। ডেভিড ক্রিস্টোফার—কলোরাডো রাজ্যের সিনিয়র সিনেটর তিনি, গভর্নর যদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সম্মানে ডিনার দেন, সেখানে তাঁর উপস্থিতি একান্ত কাম্য। বরাবরের মত দেরি করে পৌঁচেছেন তিনি, এবং সেই থেকে ডিনারের আগে ও পরে প্রচুর মদ্যপানও করেছেন। তবে তিনি জানেন ডিনার টেবিলে উপস্থিত বারোজন ব্যক্তির মধ্যে কেউই ধরতে পারবে না যে তাঁর নেশা হয়েছে। জুডি ধরতে পারতেন, কারণ পঁয়ত্রিশ বছর তাঁর সঙ্গে ঘর করার অভিজ্ঞতা ছিল ওঁর।

ডেভিড ক্রিস্টোফার বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী মানুষ। ডিনারের সময় চুপচাপ ছিলেন তিনি। অতিথিদের কেউই অন্য কিছু আশা করেননি। সবার শেষে এসেছেন, ফিরছেনও সবার আগে। কেউই অবাক হচ্ছেন না। বিদায় জানানোর জন্যে তাঁর সঙ্গে দরজা পর্যন্ত হেঁটে এলেন গভর্নর, তাঁর একটা বাহু ধরে বললেন, 'ডেভিড, প্লীজ, ব্যাপারটা আরেকবার বিবেচনা করে দেখুন। আমি আপনাকে ওই ফাইন্যান্স কমিটির সভাপতির আসনে দেখতে চাই।'

হলে এসে থামলেন ওঁরা। সিনেটর বললেন, 'হাওয়ার্ড, চিন্তা করার জন্যে দুটো দিন সময় দিন আমাকে···কাজের চাপে মারা যাচ্ছি আমি।'

গভর্নরের চোখে সহানুভূতি ফুটল। গত কয়েক হপ্তা সবার চোখেই সহানুভূতি দেখা যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'ডেভিড, প্রচুর কাজই হয়তো আপনার জন্যে সবচেয়ে ভাল থেরাপি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সিনেটর। 'হয়তো। দুটো দিন সময় দিন আমাকে। শুনুন, হাওয়ার্ড, আজ সম্ভবত একটু বেশি হয়ে গেছে আমার, আপনার লোককে বলবেন একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবে? হাইওয়ে পেট্রল মাতাল সিনেটরকে থামালে ব্যাপারটা ভাল দেখাবে না।'

নিঃশব্দে হেসে হাতঘড়ি দেখলেন গভর্নর। 'কোন সমস্যা নেই, সেক্রেটারিকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমার ড্রাইভার অপেক্ষা করছে, জানা কথা

আরও চার পেগ ব্র্যান্ডি না খেয়ে তিনি উঠবেন না।'

নিজের বাড়িতে ফিরলেন সিনেটর। তাঁর বাড়িটাকে প্রাসাদই বলা যায়। যুবা বয়েসে রিয়েল এস্টেট ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় করেছিলেন, এই বাড়ি তখনই তৈরি করা হয়। তাঁর নিজের রুচি খুব সাদামাঠা, তবে স্ত্রী জুডির অনেক গুণের মধ্যে একটা ছিল কিভাবে বিলাসবহুল জীবনযাপন করতে হয় তা তিনি জানতেন। শ্বেতপাথর বসানো হলঘরে হাঁটার সময় আজ আরেকবার তিনি ভাবলেন, বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে মাথা গোঁজার জন্যে আরও অনেক ছোট কিছু একটা বেছে নেবেন কিনা।

চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিলেন তিনি। ব্যাপারটা হয়তো ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তবে তিনি স্পষ্ট অনুভব করতে পারেন, এ-বাড়িতে এখনও তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতি বহাল আছে। বাড়িটা তৈরি হবার সময় সারাক্ষণ আর্কিটেক্ট ও রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে ছিলেন জুডি। এ বাড়ি তাঁর বাড়ি। তিনি, সিনেটর, এ বাড়ি ছেড়ে কখনও কোথাও বাস করবেন না। ড্রইংরূমের দরজা খুললেন তিনি। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে। ইউরোপীয় রীতিতে সুন্দরভাবে সাজানো। স্ফটিক ঝাড়বাতি, ভারি ও আরামদায়ক চেয়ার আর সেটী, চতুর্দশ লুই-এর আমলের একটা রাইটিং টেবিল—যেটা জুডি তাঁকে স্টাডিরূমে নিয়ে যেতে দেয়নি কখনও। কামরাটা খুব বড়, বিস্তর তর্ক-বিতর্কের পর জুডির সঙ্গে জিতে এক প্রান্তে একটা মেহগনি বার সাজিয়েছিলেন তিনি, সঙ্গে আছে কালো চামড়া দিয়ে মোড়া চারটে বার টুল। সেগুলোরই একটায় বসে আছে এক লোক। লোকটা দীর্ঘদেহী, পরনে কালো স্ল্যাক্স আর কালো পোলো নেক শার্ট।

লোকটার হাতে একটা গ্লাস। তার মুখে কাটা দাগ দেখা যাচ্ছে। মাথায় লম্বা চুল। বয়স আন্দাজ করা কঠিন।

কামরার চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন সিনেটর। প্রতিটি জিনিস যেখানে থাকার কথা সেখানেই আছে। নেশার ভাবটুকু মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গেল। সতর্ক হয়ে উঠলেন তিনি। লোকটাই আগে কথা বলল।'

'সিনেটর, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করায় সত্যি আমি দুঃখিত। আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না। স্রেফ মিনিট দশেক কথা বলে চলে যাব আমি।'

চট করে একবার রাইটিং টেবিলের ওপর তাকালেন সিনেটর, টেলিফোনটা রয়েছে ওখানে।

লোকটা ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল, 'ওটা আমি কেটে দিয়েছি।'

সিনেটর খেয়াল করলেন, এরকম ভারি ও ভরাট গলা সচরাচর শোনা যায় না। 'কে আপনি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি। 'আলবিনো আপনাকে ঢুকতে দিল?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'আলবিনো তার ঘরে ঘুমাচ্ছে। কাল সকালের আগে জাগবে না।'

সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার ভয় পান না, এ-কথা বলা যাবে না। ভিয়েৎনামে যুদ্ধ করেছেন তিনি, বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে অসংখ্য পদকও পেয়েছেন।

লোকটাকে প্রথমবার দেখে ভয় পান তিনি, তবে ধীরে ধীরে সেটা কেটে যাচ্ছে। বার-এর দিকে এগোলেন তিনি, বললেন, 'একটা ফোন করে এলেই তো পারতেন।'

লোকটা বলল, 'তিনদিন আগে আমি আপনার সেক্রেটারিকে ফোন করি। ভদ্রমহিলা জানতে চান কেন আমি দেখা করতে চাই। বললাম, ব্যক্তিগত। উনি বললেন, ফোন নম্বরটা দিন। দিলাম। পরদিন আবার আমি কল করি, দু'বার। তাঁকে বললাম, ব্যাপারটা ব্যক্তিগত ও জরুরী। কিন্তু তাঁকে নরম করা গেল না। অথচ আমি জানি কাল সকালে আপনি ওয়াশিংটন চলে যাবেন।'

বার-এ পৌঁছুলেন সিনেটর। একটা কনুই রাখলেন ওটার ওপর। এমন উঁচু করে তৈরি ওটা, কনুই রাখতে হলে সামনের দিকে ঝুঁকতে হয় না। লোকটার দিকে মুখ করে আছেন তিনি। 'আপনার পরিচয়?'

'আপনি আমাকে হাসান বলে ডাকতে পারেন। ইমরুল হাসান।'

ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর। 'একটু একটু মনে পড়ছে, মেসেজটা আমি দেখেছি। কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত মানুষ, মি. হাসান।'

'ব্যস্ত আমিও।'

সিনেটর ঠাণ্ডা সুরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার সমস্যাটা কি?'

'সাউদিয়া একশো তিন।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। সিনেটরের বয়েস হয়েছে, রোগা হলেও যথেষ্ট লম্বা তিনি, মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে গেছে, তারপরও শরীরের বাঁধন এখনও খুব শক্ত। রোজ সকালে সুইমিং পুলে এক ঘণ্টা সাঁতার কাটেন। ধীরে ধীরে বার-এর পিছনে চলে এলেন তিনি, নিজের জন্যে গ্লাসে স্কচ হুইস্কি ঢালছেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ভেতরে ঢুকলেন কিভাবে?'

লোকটা বলল, 'সিনেটর, স্বীকার করছি আপনার সিকিউরিটি সিস্টেম হাইলি সফিসটিকেটেড। চলে যাবার আগে বলে যাব আরও কিভাবে উন্নত করা যায়।'

'আমার ডোবারম্যান?'

'হুঁশ নেই, পড়ে আছে সুইমিং পুলের ধারে।' একটা হাত তুলে নাড়ল লোকটা। 'চিন্তা করবেন না, ঘুম ভাঙার পর সম্পূর্ণ সুস্থ দেখবেন ওটাকে।'

সিনেটর লোকটার গ্লাসের দিকে তাকালেন। গ্লাসটা প্রায় খালি হয়ে গেছে। 'কি নিয়েছেন আপনি?'

লোকটা চিবুক তুলে সিনেটরের পিছনে শেলফটা দেখাল। 'আপনার কনিয়্যাক সত্যি দারুণ।'

পিছনের শেলফ থেকে কনিয়্যাকের বোতলটা নামালেন সিনেটর, উদারহস্তে ভরে দিলেন লোকটার গ্লাস, বালতি থেকে বরফ নিয়ে গ্লাসের ভেতর ফেললেন। বার-এ একটা বোতল রয়েছে, সেটা থেকে গ্লাসটায় খানিকটা সোডা ভরল লোকটা, তারপর গ্লাসটা উঁচু করে ধরল। সিনেটরও তাঁর গ্লাস উঁচু করলেন, বললেন, 'সাউদিয়া একশো তিন। তো?'

'প্লেনটায় আপনার স্ত্রী ছিলেন।'

'তো?'

'আমারও দুই আপনজন ছিল।'

'ব্যাখ্যা করুন। কারা তারা?'

'আমার এক বান্ধবী, ছাব্বিশ বছর বয়েস। তার নাম ভায়োলা। আর ভায়োলার বোন-ঝি, আমার বন্ধুর বাচ্চা মেয়ে। তার নাম বৃষ্টি। বয়েস দশ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সিনেটর বললেন, 'আমার স্ত্রীর নাম ছিল জুডি। তাঁর বয়েস হয়েছিল তেষট্টি। আমাদের কোন সন্তান নেই…ঈশ্বর দেননি…আমার জীবনে জুডি ছাড়া আর কেউ ছিল না।'

এবার লোকটাই সিনেটরের গ্লাস ভরে দিল।

তার হাত থেকে গ্লাসটা নিয়ে সিনেটর বললেন, 'চলুন, বাইরে যাই। কেন যেন মনে হচ্ছে পানির ধারে বসলে মনটা ভাল লাগবে।'

বারের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ফ্রেঞ্চ ডোর খুললেন তিনি। লনের ওপর দিয়ে হেঁটে সুইমিং পুলের ধারে এসে দাঁড়ালেন, ঝুঁকে কুকুরটার চিবুকে হাত বুলালেন তিনি। হাতটা সরালেন আধ মিনিট পর।

সিনেটর জানতে চাইলেন, 'আলবিনোকে ঘুম পাড়ালেন কিভাবে?'

'ওই একইভাবে, সিনেটর…যাই বলুন, সবাই আমরা জানোয়ার।'

পুলের ধার ঘেঁষে হাঁটছে ওরা। লোকটা জানতে চাইল, 'স্ত্রী এভাবে মারা গেলেন, আপনি কিছু করবেন না?'

পুরো সুইমিং পুলটা দু'বার ঘুরে এল ওরা, তারপর পাল্টা প্রশ্ন করলেন সিনেটর, 'ভায়োলা আর বৃষ্টিকেও তো অকালে মেরে ফেলা হলো, আপনি কি করতে যাচ্ছেন?'

'দায়ী লোকটাকে আমি খুন করতে যাচ্ছি।'

কথা না বলে আরও দু'বার ঘুরল ওরা, তারপর সিনেটর বললেন, 'চলুন, ভেতরে যাই।'

ড্রইংরূমে ফিরে এসে আবার মুখ খুললেন তিনি, 'আপনার মত আমারও তাই ইচ্ছে। আমি ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করে দিয়েছি।'

'কিভাবে?'

রোলেক্স হাতঘড়ির ক্যালেন্ডার উইন্ডোর ওপর চোখ রেখে সিনেটর বললেন, 'তিন হপ্তা আগে আমি এক ভদ্রলোককে ভাড়া করেছি… একজন এক্সপার্টকে।'

'এক্সপার্ট কোন বিষয়ে?'

'অ্যান এক্সপার্ট ইনভেস্টিগেটর। অলসো অ্যান এক্সপার্ট কিলার।'

'কোথাকার লোক সে? আমি তার নাম জানতে পারি?'

'বাংলাদেশের নাগরিক, তবে আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক দেশের নাগরিকত্ব আছে,' বললেন সিনেটর, তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। 'দুঃখিত, নামটা বলা যাবে না। তাঁর সঙ্গে আমার যে চুক্তি হয়েছে তার প্রথম শর্তই হলো, পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না।'

'অন্তত তার ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু বলুন, আংশিক হলেও চলবে।'

'বললাম তো, তিনি একজন ইনভেস্টিগেটর। মার্সেনারি হিসেবেও কাজ করেছেন। এসপিওনাজ জগতে নাম আছে।'

'তাহলে বলুন, সিনেটর,' আপনার এই খুনী কাকে খুন করতে যাচ্ছে?'

সিনেটর কাঁধ ঝাঁকালেন। 'টার্গেটের পরিচয় এখনও পুরোপুরি জানা যায়নি। তবে আমার যে যোগাযোগ, এফবিআই ও সিআইএ-এর সমস্ত রিপোর্ট আমি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারব। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, ঘটনার কারণ তদন্ত করে দেখার জন্যে সৌদি সরকার ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রশাসনকে অনুরোধ জানিয়েছে। ওরা এরইমধ্যে প্রায় নিশ্চিত যে কাজটা প্যালেস্টাইনী চরমপন্থীদের। তবে আবু নিডাল-এর গ্রুপ বা হিযবুল্লাহরাও জড়িত থাকতে পারে। ওরা আশা করছে এক কি দেড় মাসের মধ্যে সব তথ্য জানা যাবে।'

'তাহলে এই মুহূর্তে আপনার ভাড়াটে খুনী কি করছে?'

'সিরিয়া বা লেবাননে অনুপ্রবেশ করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, নির্ভর করে ফাইন্যাল টার্গেট কে'তার ওপর।'

'আপনার কথা শুনে মনে হলো মধ্যপ্রাচ্যে তার অবাধ আসা-যাওয়া আছে।'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'আপনি তার খোঁজ পেলেন কিভাবে?'

'তিনিই আমাকে খুঁজে নেন।'

'নিশ্চয়ই আপনি তার সম্পর্কে খবর নিয়েছেন?'

সিনেটর হাসলেন। 'ইন্টারপোল থেকে তথ্য বের করেছি আমি। মার্সেনারি, এসপিওনাজ এজেন্ট ও ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটর সম্পর্কে ডাটা ব্যাংক আছে ওদের। সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভাগ্যটা খুবই ভাল। আমাকে বলা হলো, এ কাজের জন্যে এরচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি দ্বিতীয়টি পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বছর কয়েক আগে তিনি তাঁর নিজের মৃত্যুর খবর রটিয়ে দেন। আন্ডারগ্রাউন্ডে তাঁর সাঙ্ঘাতিক প্রভাব। আসলে তাঁর সম্পর্কে সব কথা শুনলে আপনি হতভম্ব হয়ে পড়বেন, এমনই তাঁর রেকর্ড। কিন্তু দুঃখিত, চুক্তি...'

'আপনি তাকে কত টাকা দিয়েছেন...মানে, অ্যাডভান্স করেছেন কত?'

আবার সিনেটরকে ইতস্তত করতে দেখা গেল, তারপর বললেন, 'এক মিলিয়ন ডলারের চুক্তি। অ্যাডভান্স করেছি আড়াই লাখ ডলার। টার্গেটের পরিচয় নিশ্চিতভাবে জানার পর আরও আড়াই লাখ ডলার দিতে হবে। বাকিটা কাজ শেষ হলে।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। খানিক পর নরম সুরে সিনেটর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও কি এ-ধরনের কোন প্রস্তাব দিতে চাইছিলেন?'

মাথা নাড়ল লোকটা। 'ঠিক এ-ধরনের নয়। আপনার যে যোগাযোগ, তথ্য সংগ্রহ করার যে সুযোগ, এই সব থেকে সাহায্য পাবার কথা ভেবেছি। ওই প্লেনের প্রতিটি প্যাসেঞ্জারের ব্যাকগ্রাউন্ড আর কানেকশন চেক করে দেখেছি আমি। বুঝলাম একমাত্র আপনাকেই আমার দরকার। আপনার টাকা আছে, ব্রিটিশ প্রশাসনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক আছে, সিআইএ ও এফবিআই থেকে গোপন রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারবেন। তদন্তের দায়িত্ব যে ওরাই পাবে, তাতে প্রায় কোন সন্দেহই নেই। টাকা আমারও আছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। সিআইএ আর এফবিআই থেকে ইচ্ছে করলে আমিও রিপোর্ট পেতে পারি, তবে অনেক কাঠখড়

পোড়ানো হবে, তা ও অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে সমস্ত তথ্য আমাকে না-ও দেয়া হতে পারে। টাকা প্রসঙ্গে বলতে চাই, এ-ধরনের অপারেশনে খরচ পড়বে প্রায় পাঁচ লাখ ডলার। ভেবেছিলাম অর্ধেক আমি দেব, বাকি অর্ধেক আপনি দেবেন।'

'আমার মনে হয় আপনি অনেক দেরি করে ফেলেছেন, মি. হাসান।'

লোকটা মাথা নাড়ল। 'না, সিনেটর। আমার দেরি হয়নি।'

'ঠিক কি বলতে চান?'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'আপনি যে লোকের কথা বললেন, তাকে আমি চিনি। হ্যাঁ, বাংলাদেশেরই লোক সে, তবে বিশ-বাইশ বছর ধরে আমেরিকায় পালিয়ে আছে। লোকটা আসলে ফ্যানাটিক। ভাড়াটে সৈনিক হিসেবে কাজ করে। আপনি তার আসল পরিচয় পেলে নিজের ওপর রেগে যাবেন। আলজিরিয়া, লেবানন, মিশর ও আফগানিস্তানে মৌলবাদী চরমপন্থীদের পক্ষে কাজ করে সে।'

'তারমানে?'

'তারমানে সে আপনাকে নিজের যে পরিচয় দিয়েছে তা সত্যি নয়। আপনাকে যার কথা বলা হয়েছে, তাকে আমি চিনি। ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটর—রানা এজেন্সির ডিরেক্টর ভদ্রলোক, নাম মাসুদ রানা, তাই না? আমি জানি, এই মাসুদ রানাকে আপনি আড়াই লাখ ডলার দেননি। আপনাকে ঠকানো হয়েছে, সিনেটর।'

সিনেটর রেগে যাচ্ছেন। 'এ-সব কি বলছেন আপনি?'

'সিনেটর, আপনি যে লোকের কথা বললেন, তিনি এই মুহূর্তে আপনার সামনে বসে রয়েছেন। বছর কয়েক আগে আমিই আমার মৃত্যু সংবাদ রটিয়ে দিই। সে-সময় আমার নাম ছিল ইমরুল হাসান, পরে যদিও আসল পরিচয়টা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ইন্টারপোলের তথ্য থেকে আপনি নিশ্চয়ই জানতে পেরেছেন যে সে-সময় ইমরুল হাসান ছিল লুবনা নামে এক কিশোরী মেয়ের বডিগার্ড। লুবনাকে কিডন্যাপ করা হয়, তারপর রেপ করে মেরে ফেলা হয়। যারা দায়ী ছিল, মিলানের প্রধান দুই বস্ ফনটেলা ও গামবেরি, রোমের আতুনি বেরলিংগার, আর পালার্মোর পেটমোটা ডন বাকালা, ওদের সবাই খুন হয়ে যায়। শুধু ওরাই নয়, আরও অনেকে।' *

সিনেটরের চোয়াল ঝুলে পড়ল, তাঁর মুখের ভেতর সোনা দিয়ে বাঁধানো একটা দাঁত দেখতে পাচ্ছে মাসুদ রানা। হঠাৎ একটা প্রশ্ন করলেন তিনি, কঠিন সুরে, 'এ-সব আপনি নিশ্চয়ই প্রমাণ করতে পারবেন?'

'এই লোকটা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ধরে নিতে হয় আপনার সেক্রেটারিকে সহজেই রাজি করিয়ে ফেলে সে। আপনি আমাকে তার চেহারার বর্ণনা দিন।'

'তার বয়েস আপনার কাছাকাছিই হবে, কিছু ছোটও হতে পারে। চুল লম্বাই বলা যায়। গোঁফ আছে, কাটা দাগ আছে কপালে। লম্বাটে সরু মুখ, রোদে পোড়া চামড়া। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, বিজনেস সুট পরে ছিল।'

'উচ্চারণ?'

'ভালই ইংরেজি বলে, মার্কিন টান আছে।'

---

* অগ্নিপুরুষ দ্রষ্টব্য।

রানা হাসল। 'যে আপনার কাছে এসেছিল তার নাম সাব্বির খান, সিনেটর। শুধু ফ্যানাটিক নয়, পেশাদার খুনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা মনে আছে আপনার? সে-সময় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল যারা, বাঙালী মেয়েদের রেপ করা জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছিল যারা, যুদ্ধের শেষ দিকে যারা বুদ্ধিজীবীদের খুন করেছিল, তাদেরকে আমরা রাজাকার বলি। সাব্বির খান রাজাকার ছিল না, কারণ তখন তার বয়েস ছিল সাত কি আট, তবে তার বাবা মৌলবাদী রাজনীতিক ছিলেন, ছিলেন রাজাকার। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার কিছুদিন আগে আমেরিকায় পালিয়ে আসেন তিনি, আশি সালের দিকে ক্যান্সারে মারা যান। মারা যাবার আগে ছেলেকে নিজের মত করে গড়ে রেখে গেছেন। সাব্বির খানও মৌলবাদী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, লিবীয় ফ্যানাটিকদের সঙ্গে ট্রেনিং নিয়ে পেশাদার টেরোরিস্ট হিসেবে কাজ করছে। আপনার কাছ থেকে টাকা পাবার পর কোথায় গেল সে, কিছু বলে গেছে?'

সিনেটরের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'বলল ব্রাসেলসে যাচ্ছে। ওখান থেকে দু'জন লোককে দলে ভেড়াবে। বলল ওখানেই এ-ধরনের লোক পাওয়া যায়।'

'তারপর আর সে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি?'

'না, বলে গেছে মাসখানেকের মধ্যে ফোন করবে।' সিনেটর হাতঘড়ি দেখলেন। 'আর বোধহয় এক হপ্তা পর।'

'কোনও ঠিকানা দিয়ে গেছে কি?'

সিনেটর গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'ব্রাসেলস আর দক্ষিণ ফ্রান্সের ক্যানেস-এর পোস্ট বক্স নম্বর দিয়ে গেছে।'

রানা বলল, 'এরপর কি ঘটবে বলে দিচ্ছি আমি। এক হপ্তার মধ্যে আপনাকে ফোন করবে সাব্বির, বলবে অগ্রগতির একটা রিপোর্ট পাঠাচ্ছে। রিপোর্টটায় খরচের একটা হিসাব থাকবে—কয়েকজন মার্সেনারিকে ভাড়া করতে এবং বিভিন্ন দামী ইকুইপমেন্ট কিনতে মোটা টাকা বেরিয়ে গেছে। মার্সেনারিদের নাম-ঠিকানা দেবে সে, কেনা জিনিসগুলোর রসিদও পাঠাবে। সাউদিয়া একশো তিন-এর বন্দারদের পরিচয় জানার পর পোস্টবক্সের নম্বরে চিঠি পাঠিয়ে আপনি তাকে খবরটা দেবেন। এরপর সে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা চাইবে। আমার কথা সত্যি কিনা কয়েকদিনের মধ্যেই আপনি তা জানতে পারবেন।'

সিনেটরকে চিন্তিত দেখাল, কথা বলছেন না।

নিজের সামনে গ্লাসটা দেখাল রানা। 'এতে আমার আঙুলের ছাপ আছে। এটা আপনি সেফে তুলে রাখুন। কয়েক দিনের মধ্যে অন্য এক সেট ফিঙ্গারপ্রিন্ট পাবেন আপনি, সাব্বির খানের। আপনার এফবিআই বন্ধুদের বলুন তারা যেন দুই সেট ফিঙ্গারপ্রিন্টই পরীক্ষা করে দেখে। এক সময় আমার একটা চিঠি পাবেন আপনি। কাগজটার নিচের ডান কোণ ছিঁড়ে এফবিআই হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেবেন। আমার বুড়ো আঙুলের ছাপ থাকবে ওখানে। আমার কাছ থেকে যখনই চিঠি পাবেন, প্রতিবার এই কাজ করবেন আপনি। আর যদি ফোন করি, প্রথম শব্দটা উচ্চারণ করব—মিডিলটন। তারিখ বলব দশ দিন পিছনের।'

কাঁধ উঁচু করে আড়মোড়া ভাঙল রানা, চেহারায় ক্লান্তি। সিনেটরকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। তারপর শিরদাঁড়া টান টান করলেন তিনি, বললেন, 'দায়ী বেজন্মাগুলোকে আমরা ছাড়ব না।' হঠাৎ একটা চিন্তা জাগল তাঁর মাথায়। 'কাজটা আপনি কি একা করতে চাইছেন, নাকি দু'একজন বন্ধু-বান্ধবকেও সঙ্গে রাখবেন? আপনার তো বিরাট একটা এজেন্সি আছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না। এটা ব্যক্তিগত। তবে কাউকে যদি সঙ্গে নিই, সে-ও হবে আপনার মত ক্ষতিগ্রস্ত কেউ। এক কিশোর তার মাকে হারিয়ে এতিম হয়ে গেছে, প্রতিশোধ নেয়ার আশায় বারবার ধরনা দিচ্ছে আমার অফিসে। তবে এখনও আমি সিদ্ধান্ত নিইনি তাকে সঙ্গে রাখব কিনা। টার্গেট আইডেনটিফাই করতে কতদিন লাগবে আমরা তা জানি না…কয়েক মাসও লেগে যেতে পারে।'

বিষণ্ন হাসি ফুটল সিনেটরের ঠোঁটে। 'আপনার বয়েস আর দক্ষতা যদি আমার থাকত, অবশ্যই আমি আপনার সঙ্গী হতাম।'

রানা বলল, 'আজ রাত থেকে আপনি আমার সঙ্গেই থাকছেন, সিনেটর। এখন আর আপনি একা নন। আজ রাত থেকে আমারও একজন বন্ধু জুটল—আপনি।' সিনেটরের কাঁধে এক মুহূর্তের জন্যে হাত রাখল ও। 'যতটা পারা যায় আপনার টাকা আমি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব, মি. ক্রিস্টোফার…যদি সব খরচ হয়ে গিয়ে না থাকে। এবার আমাকে যেতে হয়। চলুন, তাড়াতাড়ি একবার আপনার সিকিউরিটি সিস্টেমটা দেখে নেয়া যাক। ফোনটাও তো সচল করতে হবে…'

তিন

ফেরি বোটের টপ ডেকে দাঁড়িয়ে আছে রানা। বোটটা দেখতে অনেকটা কাছিমের মত, অথচ নাম ডলফিন—মাল্টা আর গোজোর মাঝখানে সাগর মাত্র দু'মাইল, শুধু এই পানি পথেই লোকজন আর যান বাহন নিয়ে চলাচল করে। পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন ওয়াচটাওয়ার, খুদে দ্বীপ কোমিনোকে পাশ কাটিয়ে এল বোট। স্বচ্ছ নীল পানি, তলার বালি স্পষ্ট দেখা যায়—ব্লু লেগুন। বেশ কয়েক বছর আগে, অথচ মনে হলো এই তো সেদিন, রেমারিক ও জেসমিনের সঙ্গে এখানে সাঁতার কেটেছে ও। আর ভায়োলাকে নিয়ে সাঁতার কেটেছে মাত্র ছ'মাস আগে, সে স্মৃতি চির অম্লান হয়ে থাকবে ওর হৃদয়ে। তিনজনের কেউই আজ বেঁচে নেই। সবার আগে চলে গেল জেসমিন, কয়েক মাসের বাচ্চা বৃষ্টিকে রেখে। ঘাতক ট্রাক তাকে দেয়ালের সঙ্গে পিষে দেয়। কয়েক বছর পর মারা গেল রেমারিক, লিভার সিরোসিসে। ছোট্ট মেয়ে বৃষ্টি এতিম হয়ে গেল। ঠিক হলো ভাইয়ের মেয়েকে মানুষ করবে ভায়োলা, ওদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেবে রানা। গোজোতে সেজন্যেই পুরানো একটা খামারবাড়ি কিনে নতুন করে সাজাতে হয় রানাকে। সব ঠিকঠাক মতই চলছিল। বছরে অন্তত একবার দিন পনেরোর জন্যে বেড়িয়ে যাচ্ছিল ও। তারপর হঠাৎ ভায়োলা আর বৃষ্টিকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেয়া হলো। কোনও

যুক্তি আছে প্রতিশোধ না নেয়ার?

গোজোর দিকে তাকাল রানা, সামনে। সাগর থেকে হঠাৎ প্রায় খাড়াভাবে মাথাচাড়া দিয়েছে সবুজ দ্বীপটা। প্রতিটি পাহাড়ের চূড়ায় মুকুটের মত সাজানো-গোছানো গ্রাম। পাহাড়ের গা থেকে মাটি কেটে বিশাল আকারের ধাপ তৈরি করা হয়েছে, প্রতিটি ধাপ আসলে এক একটা খেত, নিচেরটা সাগরের কিনারা ছুঁয়েছে।

রানা প্রথমবার এসেই গোজোর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। এখানকার সমাজে ছোট বড় ভেদ নেই, সবাই সমান। গরীব জেলে বা ভূমিহীন কৃষকও জানে যে তার অধিকার আর স্বাধীনতা গোজোর সবচেয়ে ধনী লোকটার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। গোজোর লোকেরা হাসি-খুশি আর ফুর্তিবাজ, তোমাকে ওদের পছন্দ হলেই বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে। অন্যদের চেয়ে নিজেকে কারও বড় মনে করার প্রবণতা থাকলে গোজোকে তার এড়িয়ে চলা উচিত।

ফেরি থেকে নেমে পাহাড়ের খানিকটা ওপরে উঠল রানা, দাঁড়াল দ্বীপের একমাত্র বার রুচিতা'স-এর সামনে। সান্ধাতা আমলের বিল্ডিং, সাগরের দিকে মুখ করে একটা ঝুল-বারান্দা আছে। ভেতরটা ঠাণ্ডা, সিলিং থেকে ঝাড়বাতি ঝুলছে, দেয়ালে পাহাড় ও নদীর ছবি।

রানাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই গোলগাল চেহারার বারটেন্ডার ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে ডায়াল করল। নিচু গলায় মাল্টিজি ভাষায় কার সঙ্গে যেন কথা বলল সে। তারপর নিঃশব্দে এগিয়ে এসে কাউন্টারের ওপর মগ ভর্তি বিয়ার রাখল। আগেই রানা ওখানে এক পাউন্ডের একটা নোট রেখেছে।

ওর নাম সাকো, ডাক নাম 'ক্ষতি কি'। সে বলল, 'সবাইকে আমি সে-কথাই বলছিলাম। জেসমিন নেই, রেমারিক নেই, ভায়োলা আর বৃষ্টিও নেই—কিন্তু তাতে কি, উমো কি আমাদেরকে এত সহজে ভুলতে পারবে! সে এতদিন যেমন গোজোয় আসা-যাওয়া করেছে, এখনও তাই করবে। কেউ বলতে পারবে, আমরা তার আপনজন নই?' ইটালিয়ান ভাষায় উমো মানে পুরুষ। গোজোর নিয়ম হলো, বহিরাগত কাউকে ডাকনাম দেয়া হয় না। 'এই তো, মাত্র দেড় মাস হয়েছে ভায়োলা আর বৃষ্টি মারা গেছে, এরই মধ্যে দু'বার তোমার আসা হলো।'

মিলানো আর আলফানসো ঢুকল বারে, ওরাই ফেরি চালিয়ে নিয়ে এসেছে। রানার মগটা আবার ভরে দিল সাকো, ইঙ্গিতে টাগলিয়াকে দেখাল। তারপর বলল, 'নিডো তোমাকে নিতে আসছে।'

গোজোবাসীদের এই এক রীতি; একবার যদি পরস্পরকে বিয়ার কিনে খাওয়াতে শুরু করে, পালা করে সবাই সবাইকে খাওয়াতে কখনও কখনও দেড় দু'দিন পার হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার মগ খালি করে সাকোর দিকে তাকাল রানা। আবার সেটা ভরে দিয়ে কাউন্টার থেকে টাকাটা তুলে নিল সাকো। রানা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি?'

সাকো গম্ভীর, মাথা নাড়ল। 'এত সকালে আমার চলে না।' বাকি পয়সা কাউন্টারে রাখল সে।

তিন মিনিট পর তার মুখে হাসি ফুটল, রানার সামনে থেকে গুণে গুণে দশ সেন্ট তুলল সে। 'ক্ষতি কি!' বলে নিজের জন্যে মগ ভর্তি করে বিয়ার ঢালল।

হাসা চলবে না, এটাই সাকোর অভ্যাস। কেউ অফার করলে প্রথমে সেটা প্রত্যাখ্যান করবে, কয়েক মিনিট পর সহাস্যে এগিয়ে এসে বলবে, 'ক্ষতি কি!'

গোজোয় সবারই একটা করে ডাকনাম আছে, বলাই বাহুল্য যে সাকোকে 'ক্ষতি কি' বলে ডাকা হয়। সেই রকম টাফিকে বলা হয় 'গুঁফো', আর সাকোর ভাই টাগলিয়াকে 'কিন্তু'। টাগলিয়াকে 'কিন্তু' বলার কারণ শব্দটা অতিমাত্রায় ব্যবহার করে সে। মিলানোর ডাকনাম 'হাজির', আর আলফানসোর 'অক্লান্ত'। ফেরি থেকে নেমে সোজা রুচিতা'স-এ চলে আসে মিলানো, এসেই ঘোষণা দেয়, 'আমি হাজির'। আর আলফানসোর বিয়ার খেতে কোন ক্লান্তি নেই, যত দেবে তত খাবে, আজ পর্যন্ত কেউ তার রেকর্ড ভাঙতে পারেনি।

কাছে সরে এসে নিচু গলায় জানতে চাইল সাকো, 'কিছু জানা গেল?' রানা কোন জবাব দিচ্ছে না দেখে মাথা চুলকে আবার বলল সে, 'সবাই আমরা বলাবলি করছিলাম, উমো এর একটা বিহিত না করেই ছাড়বে না।'

'সময় হোক,' সংক্ষেপে জবাব দিল রানা।

বাইরে তোবড়ানো একটা ল্যান্ড-রোভার এসে থামল। নিচে নামল চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবক। বিষণ্ণ, ম্লান চেহারা; মাথাভর্তি কোঁকড়া চুল এলোমেলো হয়ে আছে, চোখ দুটো লালচে। বারে ঢুকে এগিয়ে আসছে নিডো, ভায়োলার ভাই, টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পরস্পরকে আলিঙ্গন করল ওরা।

একটু পর ল্যান্ড-রোভার ছেড়ে দিয়ে নিডো প্রথম কথা বলল, 'কোথায়? আপনার বাড়িতে, নাকি আমাদের?'

'এ-কথা বললে কেন? গোজোয় এসে আমি কখনও আন্টির সঙ্গে দেখা না করে নিজের বাড়িতে উঠেছি?'

'না, কাল রাতে লন্ডন থেকে এক ছেলে এসেছে কিনা। এত করে বললাম, খালি বাড়িতে একা থাকার দরকার নেই, কিন্তু শুনল না। বাধ্য হয়ে রাতটুকু তার সঙ্গে থাকতে হয়েছে আমাকে।'

'কি নাম? বয়েস কত?'

'একদম বাচ্চা, ষোলো কি সতেরো। নাম বলল, পবন।'

পবনকে এজেন্সির লন্ডন শাখার ঠিকানা দিয়েছিল রানা। গত এক মাস প্রায় প্রতিদিনই বোনকে নিয়ে সেখানে ধরনা দিয়েছে ছেলেটা, কিন্তু রানার দেখা পায়নি। আগেই নির্দেশ দেয়া ছিল, কাজেই এজেন্সির লোকেরা ছেলেটাকে প্রথমে বলেনি রানাকে কোথায় পাওয়া যাবে। ওকে না পেয়ে ছেলেটা হাল ছেড়ে দেয় কিনা সেটাই দেখার বিষয় ছিল রানার। এ এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল পরীক্ষা। ছেলেটা যে প্রতিদিন খোঁজ নিতে আসছে, অফিশিয়াল কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ও নিয়মিত রিপোর্ট পেয়েছে রানা। অবশেষে লন্ডন শাখাকে নির্দেশ দেয় ও, গোজোর ঠিকানাটা জানিয়ে দাও ওকে। 'একা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'সঙ্গে ওর বোন আসেনি?'

মাথা নাড়ল নিডো। 'একা।'

'তাহলে ওখানেই যাই চলো। তোমাদের বাড়িতে কাল যাব।'

পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে নিডো জানতে চাইল, 'কে ছেলেটা?'

'ভায়োলা আর বৃষ্টির সঙ্গে ওদের মা-ও মারা গেছে,' বলল রানা। 'ব্রিটেনে থাকে ওরা, তবে জন্ম বাংলাদেশে।'

'দেশী,' মন্তব্য করল নিডো। তারপর জানতে চাইল, 'কেন এসেছে?'

'পরে এক সময় নিজেই বুঝতে পারবে।'

পাহাড় থেকে নেমে এসে খামারবাড়ির সামনে ল্যান্ড-রোভার থামাল নিডো। 'আজ আর আমি ভেতরে ঢুকছি না। মাকে বলব, কাল আপনি দেখা করতে যাবেন।'

খামারবাড়িটা পুরানো পাথর দিয়ে ঘেরা, দেখে মনে হবে মান্ধাতা আমলের, আসলে মাত্র দু'বছর আগে তৈরি করা হয়েছে। পাঁচিলটা পাঁচ ফুট চওড়া, বারো ফুট উঁচু। পাঁচিলের গায়ে কাঠের চওড়া একটা দরজা, দরজার পাশে সেকেলে একটা মেটাল ডোর হ্যান্ডেল। নিডো গাড়ি নিয়ে চলে যাবার পর হ্যান্ডেলটা ধরে টান দিল রানা। বাড়ির ভেতর ঘণ্টা বেজে উঠল, এক মিনিট পর খুলে গেল দরজা।

ধূসর জিনস আর টি-শার্ট পরেছে ছেলেটা, জিনসের ভেতর টি-শার্টটা গোঁজা। 'হ্যালো, পবন? কেমন আছ তুমি? একা যে, পাখি··· তোমার বোন এলেন না?'

'আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন? আপা এল না···লন্ডনে ওর অনেক কাজ তো, তাই।'

'একা আসতে পারলে?' ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। 'আগে কখনও একা কোথাও বেরিয়েছ?'

মাথা নাড়ল পবন। 'লন্ডন ছেড়ে এই প্রথম একা বেরুলাম। আপা আমাকে আসতে দিতে চায়নি, আমি তার কথা শুনিনি। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে এয়ারপোর্টে এসে প্লেনে তুলে দিল। দেখা করার জন্যে রোজ আমি অফিসে গেছি, আপনার স্টাফরা এক মাস ঘুরিয়ে এখানকার ঠিকানাটা দিল। আমি এখানে আসায় আপনি বিরক্ত হননি তো?'

পবনের একটা হাত ধরল রানা, বলল, 'আরে না, আমি খুশি হয়েছি।'

রানার সঙ্গে পা বাড়িয়ে হাঁটছে ছেলেটা, একটু পর বলল, 'আপনি নিষেধ করার পর থেকে আমি আর কাঁদি না।'

'গুড বয়।'

ওদের সামনে বিরাট একটা জায়গা নিয়ে লাইমস্টোন পেভমেন্ট, ঘিরে রেখেছে নীল চৌকো একটা সুইমিং পুলকে। পুলের চারধারে পাম, সুপারি, বোগনভালিয়া ইত্যাদি গাছ ও ঝোপ, একেবারে সেই বাড়ির দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত। ছায়ার ভেতর পাথরের টেবিল ও কাঠের চেয়ার ফেলা আছে। ইঙ্গিতে একটা টেবিল দেখাল রানা। 'বসো এখানে। কফি খাবে, নাকি কোক?'

'সকালে আমাকে নিডো কফি খাইয়েছে,' বলল পবন।

'তাহলে কোক চলুক।'

বাড়ির ভেতর চলে গেল রানা। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সামনে বিস্তৃত গোজোর দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল পবন। খামারবাড়িটা পাহাড়ের মাথায় বলে দূরে কোমিনো দ্বীপটাও দেখা যাচ্ছে, ওটার সামনে অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে মাল্টা। পবনের মনে হলো, এত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব কমই দেখেছে সে।

গোজোর প্রতিটি পাহাড়ের মাথায় সাজানো-গোছানো কয়েকটা করে বাড়ি আছে।

রানা ফিরে আসার পর মুখোমুখি বসল ওরা। এজেন্সির মাধ্যমে পবন, তার বোন পাখি, ওদের গোটা পরিবার সম্পর্কে আগেই সমস্ত খবর সংগ্রহ করেছে রানা, এখন আবার প্রশ্ন করে ওর মুখ থেকেও শুনল। ওদের বাবা লন্ডনে ব্যবসা করতেন, বাংলাদেশ থেকে সবজি আনিয়ে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিতেন। দশ বছর ধরে ইংল্যান্ডে আছে ওরা, টাকা জমিয়ে লন্ডনে ছোট একটা ফ্ল্যাটও কিনেছে। পাখি পারফর্মিং আর্টসে ডিগ্রী নেয়ার জন্যে কলেজে পড়াশোনা করছিল, পবন ছিল স্কুলে, এই সময় ওদের বাবা হার্ট অপারেশনের সময় মারা যান। বাবা মারা যাবার পর খুব আর্থিক সঙ্কটে পড়ে ওরা। বাবার অপারেশন করাতে বেশ কিছু টাকা বেরিয়ে যায়, ফলে ব্যবসার পুঁজি বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। বাধ্য হয়ে ফ্ল্যাটটা এক ব্যাংকে মর্টগেজ রেখে বেশ কিছু টাকা ঋণ নেন ওদের মা, সবজি আমদানী করার ব্যবসাটা নিজেই শুরু করেন। পাখি ডিগ্রী নিয়েছে, কিন্তু টিভিতে ছোট-খাট দু'একটা কাজ ছাড়া বেকারই বলা যায় তাকে। আর পবন মাত্র কলেজে উঠেছে, এই সময় মা-ও চলে গেল। পাখি বা পবন ব্যবসার কিছু বোঝে না, ফলে আর্থিক দিক দিয়ে খুব বিপদেই পড়তে হবে ওদেরকে।

ওদের একমাত্র মামা থাকেন যুক্তরাষ্ট্রে, তিনি মৃত্যুশয্যা থেকে বোনকে দেখতে চাওয়াতেই সাউদিয়া একশো তিন-এর টিকেট কেটে ওয়াশিংটন যাচ্ছিলেন ওদের মা। টিকেটের দাম ও পথ-খরচার টাকা তাঁকে তাঁর ভাইই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্লেনটা জার্মানী থেকে রওনা হয়, লন্ডন ছুঁয়ে ওয়াশিংটন যাচ্ছিল।

সাউদিয়া একশো তিন-এ বাংলাদেশের তিনজন কূটনীতিক ছাড়াও বসনিয়া-হার্জেগোভিনার দু'জন সামরিক অফিসার ছিলেন। বসনিয়া মুসলমানদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ দরকার, সে-সব দান হিসেবে পাইয়ে দেয়ার জন্যে বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশে ওই তিনজন কূটনীতিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রাখছিলেন। ব্যাপারটা রানা জানতে পারে আকাশে প্লেনটা বিধ্বস্ত হবার পর। কারও মনে যাতে কোন সন্দেহ না জাগে, সেজন্যে লন্ডন থেকে ওয়াশিংটনে যাচ্ছিলেন ওঁরা। কথা ছিল ওখানকার সৌদি দূতাবাসে গোপন একটা মীটিঙে বসে আলোচনা করা হবে কি পরিমাণ অস্ত্র দরকার আর কিভাবে তা সরবরাহ করা সম্ভব। অস্ত্র দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছে সৌদি আরব সহ মুসলিম প্রধান বেশ কয়েকটা দেশ, তবে বসনিয়া-হার্জেগোভিনার ওপর এমবার্গো থাকায় ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।

রানা অবশ্য এ-সব প্রসঙ্গে পবনের সঙ্গে কোন আলাপ করল না। পবন থামতে ও বলল, 'আমিও বললাম ইচ্ছে থাকলে প্রতিশোধ নেয়া যায়, আর তুমিও ঝোঁকের মাথায় চলে এলে, কিন্তু এখন ভাবছি...,' ইতস্তত করছে রানা। '...তুমি কি সত্যি পারবে? কাজটায় বিপদের ঝুঁকি খুব বেশি, পবন। অত্যন্ত কঠিনও। তোমাকে রীতিমত সাধনা করতে হবে।'

পবন জিজ্ঞেস করল, 'আপনাকে আমি কি বলে ডাকব?'

'মাসুদ ভাই বলতে পারো।'

'মাসুদ ভাই, আপনার ভুল হলো। আমি ঝোঁকের মাথায় আসিনি। আমাকে

নিয়ে অনেক বড় স্বপ্ন ছিল আমার মায়ের। বাবা মারা যাবার পর বলতেন, তিনি শুধু আমাদের দুই ভাই-বোনের জন্যে বেঁচে আছেন। দু'জনেই আমরা মাকে এত ভালবাসতাম···সে আপনাকে বলে বোঝাতে পারব না। মা নেই শুনে এত অসহায় বোধ করি, শুধু কান্না পাচ্ছিল। তারপর আপনার কথা শুনে বুঝলাম, মাকে যে ভালবাসতাম তার প্রমাণ দিতে না পারলে কিসের ছেলে আমি? আমি তো এখন আর ছোট নই, গত হপ্তায় আঠারোয় পড়েছি, কিভাবে কি করতে হবে বলে দিলে কেন আমি এই খুনের বদলা নিতে পারব না?'

'খুন কিনা তা তুমি জানো?'

'সবাই তো তাই বলছে, আপনিও বলেছেন। খুন না হলে প্রতিশোধ নেয়ার কথা তুললেন কেন?'

'ঠিক আছে, দেখা যাক,' বলল রানা। 'শোনো, পবন, তোমার গুরুজন বলতে তো পাখি, তাই না? তোমাকে যদি আমি সঙ্গে রাখি, তোমার আপার অনুমতি পেতে হবে আমাকে।'

পবন হাসল। 'আপা বলছিল, মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে আমার বদলে সে-ই আসত। গোজোয় এসে রুচিতা'স থেকে ফোন করেছি আমি, আপা বলল আমি যেন আপনার কথা মত চলি।'

'তবু, তোমার আপার সঙ্গে আমাকে একবার কথা বলতে হবে।'

হঠাৎ পবন জানতে চাইল, 'আপনার শরীরে এত কাটাকুটির দাগ কেন?'

'মাঝে মধ্যে যুদ্ধ করতে হয় তো, তাই।'

'কোথায়?' পবন অবাক।

'বলো কোথায় নয়। আফ্রিকায়—উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে। এশিয়ায়। মধ্যপ্রাচ্যে। সবখানে।'

'আপনি কি ভাড়াটে সৈনিক? মানে মার্সেনারি?'

'আমি আসলে জগাখিচুড়ি, তবে সামরিক বাহিনীতে ছিলাম। দেশের কাজ করি।'

'এ-কথা বলা যায়—আপনি দুষ্টকে দমন করেন, শিষ্টকে পালন করেন? গোয়েন্দা বা থ্রিলার বইগুলোতে যেমন দেখা যায়? মানে, আপনি কি শুধু মানুষের মঙ্গলই করেন, নাকি···?'

হেসে ফেলল রানা। তারপর বলল, 'এ-সব কথা থাক। যদি আমার সঙ্গে থাকো, নিজেই সব জানতে পারবে। এখন বলো দেখি, তুমি সাঁতার জানো?' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ও।

'জানি না মানে? স্কুলের সাঁতার প্রতিযোগিতায় ফি বছর আমিই তো ফার্স্ট হতাম।'

'কি আশ্চর্য, পবন, তাহলে আমরা দেরি করছি কেন? এসো, লাফ দাও।'

'কিন্তু আমার সঙ্গে তো সুইম সুট নেই।'

'দরকার কি!' হাসছে রানা। 'কাপড়চোপড় খুলে নেমে পড়ো। আর খুব বেশি লজ্জা পেলে শুধু আন্ডারপ্যান্টটা থাকুক।'

একসঙ্গে সাঁতরাচ্ছে ওরা। পুলটা চল্লিশ ফুট লম্বা। এক সময় রানা বলল,

'এসো, দেখি তুমি আমার সঙ্গে পারো কিনা। এখান থেকে শুরু, এখানে ফিরে এসে শেষ, ঠিক আছে?'

পবন খুব ভাল সাঁতারু, তবু ছয় ফুট পিছনে পড়ল সে। পুলের কিনারা আঁকড়ে ধরে ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, বলল, 'নিজের কাছেই লজ্জা পেলাম। ভেবেছিলাম অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারব আপনাকে।'

'এখানে যখন থাকি, রোজ একশোবার আসি-যাই। সাঁতারের মত ভাল এক্সারসাইজ আর হয় না।'

খামারবাড়ির পুরানো অংশে, নিজের স্টাডিরুমে বসে কাজ করছে রানা। দোতলায় এটাই একমাত্র কামরা, কামরার পিছনে পাহাড়-প্রাচীর। সিলিংটা উঁচু, খিলান আকৃতির। একদিকের পুরোটা দেয়াল ঘেঁষে একটা লম্বা টেবিল ফেলা হয়েছে, সেটার ওপর এই মুহূর্তে নিউজপেপারের কাটিং ও পত্র-পত্রিকার স্তূপ। কামরার উল্টোদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক সারি ফাইলিং কেবিনেট। রানার ডেস্কটা বড় খিলান আকৃতির একটা দরজার সামনে, এখান থেকে মুখ তুলে তাকালে দু'পাশে পাঁচিল দেয়া খাড়া পথটা দেখা যায়, এঁকেবেঁকে উঠে এসেছে চূড়ায়। আজ সকালে খবরের কাগজের কিছু কাটিং ও কয়েকটা ম্যাগাজিন এসেছে ডাকে। পাঠিয়েছে রানা এজেন্সির বন, নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন শাখা। মিড্‌ল্টন সম্পর্কে যে-কোন লেখা দেখলেই গোজোয় পাঠিয়ে দিচ্ছে ওরা। গত দু'মাসে স্রোতটা মন্থর হয়ে গেছে, তবু এখনও যা আসছে তাতে প্রতিদিন দু'তিন ঘণ্টা সময় দিতে হচ্ছে রানাকে। এই মুহূর্তে টাইম ম্যাগাজিনের একটা আর্টিকেল পড়ছে ও, আলোচনা করা হয়েছে সাউদিয়া একশো তিন মাঝ আকাশে বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে জার্মানীতে লুকিয়ে থাকা আরব টেরোরিস্টরা দায়ী কিনা। মাঝে মধ্যে একটা নোটবুকে কিছু লিখছে রানা।

কাজ করতে করতে চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। ইউরোপ ও আমেরিকার সমস্ত পত্র-পত্রিকা গোটা ব্যাপারটাকে একচোখে দেখছে। কেউ আভাস-ইঙ্গিতে, কেউ খোলাখুলি একই কথা বলতে চাইছে, এর জন্যে মুসলিম চরমপন্থীরা দায়ী না হয়ে যায় না। খারাপ কিছু যেখানে যা-ই ঘটুক, মুসলমানদের দায়ী করা উন্নত বিশ্বে প্রায় একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্লেনটায় মুসলিম-প্রধান বসনিয়া সরকারের দু'জন সামরিক অফিসার ছিলেন, ছিলেন বাংলাদেশের তিনজন কূটনীতিক, ইউরোপ ও মার্কিন মিডিয়া এই ব্যাপারটাকে কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। যে প্লেনের আরোহীরা বেশিরভাগই ছিল মুসলমান, আরব মৌলবাদী টেরোরিস্টরা কেন সেটা বোমা মেরে উড়িয়ে দেবে, এ প্রশ্ন ভুলেও কেউ তুলছে না।

এক চোখ বুজে থাকলে যা হয় আর কি। বসনিয়ার বিচ্ছিন্নতাবাদী সার্বরা বেশ কিছুদিন ধরে হুমকি দিয়ে আসছে, কোন রাষ্ট্র বসনিয়া সরকারকে অস্ত্র সাহায্য দিলে পাল্টা প্রতিশোধ নেবে তারা। কুখ্যাত কিছু টেরোরিস্টকে নিয়ে সার্বিয়ায় একটা গ্রুপও গঠন করেছে তারা, প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে স্যাবোটাজ করাই তাদের কাজ। অথচ এ নিয়ে কিছু বলতে বা লিখতে রাজি নয় কেউ।

কাজ থেকে মুখ তুলে মাঝে মধ্যে নিচের গ্রামের দিকে তাকাচ্ছে রানা। প্রায়

এক ঘণ্টা পর পাঁচিল ঘেরা পথটা ধরে উঠে আসতে দেখা গেল পবনকে। সাগরের কিনারায় হাঁটতে গিয়েছিল সে। ডেস্ক ছেড়ে উঠল না রানা, বাড়ির দরজা খোলা রেখেই বসেছে ও। গলা চড়িয়ে বলল, 'দশ মিনিটের মধ্যে নামছি আমি। ফ্রিজে চকলেট আর কোক আছে, হেলপ ইওরসেলফ।'

পুলের কিনারা ধরে হাঁটছে ওরা। উত্তরে বাতাসে পাম গাছের পাতা দুলছে। কথা না বলে আধ ঘণ্টা হাঁটল ওরা। এক সময় পবন জানতে চাইল, 'কিছু মনে না করলে আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'কেন কিছু মনে করব, গো অ্যাহেড।'

'ওরা আপনার কে ছিল?'

বোঝা গেল ভায়োলা আর বৃষ্টির কথা জানতে চাইছে পবন। আবার হাঁটতে শুরু করল রানা, পুলটাকে একপাক ঘুরে এসে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সব কথা। প্রথমে রেমারিকের সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের কথা বলল ও। তারপর লুবনা প্রসঙ্গ চলে এল। কিশোরী লুবনার বডিগার্ড হিসেবে চাকরিটা রেমারিকই ওকে যোগাড় করে দেয়। কিন্তু নিষ্পাপ কচি মেয়েটাকে বাঁচাতে পারেনি ও। ইটালিয়ান মাফিয়ার লোকজন তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, মুক্তিপণ দেয়ার পরও রেপ করে মেরে ফেলে। মেয়েটাকে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর আহত হয় রানা। সে-সময় ওর শরীর পুরোপুরি ফিট ছিল না। বন্ধু রেমারিক তার শ্বশুরবাড়ি গোজোয় পাঠায় ওকে, ফিটনেস ফিরে পাবার জন্যে, প্রতিশোধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্যেও। তখনই রেমারিকের শ্বশুর পাজেরো তাজা, শাশুড়ি অনোরিয়া, শ্যালক নিডো আর শ্যালিকা ভায়োলার সঙ্গে পরিচয় হয় রানার। ভায়োলার সঙ্গে পরিচয়টা ধীরে ধীরে ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়িয়ে যায়। পুরানো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল রানার, যদিও সব কথা পবনকে বলল না।

লুবনা মারা যাবার পর রানা তখন গোজোয়, ভায়োলাদের বাড়িতে রয়েছে। ভোর অন্ধকার থাকতে ঘুম ভাঙে ভায়োলার, দোতলায় উঠে রানার দরজায় টোকা দেয়। রানার সাড়া পেলে নিচে নেমে কফি তৈরি করে, তারপর আবার দু'তলায় উঠে এসে দেখে ব্যায়াম শুরু করেছে রানা। বিছানায় বসে ওকে ঘেমে নেয়ে উঠতে দেখে সে। তারপর চেয়ারে বসে কফি খায় রানা। তখনও সূর্য ওঠে নাই, গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ, সবাই ঘুমিয়ে আছে। চুপচাপ থাকে ওরা, দু'একটা কথা হয় কি হয় না। ভায়োলা খুবই সুন্দরী, কিন্তু সেটা ভুলে থাকতে চেষ্টা করে রানা। কফি শেষ করে দৌড়াতে যায় ও—তখন প্রথম দিকে একটানা দশ মাইল দৌড়াত। দৌড় শেষ করে খুদে ইনলেটে চলে আসে, এসে দেখে ভায়োলা সেখানে আগেই হাজির হয়েছে, ঠাণ্ডা পানীয় আর তোয়ালে নিয়ে অপেক্ষা করছে ওর জন্যে। ডাইভ দিয়ে পানিতে নামে রানা, কোমিনো হয়ে তিনবার ফিরে আসে। সবশেষে সমতল পাথরে আধ ঘণ্টা শুয়ে থাকে, ওর পাশে বসে বা শুয়ে থাকে ভায়োলা।

সন্ধের সময় আবার রানার সঙ্গে দেখা হয় ভায়োলার, খুদে ইনলেটে সাঁতার কাটে দু'জন। তখন ওদের মধ্যে কিছু কিছু কথাবার্তা হয়। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তোলে না কেউ, অতীত আর ভবিষ্যতের কথা সযত্নে এড়িয়ে যায় দু'জনেই। তবে

আভাসে ভায়োলা জানিয়ে দিয়েছে, তার কোন প্রত্যাশা নেই, কিছু ভাল লাগা আছে, আছে রানার প্রতি সমর্থন ও সহানুভূতি। সেবা, শুশ্রূষা আর সঙ্গ দিয়ে নিজেই তৃপ্তি পেতে চায় সে; অনুরোধ—নারীসুলভ তার এই আচরণকে যেন অন্য চোখে দেখা না হয়।

রানা বুঝতে পারে, ভায়োলা অসাধারণ বুদ্ধিমতী, মনটাও ফুলের মত নরম। সময় এভাবেই বয়ে চলল, কিন্তু ওদের সম্পর্ক আগের মতই থাকল। ভায়োলা সব সময় রানার কাছাকাছি আছে, কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ হবার কোন চেষ্টা নেই তার। নাগালের মধ্যে রয়েছে ভায়োলা, কিন্তু হাত বাড়াবার কোন প্রবণতা রানার মধ্যে দেখা যায় না। তারপর একদিন···

পাহাড়ী পথ ধরে ধীরে ধীরে উঠছে ল্যান্ড-রোভার, ভায়োলাকে নিয়ে বাড়ি ফিরছে রানা। বিয়ার একটু বেশি খাওয়া হয়ে গেছে ওর, তবে নেশা হয়নি। ভায়োলা খুব বেশি খায়নি, কিন্তু রুচিতা'স-এ থাকতেই তার চোখে ঢুলু ঢুলু একটা ভাব লক্ষ করেছে ও। গভীর রাত, চারদিকে নির্জন বন-জঙ্গল আর নিস্তব্ধ পাহাড়। শুধু কৌতূহল নয়, সেই সঙ্গে পুলক অনুভব করল রানা। ভাবল, কি ব্যাপার, এভাবে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন ভায়োলা?

আর ভায়োলা তখন ভাবছিল, অনেক বছর পর একজন পুরুষ আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু সে কি সত্যি নির্লোভ দেবতা? নাকি ভালবাসতে জানে না, শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে হবে? এত কাছাকাছি থাকি, অথচ স্পর্শটুকুও পাই না—একি ওর ভদ্রতা, নাকি অনীহা? কিন্তু আমি তো অসুন্দরী নই! আমাকে পাবার জন্যে কত লোকই তো পাগল। তবে কি অহঙ্কারী ও? আশা করছে, প্রথম নিবেদন আমার তরফ থেকে আসুক?

পাহাড়ের মাথায় উঠে এল ল্যান্ড-রোভার। এখনও ভায়োলার দৃষ্টি অনুভব করছে রানা। ভাবছে, ও কিছু বলে না কেন? কি করে বুঝব আমি ওকে কাছে টানতে চাইলে ফোঁস করে ফণা তুলবে না?

পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল গাড়ি। ডান পাশে সাগর, পাথরে ঢেউ আছড়ে পড়ার আওয়াজ পাওয়া গেল। দু'জনেই ওরা আড়ষ্ট, ঘামছে একটু একটু, ঢোক গিলছে।

এভাবেই হয়তো বাড়ি ফিরত ওরা, বুকভরা বঞ্চনা আর অতৃপ্তি নিয়ে। কিন্তু ওদেরকে সাহায্য করল একটা জানোয়ার। রাস্তা পেরোতে গিয়ে গাড়ির সামনে পড়ে গেল একটা শিয়াল, ঘ্যাচ করে ব্রেক করল রানা। ঝাঁকি খেয়ে ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ভায়োলা। শুধু হুমড়ি খেয়ে পড়েনি, দু'হাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরেছে ওকে। এঞ্জিন বন্ধ হলো, খুলে গেল মনের দুয়ার।

কেউ দেখলে চোখ কপালে উঠত তার, জড়াজড়ি করে গাড়ি থেকে নামার সময় কিম্ভূত আকৃতির দু'মুখো একটা প্রাণী মনে হলো ওদেরকে, যেন প্রকৃতির অদ্ভুত একটা খেয়াল।

খুদে ইনলেটে চলে এল ওরা, পানির ওপর ঝুলে থাকা পাথরে দাঁড়িয়ে থাকল, দুটো শরীর পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে আছে। তারপর দু'জন একসঙ্গে ঝুপ করে পড়ল সাগরে।

সাগর থেকে উঠে পাথরের উপর পাশাপাশি শুয়ে থাকল ওরা। প্রথমে কথা বলল ভায়োলা। 'অনেক কথা বলতে চাই, কিন্তু কিভাবে বলতে হয় জানি না।'

'আমি তোমাকে ভালবাসি, এভাবে শুরু করতে পারো,' মুচকি হেসে উৎসাহ দিল রানা।

ভায়োলা হাসল না, সে বলল, 'একবার ঠকেছি, আর নয়—নিজেকে কারও সঙ্গে বাঁধব না, কাউকে বিয়ে করব না, এভাবে যদি শুরু করি?'

'তাহলে জিজ্ঞেস করব, কাছে এলে কেন?'

'ভাল লেগেছে, তাই। যতদিন তোমাকে ভাল লাগবে, আমি তোমার। কাছে এলে যদি বুকে টেনে নাও, খুশি হব, কৃতজ্ঞ বোধ করব। যদি ফিরিয়ে দাও, আহত হব, কিন্তু অভিশাপ দেব না—ভালবাসার দাবি নিয়ে তোমাকে দখল করতে চাইব না।'

'কিন্তু জীবন? ভবিষ্যৎ?'

'সে তো তোমাকে দেখার আগেই একটা ছকে ফেলে সাজিয়ে রেখেছি,' বলল ভায়োলা। 'বিয়ে নয়, বাঁধন নয়, মুক্ত-স্বাধীন জীবন। আর ভবিষ্যৎ? আগের প্ল্যানে কারও জন্যে অপেক্ষা ছিল না, এখন থাকবে। জানি, চলে যাবে তুমি। আর হয়তো কোনদিন দেখা হবে না। কিন্তু তবু আমি অপেক্ষা করব। যদি কখনও ফেরো, নিজেকে নিবেদন করে ধন্য হব...'

লুবনা হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিয়ে সত্যি আবার ভায়োলার কাছে ফিরতে হয়েছিল রানাকে, সেবার সুস্থ হবার জন্যে একটানা ছ'মাস ভায়োলার সেবা-শুশ্রূষা পাবার দরকার হয়েছিল ওর। তখনই ভায়োলা আর বৃষ্টির থাকার জন্যে এই পুরানো খামারবাড়িটা কিনে খানিকটা অংশ নতুন করে তৈরি করা হয়। তারপর থেকে প্রতি বছর এখানে এসে দিন পনেরো বেড়িয়ে গেছে রানা। ভায়োলার সঙ্গে ওর সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করা একটু কঠিন। দু'জনেই ওরা সিদ্ধান্তে আসে, পরস্পরকে ভালবাসে ওরা, তবে দু'জনের কেউই কোন রকম শর্তে বা একঘেয়ে নিয়মে বাঁধা পড়তে চায় না।

বৃষ্টির লেখাপড়ার খরচ, বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, সংসার চালাবার খরচ, সবই দিচ্ছিল রানা। ছোট্ট মেয়েটা কখনও ওকে আংকেল বলত, আবার কখনও ফ্রেন্ড। এই বাড়িও নিজের নামে কেনেনি রানা, কিনেছিল ভায়োলা আর বৃষ্টির নামে।

সংক্ষেপে সব কথা বলার পর রানা পবনকে জানাল, 'এই বাড়িটা আর দরকার নেই আমার। গোজোয় আমি ভবিষ্যতেও আসব, তবে উঠব নিডোদের বাড়িতে।'

'তাহলে এত সুন্দর বাড়িটা আপনি কি করবেন?' জিজ্ঞেস করল পবন। 'বিক্রি করে দেবেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভায়োলা আর বৃষ্টির স্মৃতি, এ আমি বিক্রি করতে পারি না। ভাবছি কাউকে উপহার দেব। এতিম কাউকে।'

পবন মৃদু কণ্ঠে বলল, 'ওদেরকে সত্যি আপনি ভালবাসতেন।'

'তোমার বাবা ও মা দু'জনেই মারা গেছেন,' বলল রানা। 'এই কাজটায় তোমাকে যদি আমি সঙ্গে রাখি, আর কাজটা ভালয় ভালয় শেষ হলে আমি যদি

বাড়িটা তোমাকে দিই…'

পবনের মাথা খুব দ্রুত কাজ করে, রানার কথা শেষ হবার আগেই বাধা দিল সে, 'মাসুদ ভাই, কি বলছেন আপনি! আপনার দান আমি নেব কেন?'

'দান তো নয়, পবন, উপহার। তোমাকেই কেন দিতে চাইছি, জানো? আমি জানি, তোমাকে দিলে ভায়োলা আর বৃষ্টির আত্মা খুশি হবে।' পবন আবার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'এ প্রসঙ্গ এখন থাক, কেমন? শোনো, কাল আমি চলে যাচ্ছি, ফিরতে দু'এক হপ্তা দেরি হতে পারে। একা থাকতে খারাপ লাগলে নিডোকে ডেকে নিয়ো। ফেরার সময় আমি তোমার বোনকে নিয়ে আসব।'

'আপাকে? কেন?' পবন অবাক।

'আমাদের একটা প্রতিপক্ষ তৈরি হবে, পবন। আমরা যাদেরকে শায়েস্তা করতে চাই,' বলল রানা। 'আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি জানলে তারাও চুপ করে বসে থাকবে না। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, তোমার বোনের ওপর আঘাত আসতে পারে। কাজেই তাকে আমাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে এনে রাখতে হবে।'

আগেই ফোন করেছিল রানা, ওর জন্যে নিজেদের ফ্ল্যাটে অপেক্ষা করছিল পাখি। তিন কামরার ছোট্ট ফ্ল্যাট, সাজানোয় সুন্দর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। দরজা খুলে দিয়েই পাখি জানতে চাইল, 'পবন কেমন আছে?'

'সে ভাল আছে,' জবাব দিল রানা। 'আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আমাকে…কি বলছেন? আমি কোথায় যাব? কেন যাব?'

'বসতে বলবেন না?' ভেতরে ঢুকে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, দরজাটা যাতে পাখিই বন্ধ করে।

দরজা বন্ধ করে ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখাল পাখি। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…'

'আগে বলুন, আমার পরিচয় সম্পর্কে আপনি পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন কিনা।' বসল রানা, হাত তুলে সামনের সোফাটা দেখাল। 'শান্ত হয়ে আপনিও বসুন, তারপর জবাব দিন।'

'হ্যাঁ, আপনার সম্পর্কে জেনেছি,' বলল পাখি, সে বসল না। 'একটা গোয়েন্দা সংস্থার ডিরেক্টর, খুব সুনাম আছে…আপনাকে একজন বিখ্যাত ব্যক্তিই বলা যায়। কিন্তু…'

'আমার পরের প্রশ্ন, পবন যে প্রতিশোধ নিতে চায়, তাতে আপনার সমর্থন আছে কিনা?'

হঠাৎ কঠিন হয়ে উঠল পাখির চেহারা। 'প্রতিশোধ তো আমিও নিতে চাই, কিন্তু…'

'তারমানে আপনার সমর্থন আছে। কিন্তু প্রতিশোধ নিতে চাইলে ঝুঁকি আছে, এ-কথা জানেন তো?'

'কি ঝুঁকি?'

'প্রতিপক্ষ হামলা করতে পারে, আমরা মারাও যেতে পারি,' বলল রানা।

'তাহলে দরকার নেই,' তাড়াতাড়ি বলল পাখি, তার চেহারায় আতঙ্ক। 'পবন আমার একমাত্র ভাই। ও ছাড়া কেউই তো আর বেঁচে নেই।'

'আপনি বললে ওকে আমি ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

এবার বসল পাখি, মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করছে।

'কি ভাবছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাবছি ফেরত পাঠালে পবনের কি প্রতিক্রিয়া হবে। সে বলে গেছে, এই কাজে আমি তাকে বাধা দিলে যেদিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাবে, কোনদিন আর ফিরে আসবে না। যা জেদী ছেলে...।' চুপ করে গেল পাখি, তারপর মুখ তুলে বলল, 'এত যখন ঝুঁকি, হামলার ভয়, আপনিই বা...'

রানা বলল, 'এটা আমার পেশা। তাছাড়া, নিজেকে আমি রক্ষা করতে জানি।'

পাখি বলল, 'পবনকে আপনার প্ররোচিত করা উচিত হয়নি। আপনার কথা শুনেই তো এই পোকা ঢুকেছে তার মাথায়।'

'আমি আপনাকে তো প্ররোচিত করিনি, অথচ আপনিও প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভেবেছেন,' মনে করিয়ে দিল রানা।

'ঝগড়া করে লাভ কি,' নিচু গলায় বলল পাখি। 'এর একটা সমাধান বের করুন। প্লীজ।'

রানা কিছু বলল না।

পাখি আবার বলল, 'ঝুঁকির মাত্রা কি কমানো যায় না? আপনি ওর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিতে পারেন না?'

'ওকে যদি আমি ট্রেনিং দিই, ঝুঁকির মাত্রা কমবে। তাতে সময়ের প্রয়োজন, কিন্তু অত সময় আমরা পাব কিনা জানি না। আর নিরাপত্তার কথা যদি বলেন, আমার কথামত চললে ওর কোন বিপদ হবে না। তবু আমি চাই আপনি জানুন যে কমবেশি ঝুঁকি সব সময় থাকবে, ট্রেনিং নিক বা না নিক।'

'মুশকিল হলো, একটা মাস আপনার অফিসে আসা-যাওয়া করায় গোয়েন্দা হবার নেশায় পেয়েছে ওকে,' অভিযোগের সুরে বলল পাখি। 'আমি ওকে অনেক বুঝিয়েছি। এমন কি এ-কথাও বলেছি যে যারা দায়ী আপনি তাদেরকে শায়েস্তা তো করবেনই, ওর না গেলেও চলে। কিন্তু আমার কোন কথাই শুনতে রাজি নয়, বলল কাজটা নিজে করতে না পারলে শান্তি নেই ওর।'

'আমি আপনার সিদ্ধান্ত জানতে এসেছি,' বলল রানা। 'যদি চান, দু'দিন চিন্তা করে দেখে তারপর জানান আমাকে। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আরও কয়েকটা কথা জানা দরকার আপনার।'

'কি কথা?'

'আমার কিছু প্রশ্ন আছে।'

'বলুন।'

'আপনি তো বিয়ে করেননি বলে শুনেছি। কারও সঙ্গে কোন অ্যাফেয়ার আছে কি?'

পাখির চেহারায় অসন্তোষ। 'না,' সংক্ষেপে জবাব দিল সে।

'বাজে কোন নেশা আছে? মানে, মদ বা অন্য কিছু খান?'

সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পাখি। 'আপনি তো আশ্চর্য লোক! একটা মেয়েকে এ-সব প্রশ্ন করতে আপনার বাধছে না?'

'রাগ করবেন না, বসুন,' নরম সুরে বলল রানা। 'জানার প্রয়োজন আছে বলেই এ-সব অপ্রীতিকর প্রশ্ন করতে হচ্ছে। খান?'

আবার বসল পাখি। কঠিন সুরে বলল, 'না।'

'এবার শুনুন। পবন যদি আমার সঙ্গে থাকে, আপনার তাহলে লন্ডনে থাকা চলবে না।' পাখির নিরাপত্তার সমস্যাটা ব্যাখ্যা করল রানা। 'যতদিন না ব্যাপারটা মিটে যায় ততদিন গোজোয় আমার বাড়িতে থাকতে হবে আপনাকে। কতদিন, তা বলা যাচ্ছে না—ধরে নিন তিন থেকে ছ'মাস।'

'অসম্ভব,' বলল পাখি। 'লন্ডন ছেড়ে নড়ার উপায় নেই আমার।'

'কেন?'

'মঞ্চ আর টিভিতে ছোটখাট কিছু কাজ পেয়েছি,' খানিক ইতস্তত করে বলল পাখি। 'আমার ক্যারিয়ারের প্রশ্ন তো আছেই, আর রোজগার করতে না পারলে ফ্ল্যাটটা নিলাম হয়ে যাবে। এটা একটা ব্যাংকে মর্টগেজ দেয়া আছে…'

'কত টাকা বাকি এখনও?' জানতে চাইল রানা।

'তেরো হাজার পাঁচশো বিশ পাউন্ড পঞ্চান্ন পেন্স।'

'সুদের হার?'

'সাড়ে সতেরো পারসেন্ট।'

'আমি কি করতে পারি জানা থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে সুবিধে হবে আপনার,' বলল রানা। 'মঞ্চ আর টিভিতে আমার কিছু বন্ধু আছে, আমি বলে দিলে বড় কোন কাজ আপনাকে দিয়ে করানো যাবে কিনা যাচাই করে দেখতে রাজি হবে ওরা। আরেকটা কথা, পবন যদি কাজ করে, রানা এজেন্সি থেকে বেতন-ভাতা ইত্যাদি পাবে সে—চাইলে তাকে অগ্রিম কিছু টাকাও দেয়া যাবে। মানে বলতে চাইছি, ব্যাংকের টাকা শোধ করা কোন সমস্যা হবে না।'

'পবন রোজগার করবে, বেতন-ভাতা পাবে?' চোখ কপালে উঠল পাখির। 'ও কোন কাজ জানে নাকি যে আপনি ওকে…'

'শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয়া হবে,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'শুধু এই কাজটাই শেষ নয়, লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে পরে আরও অনেক কাজ করানো হবে ওকে দিয়ে।' সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'আজ আসি, দু'দিন পর খবর নেব।'

'ছি-ছি, আপনাকে এক কাপ কফি খেতেও বলা হয়নি…,' লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেল পাখি। 'ইস্…!'

'আরেকদিন খাব,' বলে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে বেরিয়ে এল রানা। সিঁড়ি দিয়ে নামছে, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখল দরজা বন্ধ করতে গিয়ে থমকে গেছে পাখি। ওখানে দাঁড়িয়েই মনে মনে একটা হিসাব করল রানা। তারপর সিঁড়ির মাথায় উঠে এসে পকেট থেকে একশো পাউন্ডের একটা বান্ডিল বের করল। কয়েকটা নোট আলাদা করে বাড়িয়ে দিল পাখির দিকে। 'পবনের পাওনা টাকা—অ্যাডভান্স করছি। আগামী ছ'মাসের সুদ আছে এখানে।'

'কিন্তু এখনও তো ঠিক হয়নি পবন আপনার সঙ্গে কাজ করবে কিনা…এ টাকা

আমি নিতে পারব না।'

'এই কাজটা যদি না-ও করতে দেন, ওকে দিয়ে আমরা অন্য কাজ করাব, যে-কাজে ঝুঁকি কম বা একেবারে নেই,' বলল রানা। 'তাতেও যদি আপত্তি থাকে, পরে এক সময় ফেরত দেবেন,' বলে টাকাগুলো পাখির হাতে গুঁজে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও।

রানা চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে কবাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পাখি। চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছে মুখ, কিন্তু কোন শব্দ করল না বা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছলও না।

চার

সাব্বির খান বেশি দাম দিয়েছে, আর বেশি দাম দিলে সেরা জিনিসটিই চাই তার, সবচেয়ে ভালটা। ফ্রান্সের ক্যানেস-এ রয়েছে সে, কার্লটন হোটেলে। এই শহরে এটাই সবচেয়ে ভাল হোটেল, কিন্তু বিছানার ওপর তার পাশে যে মেয়েটি রয়েছে তাকে কোন মতেই সেরা বলা যায় না, অথচ প্রচলিত রেটের চেয়ে অনেক বেশি টাকা দিয়েছে সে।

মেয়েটাকে যা করতে বলা হচ্ছে তা সে করছে না। ফ্রেঞ্চ ভাষায় বিড়বিড় করে কি যেন বলল সে, তারপর সরে শুলো। রেগে গেল সাব্বির, বলল, 'কি হলো, তোমাকে তাহলে আমি পাঁচশো ডলার অ্যাডভ্যান্স করলাম কি জন্যে?'

'আপনি যা চাইছেন তা পেতে হলে আরও পাঁচশো ডলার দিতে হবে,' সোজাসুজি জানিয়ে দিল মেয়েটা।

গাল দিল সাব্বির, 'ঠিক আছে, বেশ্যা মাগী!' এরপর আবার সে তার বিকৃত রুচি চরিতার্থ করার চেষ্টা চালাল।

কিন্তু আবার সরে গেল মেয়েটা। 'টাকাটা আগে আমার হাতে দিন।'

আবার গাল দিল সাব্বির। একটা গড়ান দিয়ে বিছানা থেকে নামল, ঢুকল বাথরুমে। এক মিনিট পর হাতে একটা পাঁচশো ডলারের নোট নিয়ে বেরিয়ে এল। মেয়েটা উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে, বাম হাত খোলা। নোটটা তাতে গুঁজে দিল সাব্বির। চোখের সামনে ধরে সেটা ভাল করে পরীক্ষা করল মেয়েটা, ঠিক যেভাবে প্রথম নোটটা পরীক্ষা করেছিল। 'ঠিক আছে, এবার আপনি নিজের পাওনা বুঝে নিন।'

ব্যাপারটা শুধু রুচি বিকৃতি নয়, নিষ্ঠুরও, তবে বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। সাব্বিরের মধ্যে দয়ামায়া বলে কিছু নেই। কাজ শেষ করে আবার একটা গড়ান দিয়ে বিছানা থেকে নামল সে। নিজের কাপড়চোপড় আর ব্যাগ নিয়ে বাথরুমে ঢুকল মেয়েটা, তৈরি হয়ে বেরিয়ে এল পাঁচ মিনিট পর। সাব্বিরের দিকে একবারও তাকাল না, লাউঞ্জ হয়ে বেরিয়ে গেল করিডরে, পিছনে সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা।

'ডাইনী,' ভাবল সাব্বির, পরমুহূর্তে তার সমস্ত চিন্তা-শক্তি লোপ পেল। ঝল-

বারান্দার ভারি পর্দাটা ফাঁক হয়ে গেল, ওখানে একজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মেয়ে নিয়ে বিছানায় থাকার সময় আলো জ্বেলে রাখা সাব্বিরের অভ্যাস। লোকটাকে দেখামাত্র চিনতে পারল সে, সঙ্গে সঙ্গে বরফ হয়ে গেল তার হৃৎপিণ্ড।

কালো ট্রাউজার আর কালো পোলো নেক শার্ট পরেছে লোকটা, শান্ত দৃঢ় ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে সাব্বিরের সামনে থামল। 'হ্যালো, সাব্বির,' বলল সে। 'নাকি বলা উচিত, হ্যালো রানা?'

লোকটার ডান হাতে কালো একটা ব্যাগ রয়েছে, ঠিক যে-ধরনের ব্যাগ ডাক্তারদের হাতে দেখা যায়। পুরো এক মিনিট পার করে নড়ল সাব্বির। পিছিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে বিছানার কিনারায় বসে পড়ল।

'যাও, ওগুলো নিয়ে এসো, সাব্বির।'

কোণঠাসা সাপ যে দৃষ্টিতে বেজির দিকে তাকিয়ে থাকে, সাব্বির সেই একই দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। তার গলা ভেঙে গেল, 'কি নিয়ে আসব?'

'টাকাগুলো, সাব্বির। বাথরূমে আছে।'

'কোন্ টাকা?' সাব্বিরের গলা থেকে আওয়াজ বেরুতে চাইছে না।

'সিনেটর ক্রিস্টোফার যেগুলো তোমাকে দিয়েছেন। যাও নিয়ে এসো। সবগুলো আনবে, একটা ডলারও রেখে আসবে না। বুঝতেই পারছ, আমি তোমাকে খুন করার ছুতো খুঁজছি।'

অত্যন্ত ধীরে ধীরে, অতি সাবধানে বিছানা ছেড়ে দাঁড়াল সাব্বির। চেয়ারটার দিকে এগোল, ওটার ওপর তার কাপড়চোপড় রয়েছে।

'না, সাব্বির। কাপড় না পরেই বাথরূমে ঢোকো।'

বাথরূমের দরজার দিকে এগোল সাব্বির। তার পিঠ লম্বা কালো লোমে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। দরজা খুলতে যাবে, পিছন থেকে নরম গলা শোনা গেল।

'সাব্বির, অস্ত্রটাও নিয়ে এসো। ছোট্ট বেরেটা, যেটা তুমি সব সময় টাকার সঙ্গেই রাখো। আর শোনো, বাথরূম থেকে বেরিয়ে আসার সময় টাকার বান্ডিলটা রাখবে ডান হাতে, বাম হাতে থাকবে বেরেটা—দু'আঙুলে ব্যারেলের শেষ মাথাটা ধরে থাকবে।' পা বাড়াতে যাবে সাব্বির, আবার ভেসে এল মোলায়েম কণ্ঠস্বর, 'তবে যদি চাও, বেরেটার বাঁটও ধরতে পারো। আমি তৈরি হয়েই আছি।'

সাপটা বাথরূমে ঢুকল। বেজি হাতের ব্যাগটা ফেলে দিল মেঝেতে। দাঁড়াল পা ফাঁক করে, হাত দুটো ট্রাউজারের পকেটে।

এক মিনিট পর বাথরূম থেকে বেরিয়ে এল সাপ। তার ডান হাতে একশো ডলার নোটের একটা বান্ডিল। বাঁ হাতে ছোট ও কালো একটা আগ্নেয়াস্ত্র, দু'আঙুলে ধরে আছে ব্যারেলের শেষ প্রান্ত।

রানা বলল, 'দুটোই বিছানার ওপর ছুঁড়ে দাও, সাব্বির।'

টাকা ও অস্ত্র বিছানার ওপর পড়ল। ঝুঁকল রানা, মেঝে থেকে কালো ব্যাগটা তুলল, তারপর নিঃশব্দ ইঙ্গিতে লাউঞ্জের দরজাটা দেখিয়ে দিল।

আতঙ্কে নীল হয়ে গেছে সাব্বির। তোতলাতে শুরু করল, 'এ-বারের মত মাফ করে দিন! আপনার পা ছুঁয়ে কসম খাচ্ছি আর কখনও এমন কাজ করব না।'

'দু'বছর আগেও তুমি ঠিক এই কথাই বলেছিলে. মনে আছে?' জিজ্ঞেস করল

৮

রানা। 'বলেছিলে, আপনার পরিচয় দিয়ে আর যদি কারও কাছ থেকে টাকা খাই, আপনি আমার একটা হাত কেটে নেবেন। আর আমি বলেছিলাম, তোমাকে আমি মেরেই ফেলব।'

'নিন, তাই নিন!' বাঁচার জন্যে মরিয়া হয়ে বলল সাব্বির। 'দয়া করে আমার একটা হাত কেটে নিন, কিন্তু দোহাই লাগে জানে মারবেন না!'

বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা সহজেই আলাদা হয়ে গেল, তবে ইন্সট্রুমেন্টটা সার্জেনদের করাত, আর রানার হাতেও খুব জোর। ও শুধু বেশি মাত্রার লোকাল অ্যানেসথেটিক ব্যবহার করেছে, সাব্বিরের বাম বাহু সহ বাকি হাত চব্বিশ ঘন্টা অসাড় ও অনুভূতিহীন থাকবে। পাশাপাশি বসেছে ওরা। ওদের সামনের টেবিলে রয়েছে বারো বর্গ ইঞ্চি কাঠের ব্লক, রূপোর মত চকচকে ছোট সার্জেন'স শ, সিরিঞ্জ, ইলেকট্রিক কটারাইজিং আয়রন, গজ আর ব্যান্ডেজ। দ্রুত কাজ করছে রানা, দক্ষ হাতে। বিচ্ছিন্ন আঙুলটা ব্লকের ওপর রাখল ও, রক্তাক্ত গোড়াটা কটারাইজ করল, ক্ষতের ওপর খানিকটা মলম লাগাল, তারপর গজ দিয়ে মুড়ে ব্যান্ডেজ বাঁধল।

কালো ব্যাগ থেকে ছোট ও ভারি একটা মেটাল বক্স বের করল রানা। বক্সটা খুলতেই ভেতর থেকে সাদা বাষ্প বেরুল। আঙুলটা শুকনো বরফের ভেতরে গুঁজে দিয়ে বন্ধ করল ঢাকনি। সরঞ্জামগুলো গুছিয়ে ব্যাগে ভরছে, কথা বলল আগের সেই নরম সুরে, 'ফের যদি আমার নাম ব্যবহার করো, তোমাকে আমি ঠিকই খুঁজে বের করব, সাব্বির। এই শেষবার তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

সাপটা নড়ল না, তাকিয়ে আছে ব্যান্ডেজের দিকে।

বেডরুমে ঢুকল রানা, ডলারের বান্ডিলটা নিয়ে বেরিয়ে এল। সাপটা এক চুল নড়েনি। বান্ডিলটা থেকে গুণে গুণে একশোটা নোট আলাদা করল রানা, সাব্বিরের সামনে রাখল। 'দশ হাজার ডলার, ...ট্যাপ সিটি মানি, সাব্বির...আগামী বার অন্য ধরনের পোকার খেলো।' দরজা খুলে করিডরে বেরিয়ে গেল ও।

রানার দেয়া টাকা থেকে বেশ কিছু খরচ করে ফেলল পাখি। সুন্দর একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে অনেক দিন পর মনের সাধ মিটিয়ে ভাল ভাল খাবারের অর্ডার দিল সে। তারপর গেল শপিং করতে। আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে আগামী ছ'মাস গোজোর আবহাওয়া বেশিরভাগ সময় গরম থাকবে। রঙচঙে সারঙ আর সুইমস্যুট কিনল, আর দিনের বেলা পরার জন্যে কিনল ঢিলে শর্টস আর টি-শার্ট। রাতের পোশাক কিনল না, কয়েকটা শাড়ি নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। এরপর গেল ওর প্রিয় ফ্রেঞ্চ কসমেটিক্স-এর দোকানে। এখান থেকে ফেস ক্রীম আর মেক-আপ কিনল, নির্বাচন করল শুধু ন্যাচারাল কালার।

ওয়াশিংটনে থাকলে সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার সকাল ঠিক আটটায় ডেস্কে এসে বসেন, দুপুর একটা পর্যন্ত কোন বিরতি ছাড়াই একটানা কাজ করেন। আজ ঠিক সকাল ন'টায় তাঁর ডাইরেক্ট প্রাইভেট টেলিফোন ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠল।

ওভারসীজ কল-এর যান্ত্রিক শব্দ-গুঞ্জন শুনতে পেলেন তিনি। অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো, 'মিডলটন, মে ফিফটিন।'

কব্জিতে বাঁধা রোলেক্সের ওপর চোখ বুলালেন সিনেটর। ডেট উইন্ডোয় দেখা যাচ্ছে মে মাসের আজ পঁচিশ তারিখ। 'বলুন।'

'দশটায় ডিএইচএল কুরিয়ার আপনার অফিসে একটা প্যাকেট নিয়ে যাবে। লোকটার নাম কেলভিন ব্রাউন, সে ব্যক্তিগতভাবে আপনার হাতে তুলে দিতে চাইবে ওটা। আপনার লোকজন যেন চেক না করে। খুলবেন আপনি যখন একা থাকবেন। যে প্রমাণ চেয়েছিলেন, ভেতরে পাবেন সেটা, সঙ্গে আরও কিছু পাবেন। দিন কয়েক পর আবার আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে সিকিউরিটি চীফকে ডেকে পাঠালেন সিনেটর।

দশটা বেজে চার মিনিটে তাঁর সেক্রেটারি ফোনে জানাল, ডিএইচএল-এর একজন কুরিয়ার আউটার অফিসে অপেক্ষা করছে, ডেলিভারি দেয়ার জন্যে একটা প্যাকেট এনেছে সে, আউটার অফিসে তার সঙ্গে একজন সিকিউরিটি গার্ড আছে। ওদেরকে আসতে বললেন সিনেটর।

কুরিয়ার লোকটা লম্বা-চওড়া পাহাড়, সিকিউরিটি গার্ড খর্বকায় ব্যাঙের ছাতা। সিনেটর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ওর আইডেনটিটি চেক করে দেখেছ?'

ব্যাঙের ছাতা জবাব দিল, 'ইয়েস, সিনেটর, উনি কেলভিন ব্রাউন।'

ভারি একটা মেটাল কেস রয়েছে কুরিয়ারের হাতে। চওড়া ডেস্কের ওপর, সিনেটরের সামনে রাখল সেটা; তার ওপর রাখল একটা কাগজ। দু'জনেই কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। কাগজটা হাতে নিলেন সিনেটর। ছ'টা সংখ্যা লেখা রয়েছে। ব্রিফকেসের দিকে তাকালেন। এক জোড়া থ্রী-ডিজিট কমবিনেশন লক রয়েছে ওটায়।

ব্রিফকেসটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে সংখ্যা মিলালেন সিনেটর, ঢাকনি খুললেন। ভেতরে একশো ডলার নোটের দুটো বান্ডিল রয়েছে, রাবারব্যান্ড দিয়ে এক করা। আর রয়েছে ভারি একটা মেটাল বক্স ও টাইপ করা একটা কাগজ।

কাগজটা তুলে নিয়ে পড়লেন সিনেটর।

'সাব্বিরের সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার, আপনার টাকা থেকে এক লাখ ষাট হাজার ডলার উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। দশ হাজার ডলার "ট্যাপ সিটি মানি" হিসেবে দিয়েছি ওকে—এর মানে আপনি যদি না বোঝেন, যে-কোন সিরিয়াস পোকার প্লেয়ারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন। এসওবি-কে ওপারে পাঠিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু উটকো ঝামেলা সৃষ্টি হতে পারে, যা আমরা দু'জনেই চাই না। তার আসল পরিচয় সম্পর্কে প্রমাণও পাঠালাম। আপনার এফবিআই বন্ধুদের দিয়ে ভেরিফাই করিয়ে নেবেন। সেই সঙ্গে সেফে রাখা গ্লাসে আমার আঙুলের যে ছাপ আছে তা-ও ভেরিফাই করাবেন। কাগজের কোণেও ছাপ পাবেন।'

নিচে কোন সই নেই।

টাকার বান্ডিল ও চিঠি ছাড়া ব্রিফকেসে আর শুধু মেটাল বক্সটা রয়েছে। সেটা হাতে নিলেন সিনেটর, সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা ওটা। মুহূর্তের

জন্যে ভাবলেন সিকিউরিটির লোকজনকে ডাকবেন কিনা। তারপর হাত বাড়িয়ে তালা খুললেন, চাবিটা তালাতেই ঢোকানো ছিল। ঢাকনি তুলতেই সাদা কুয়াশা ঢেকে ফেলল ব্রিফকেসটাকে, মৃদু ঝাঁকি খেয়ে চেয়ারের পিছন দিকে সেঁটে গেলেন সিনেটর। ধীরে ধীরে সাদা বাষ্প মিলিয়ে গেল, বক্সটা থেকে এখন সামান্যই বেরুচ্ছে। গলা লম্বা করে বক্সের ভেতর উঁকি দিলেন তিনি। সাদা এক টুকরো কাপড় দেখতে পেলেন, তার ওপর একটা আঙুল। কাপড়টায় রক্ত লেগে রয়েছে। তাকিয়ে থাকলেন তিনি, যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছেন। তারপর ঝট করে ঢাকনি বন্ধ করে হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে।

সিনেটরের ওয়াশিংটন ফ্ল্যাটেও জুডির বিলাসবহুল রুচির ছাপ আছে। ভারি ইউরোপিয়ান ফার্নিচার, পারশিয়ান কার্পেট, মহান শিল্পীদের পেইন্টিং। দিন কয়েক আগে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দিয়ে ছোট একটা কিনবেন।

এফবিআই ডেপুটি ডিরেক্টর লী আলেকজান্ডার সন্ধে ঠিক ছ'টার সময় পৌঁছুলেন। সিনেটরের পুরানো বন্ধু তিনি, চোখে সব সময় কৌতুকভরা হাসি হাসি ভাব লেগে থাকে। তাঁর হাতে একটা ব্রিফকেস দেখা গেল।

জিজ্ঞেস না করেই তাঁর জন্যে একটা গ্লাসে ড্রাই মার্টিনি ঢাললেন সিনেটর। ফায়ারপ্লেসের সামনে বসলেন তাঁরা। 'তারপর বলো, লী,' কথা পাড়লেন সিনেটর।

গ্লাসে একটা চুমুক দিয়ে জিভ চুষলেন আলেকজান্ডার, মার্টিনির স্বাদটা উপভোগ করলেন, তারপর ব্রিফকেস খুলে হাতে নিলেন একটা ফোল্ডার। 'গ্লাসে আঙুলের ছাপ মাসুদ রানার, ডেভিড। রানা এজেন্সির ডিরেক্টর তিনি; দুনিয়ার প্রায় সব বড় শহরে এই সংস্থার শাখা আছে। ধারণা করা হয় বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা কাভার ওটা।'

'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স? তারমানে উনি একজন স্পাই?' চিন্তিত দেখাল সিনেটরকে, ইন্টারপোল তাঁকে এই তথ্যটা দেয়নি। 'আর ইমরুল হাসান নামটা?'

লী আলেকজান্ডার ফোল্ডারে একটা টোকা দিলেন। 'এখানে ডেথ সার্টিফিকেটের একটা ফ্যাক্স কপি রয়েছে, সই করেছেন প্রফেসর গিয়োভানি গুগলি। নেপলসের কারডারেলি হসপিটালে ফোন করে প্রফেসর গুগলির সঙ্গে আজ বিকেলে কথা বলেছি আমি। ডেথ সার্টিফিকেটটা নির্ভেজাল বলে জানিয়েছেন তিনি। বছর কয়েক আগে পালার্মোর এক মাফিয়া পরিবারের সঙ্গে গোলাগুলিতে গুরুতরভাবে আহত হন মাসুদ রানা, তিনি নিজে তাঁর চিকিৎসা করেন, কিন্তু বাঁচাতে পারেননি। সে-সময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল ইমরুল হাসান।' সিনেটরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালেন তিনি। 'ডেভিড, নামকরা ডাক্তাররা সাধারণত মিথ্যে কথা বলেন না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে থাকলেন সিনেটর।

ফোল্ডারের দিকে চোখ রেখে আলেকজান্ডার বললেন, 'যে ভদ্রলোক কয়েক বছর আগে মারা গেছেন, তোমার গ্লাসে তাঁর হাতের ছাপ আসে কিভাবে, ডেভিড? আসল ব্যাপারটা কি, বলো তো?' তাঁর চোখে কৌতুক ঝিক করে উঠল।

একটা হাত তুললেন সিনেটর। 'আর আঙুলটা সম্পর্কে?'

ফোল্ডারে আবার টোকা দিলেন আলেকজান্ডার। 'ল্যাব থেকে আমাকে বলা হয়েছে, জ্যান্ত একটা মানুষের হাত থেকে কেটে নেয়া হয়েছে ওটা।'

'কার?'

'সাব্বির খান নামে এক লোকের। সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানে জন্ম। একাত্তর সালের দিকে আমেরিকায় আসে পরিবারটা। সাব্বিরের বাপ জঙ্গী মৌলবাদী গ্রুপের সঙ্গে জড়িত ছিল, নিউ ইয়র্কে। কিশোর বয়েসে চুরি, ছিনতাই, পকেট কাটা ইত্যাদি অপরাধে ধরা পড়ে কয়েকবার জেলে গেছে সাব্বির। তারপর একটা ফ্যানাটিক গ্রুপে নাম লেখায়, ভাড়াটে গেরিলা হিসেবে আমেরিকার বাইরেও কাজ করেছে। জালিয়াতির অপরাধে খোঁজা হচ্ছে তাকে। কোথায় আছে জানা যায়নি।' ফোল্ডারটা বন্ধ করে ব্রিফকেসে ভরে রাখলেন। 'কি ঘটছে বলবে আমাকে, ডেভিড?'

'আগে শুনি তুমি কি বুঝেছ,' বললেন সিনেটর।

'ইমরুল হাসান ওরফে মাসুদ রানা সম্পর্কে বলতে পারি, ইটালিয়ান মাফিয়াদের চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে নিজের মৃত্যুর খবর রটিয়েছিল লোকটা, তাকে সাহায্য করেছিলেন কিছু সম্মানী ব্যক্তি। রানা যে বেঁচে আছে তা আমরা বেশ কিছুদিন হলো জানি। এ-প্রসঙ্গে তোমাকে জানানো দরকার, এফবিআই ও সিআইএ-এর সঙ্গে বিসিআই বা রানা এজেন্সির কোন বিরোধ নেই, পেশাগত ঝামেলার কথা যদি বাদ দিই। আমার বলা শেষ, এবার তোমার পালা।'

সোফা ছেড়ে আগুনের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালেন সিনেটর, তাকিয়ে আছেন বন্ধুর দিকে। 'কোন প্রশ্ন কোরো না, লী। অন্তত এখনই নয়। সময় হলে যা জানি সব আমি তোমাকে বলব।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলেকজান্ডার। ব্রিফকেসে টোকা দিয়ে বললেন, 'ডেভিড, তুমি সিনেটর বলে, তারচেয়েও বড় কথা তুমি আমার বন্ধু বলে এ-সব তথ্য তোমাকে দিলাম। আমি এমনকি ডিরেক্টরের অনুমোদনও আদায় করেছি। কিন্তু, ডেভিড, তিনি প্রশ্ন তুলছেন। কি বলব আমি তাঁকে?'

'এসওবি-কে বলো আমি খুশি হয়েছি। কমিটির ভোটে এফবিআই-এর বাজেট পাস করাতে হবে, তখন আরেকবার বোলো।'

হাসলেন আলেকজান্ডার। 'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে, বন্ধু হিসেবে আমাকে কিছু বলা যায় না?'

মাথা নাড়লেন সিনেটর। 'ধৈর্য ধরো, বৎস, সময় হলে সবই জানতে পারবে।'

খালি গ্লাসটা সিনেটরের হাতে ধরিয়ে দিলেন আলেকজান্ডার। 'তাহলে অন্তত আরেকটু মার্টিনি দাও আমাকে। দুটো জিনিস তুমি খুব ভাল পারো, ডেভিড—মার্টিনি বানাতে আর মুখ বন্ধ রাখতে।'

কথা না বলে হাসলেন সিনেটর।

ভরা গ্লাসটা নিয়ে আবার আলেকজান্ডার বললেন, 'ব্যাপারটা তোমার স্ত্রী জুডিকে নিয়ে, তাই না?'

তাকালেন সিনেটর, কিন্তু এবারও কথা বললেন না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন আলেকজান্ডার। 'ডেভিড, তুমি যে তাকে কত ভালবাসতে, আমি জানি। তুমি যা অনুভব করছ ভালবাসা শব্দটা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায় না। বিশ্বাস করো, এফবিআই বা সিআইএ-তে আমরা যারা আছি সবাই চাই দায়ী লোকগুলো উপযুক্ত শাস্তি পাক। প্লেনটায় জুডি একা না, আরও বাইশজন আমেরিকান নাগরিক ছিল। কিন্তু...,' একটু থেমে চিন্তা করলেন তিনি কথাটা বলবেন কিনা, তারপর আপন মনে মাথা ঝাঁকালেন, 'কিন্তু, আগেই তোমাকে একটা কথা জানিয়ে দিই। তদন্তের রিপোর্ট থেকে আসল সত্য না-ও বেরিয়ে আসতে পারে। তুমি তো সবই বোঝো, ব্যাখ্যা না করলেও চলে। সরকারের কিছু নীতি থাকে, সে-সব নীতির কাছে অনেক সময় আমরা সবাই অসহায় হয়ে পড়ি।'

এবারও কোন কথা বললেন না সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার।

'তুমি যখন মুখ খুলবে না, আমাকে তাহলে অনুমান করতে হয়। ধরে নিচ্ছি, তুমি নিজে থেকে কিছু করতে চাইছ। আমি শুধু আশা করতে পারি বোকার মত কিছু করবে না।'

'আমি কি বোকা, লী?'

মাথা নাড়লেন আলেকজান্ডার। 'না, তা তুমি নও; তবে প্রবল শোক মানুষকে অনেক বদলে দিতে পারে।'

গম্ভীর মুখে মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর। 'তা সত্যি, কয়েক হপ্তা আগে বোকামি একটা করেওছি।' এগিয়ে এসে বন্ধুর কাঁধে একটা হাত রাখলেন তিনি। 'তবে, লী, এখন আমি বোকার মত কিছু করছি না। আচ্ছা, এবার বলো, তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?'

'এক অর্থে ভালই বলব। ফিলিপ কেলি-র সঙ্গে কথা বলেছি, স্কটিশ পুলিসের সঙ্গে লিয়াজোঁ বজায় রাখছেন তিনি। ওখানে চার্জে আছেন মাইকেল ম্যানডেক্স। এরইমধ্যে কয়েকটা ব্যাপারে প্রায় নিশ্চিত হতে পেরেছি আমরা। বোমাটা ফ্রাঙ্কফুর্টে তোলা হয় প্লেনে, কিংবা এভাবেও বলা যায় যে ওই শহরের রাস্তা ধরে এয়ারপোর্টের দিকে নিয়ে আসা হয় ওটা। কাজটা কাদের, সে-সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া গেছে। আমার বিশ্বাস আর কয়েক দিনের মধ্যে টেরোরিস্ট গ্রুপটার নাম জানা যাবে।'

'এবং তারপর আমাদের প্রেসিডেন্ট ওদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে মেরিন পাঠাবেন?'

এফবিআই কর্মকর্তা নিঃশব্দে কাঁধ ঝাঁকালেন। এক চুমুকে গ্লাসটা খালি করলেন তিনি, ব্রিফকেস নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'এবার আমাকে যেতে হয়।'

সিনেটর বললেন, 'এক মিনিট, লী। তুমি তো খুব ভাল পোকার খেলো। "ট্যাপ সিটি মানি" কথাটার মানে কি বলতে পারো?'

আলেকজান্ডারকে বিস্মিত দেখাল। 'অবশ্যই,' বললেন তিনি। 'তবে এ শুধু প্রো পোকার প্লেয়াররা ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট স্টেক ধরে খেলা শুরু করে তারা, বাজি ধরে পরনের কাপড় ছাড়া সঙ্গে যা কিছু আছে সব। বাজির পরিমাণ সবারই সমান হয়। কয়েকশো হতে পারে, আবার কয়েক হাজারও হতে পারে। কেউ যদি তার বাজি হেরে যায়, খেলা থেকে বাদ পড়বে সে। বাদ পড়বে, কারণ দেউলিয়া

হয়ে গেছে। তারপর, বাকি প্লেয়াররা, যারা তখনও খেলছে, চাঁদা তুলে ওই লোককে কিছু টাকা ধরিয়ে দেয়, লোকটা যাতে কিছু খেতে পারে। এই টাকাটাই ট্যাপ সিটি মানি। তুমি পোকার ধরছ নাকি, ডেভিড?'

সিনেটর হাসি মুখে জবাব দিলেন, 'হয়তো। সব কিছুর জন্যে ধন্যবাদ, লী। আমার মনে থাকবে।'

আলেকজান্ডার বললেন, 'ইউ আর ওয়েলকাম।'

'এক সেকেন্ড, লী,' আবার বাধা দিলেন সিনেটর। 'এই ভদ্রলোক, এসপিওনাজ জগতে আছেন, তুমি কিন্তু তাঁর সম্পর্কে তেমন কিছু বললে না।'

'কি জানতে চাও বলো।'

'এক বাক্যে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে পারো?'

দীর্ঘ এক মিনিট চিন্তা করলেন লী আলেকজান্ডার। 'কথাটা আমার নয়। সিআইএ-এর এক সাবেক চীফ বলেছিলেন। বলেছিলেন—মাসুদ রানা এমন একজন বিচারক, যে নরকে গিয়ে হলেও অপরাধীকে নিজের হাতে শায়েস্তা করে।'

মিডলটন থেকে দু'দিনের জন্যে সরে গেলেন মাইকেল ম্যানডেক্স। ছুটি নেননি, যদিও ছুটি তাঁর দরকার ছিল। খুব সকালে রওনা হয়ে প্রথমে তিনি লন্ডনে পৌঁছুলেন। তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে চলে এলেন নিউ স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে, ছ'জন সিনিয়র পুলিস আর দু'জন সিভিল কর্মকর্তার সঙ্গে মীটিং করলেন। একজন এসেছেন এম আই ফাইভ থেকে, অপর জন এম আই সিক্স থেকে। এক পর্যায়ে সৌদি সরকারের একজন প্রতিনিধিও হাজির হলেন। একটানা দু'ঘণ্টা কথাবার্তা হলো। এরপর তিনি গাড়ি চালিয়ে কেন্ট-এর ফোর্ট হলস্টেড-এ চলে এলেন, এখানে যে ক্রিমিন্যাল ল্যাবরেটরিটা আছে সেটাই সম্ভবত দুনিয়ার সেরা। এফবিআই ও সিআইএ-র দু'জন ফরেনসিক এক্সপার্ট তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। ওঁদেরকে তিনি প্রশ্ন করলেন, সহযোগিতা পেতে কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা। ওঁরা জানালেন, না, নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছেন তাঁরা।

ব্রিফিং প্রায় এক ঘণ্টা স্থায়ী হলো। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী আর তাঁদের প্রতিপক্ষ আমেরিকান বিজ্ঞানীরা পরস্পরকে সানন্দে সাহায্য করছে দেখে খুশি হলেন ম্যানডেক্স। প্রতিটি ক্ষেত্রে এরকমটি ঘটতে দেখা যায় না। ওঁরা তাঁকে প্লাস্টিক, মেটাল আর কাপড়ের প্রচুর টুকরো দেখালেন। ব্যাখ্যা করে বোঝালেন কয়েক হপ্তার অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে কিভাবে ওঁরা সমস্ত মনোযোগ একটা মাত্র সুটকেসে নিবদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছেন, যে সুটকেসটা একটা নির্দিষ্ট কার্গো বে-তে ছিল।

আরও কিছুক্ষণ থেকে ওঁরা তাকে ডিনার খেয়ে যেতে বললেন, জানালেন কাছাকাছি ভাল একটা রেস্তোরাঁ আছে। প্রস্তাবটা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি। ফোর্ট হলস্টেড থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে ছোট ও ছিমছাম একটা হোটেল পেলেন ম্যানডেক্স, রাস্তা থেকে যথেষ্ট দূরে। কামরাটা একটু সেকেলে, তবে খাবারদাবার খুব ভাল। ডিনারের পর কনিয়্যাক, তারপর বিছানা।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে ডিফেন্স আর্মামেন্টস ডিপোর উদ্দেশে রওনা

হলেন তিনি, জায়গাটা লংটাউন গ্রামের কাছাকাছি। ওখানেই, প্রকাণ্ড এক হ্যাঙ্গারে, ব্রিটিশ এয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন বোর্ড সাউদিয়ার সেভেন-ফোর-সেভেন নতুন করে জোড়া লাগাচ্ছে। ওটার নাম দেয়া হয়েছে 'সাতসাগরের জলকুমারী'।

হ্যাঙ্গারে ঢুকেই বিস্ময়ের একটা ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ম্যানডেক্স। তিনি তাঁর সারাজীবনে এরকম বিশাল গুহা আকৃতির বিল্ডিং আগে কখনও দেখেননি। টেকনিশিয়ানদের কেউ কেউ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আসা-যাওয়া করার জন্যে বাইসাইকেল ব্যবহার করছে। হ্যাঙ্গারের ঠিক মাঝখানে আক্ষরিক অর্থেই সাতসাগরের জলকুমারীকে জোড়া লাগাচ্ছে তারা। প্রায় অক্ষত নোজ কোন-টাকে এক প্রান্তে রাখা হয়েছে, অপর প্রান্তে রাখা হয়েছে লেজের অংশ বিশেষ। ডানাগুলো যে-টুকু উদ্ধার করা গেছে তা-ও জায়গামত বসানো হয়েছে দু'ধারে। ওভারঅল আর সাদা কোট পরা কয়েক ডজন লোক গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে ওটার ওপর।

'ব্যাপারটা প্রকাণ্ড জিগ-স পাজল-এর মত,' পরিচয় হবার পর মন্তব্য করলেন চীফ টেকনিশিয়ান।

'আপনার লোকজন সত্যি দারুণ কাজ দেখাচ্ছে,' বললেন ম্যানডেক্স, সারি সারি মেটাল শেলফগুলোর দিকে হাত তুললেন। প্রতিটি শেলফে স্তূপ হয়ে আছে তার, তারের টুকরো, ইস্পাতের পাত, সীটের অংশবিশেষ ইত্যাদি।

'দু'এক হপ্তার মধ্যে রিঅ্যাসেম্বল-এর কাজ শেষ করে ফেলব। তবে দেখতে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে না। অনেক জিনিসই পাওয়া যায়নি, আর কোন দিন পাওয়াও যাবে না।'

'আমার তাজ্জব লাগছে,' ম্যানডেক্স বললেন। 'আমাকে আপনি কার্গো বে ফরটিন-এল দেখান, প্লীজ। মানে, ঠিক কোথায় ছিল ওটা।'

হাত তুলে দেখালেন চীফ টেকনিশিয়ান। 'ওখানে, ককপিটের পিছনে, ককপিট থেকে খুব একটা দূরে নয়। সে-কারণেই ক্রুরা মাইক্রোফোনে মে-ডে প্রচার করার সময় পায়নি। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে বিস্ফোরিত হয় প্লেন।' তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'যে বা যারা দায়ী তাদের পরিচয় জানা যাবে তো?'

জোড়া লাগানো কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে আছেন ম্যানডেক্স, বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই। খুব তাড়াতাড়ি জানা যাবে কে বা কারা দায়ী।'

পাঁচ

মাল্টার গোটা উপকূল জুড়ে সারি সারি শুধু অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক আর হোটেল দেখতে পাওয়া যায়, প্রথমদর্শনে পাখির তেমন পছন্দ হলো না। গরম বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে চুনাপাথরের ধুলো, নাকে রুমাল চাপা দিতে বাধ্য হলো সে। তবে ফেরীতে ওঠার পর তার মুড বদলে গেল। সময়টা শেষ বিকেল, কোমিনো দ্বীপটাকে পাশ কাটানোর সময় সামনে গোজোকে দেখতে পেল সে। মাল্টার চেয়ে অনেক বেশি সবুজ ও

শ্যামল, আকারে ছোট বলে অনেক সুন্দরও, বন-জঙ্গল ছাওয়া সারি সারি পাহাড়গুলো কেউ যেন সযত্নে ওখানে সাজিয়ে রেখেছে, প্রতিটির মাথায় একটা করে গ্রাম, আর প্রতিটি গ্রামে মাথাচাড়া দিয়ে আছে চার্চ বা মসজিদের চূড়া বা মিনার। রেইলিং ধরে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ঘাড় ফেরাল রানার দিকে। 'ভারি সুন্দর তো!'

'হ্যাঁ। মানুষগুলো আরও সুন্দর।' প্লেনে চুপচাপ ছিল রানা, ফেরীতে আসার পথে ট্যাক্সিতেও প্রায় কোন কথা বলেনি। বোঝাই যায়, কোন ব্যাপারে গভীর চিন্তায় আছে ও।

ফেরী হারবারের দিকে ঘুরতেই কথা বলতে শুরু করল রানা। 'পাখি, আপনি তো অভিনয় করেন। আপনার কয়েকটা টিভি অনুষ্ঠানের ভিডিও জোগাড় করে দেখেওছি আমি। বাড়িয়ে বলছি না, সত্যি ভাল অভিনয় করেন। তবু আমি সাবধান করে দিতে চাই। আগামী কয়েকটা মাস এখানে আপনাকে থাকতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখানেও অভিনয় করতে হবে। সেটা যদি ভাল না হয়, সময়টা কিন্তু শান্তিতে কাটবে না।'

'কি বলছেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' পাখি অবাক।

ইঙ্গিতে দ্বীপটা দেখাল রানা। 'গোজোর লোকেরা অত্যন্ত সরল ও ধার্মিক। খ্রিস্টানরা প্রচুর মদ খায়, নাচ-গান নিয়ে মেতে থাকে। আর মুসলমানরা নামাজ-রোজা করে, মেহমান পেলে সহজে ছাড়তে চায় না। বিদেশীরা একবার এসেই গোজোর প্রেমে পড়ে যায়, বার বার ফিরে আসে তারা, অনেকে চিরকালের জন্যে থেকেও যায়। আপনাকে নিয়ে সমস্যা হবে, গোজোকে আপনি পছন্দ করতে পারবেন না।'

'কি বলছেন, কেন?'

'কারণ গোজোর লোকজন আপনাকে ভাল চোখে দেখবে না।' একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'ফেরী থেকে নামার পর আমাকেও তারা ঘৃণা করবে।'

'কিন্তু কেন?'

'এর উত্তর দিতে হলে ভায়োলা আর তার পরিবারের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ব্যাখ্যা করতে হবে,' বলল রানা। 'এই দ্বীপে কয়েক বছর ধরে আসা-যাওয়া করছি আমি। আমার বন্ধু রেমারিকের শ্বশুরবাড়ি এখানে। বন্ধু মারা গেলেও, তার শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে আমার সম্পর্ক নষ্ট তো হয়ইনি, বরং আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। এর কারণ ভায়োলা আর বৃষ্টি। ওদেরকে আমি ভালবাসতাম, ওরাও আমাকে ভালবাসত। প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, ভায়োলাকে আমি বিয়ে করিনি কেন।

'ভায়োলার একবার বিয়ে হয়েছিল। সঙ্গত কারণেই স্বামীকে ডিভোর্স দেয় সে। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করেছিল, জীবনে আর কোনদিন বিয়ে করবে না। এর মানে এই নয় যে আমি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছি আর সে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আমিও তাকে কোনদিন বিয়ে করার কথা ভাবিনি। যদিও প্রথমবার গোজোয় এসেই তার সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ি।

'আমার পেশার সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, এই মুহূর্তে বেঁচে আছি, পরের মুহূর্তে না-ও বেঁচে থাকতে পারি। কাউকে নিয়ে ঘর বাঁধার সাধ যে হয় না, তা নয়;

কিন্তু জানি যাকে নিজের জীবনের সঙ্গে জড়াব তার ওপর আসলে অন্যায় করা হয়ে যাবে। আমার পেশার আরেকটা খারাপ দিক হলো, কোথাও স্থির হয়ে বসার যো নেই, আমার কপালের লিখনই আজ এখানে আছি তো কাল সেখানে। এই সব কথা ভেবেই বিয়ে না করার সিদ্ধান্তটা নিতে হয়েছে আমাকে।

'আপনাকে যেমন ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হচ্ছে, ভায়োলাকে তা বোঝাতে হয়নি—সে নিজেই ব্যাপারটা বুঝে নেয়। এতে তার সুবিধেই হয়, কারণ সে নিজেও বিয়ের পক্ষে ছিল না। কোন বাঁধন থাকবে না, তবে মাঝে মধ্যে এখানে এসে আমরা একসঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাব, এক সময় এরকম একটা নিয়ম দাঁড়িয়ে যায়। এই আয়োজনটা ভায়োলার পরিবারও বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়, সম্ভবত বিয়ে করতে না চাওয়ার দুইপক্ষের কারণ তারাও উপলব্ধি করতে পেরেছিল। কিন্তু গোজোর সমাজ কোন পুরুষের জীবনে একাধিক নারী মেনে নিতে পারে না। শুধু ভায়োলার পরিবার নয়, গোজোয় আমার অনেক বন্ধুও আছে। তারা জানত, ভায়োলাই আমার জীবনে একমাত্র নারী। তারা আমাকে নিজেদের আপনজন হিসেবে গ্রহণ করেছে। আর তাই তারা আশা করে আমি তাদের সামাজিক প্রথা বা রীতির প্রতি শ্রদ্ধা দেখাব। নিয়ম হলো, কারও বউ বা প্রেমিকা মারা গেলে অন্তত একটা বছর শোক পালন করবে সে, এই এক বছর কোন মেয়ে তার জীবনে আসবে না। কেউ কেউ এমন কি পাঁচ বছরও শোক পালন করে। মা-বাবা, এমন কি চাচা-চাচী মারা গেলেও তাই। মেয়েরা কালো কাপড় পড়বে, প্রয়োজন ছাড়া বাইরে বেরুবে না। প্রেমিকা মারা যাবার দু'মাস পর কোন পুরুষ আরেকটা মেয়ের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকছে, এটা এখানে কল্পনারও বাইরে। কাজেই আপনাকে ওরা একদমই সহ্য করতে পারবে না। বাজারে যাবেন, রেস্তোরাঁয় বা সিনেমায় যাবেন, ওরা আপনাকে দেখে মুখ কালো করবে, চোখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাবে।'

পানির কিনারায় লম্বা একটা বিল্ডিং দেখাল রানা, বারান্দাটা পানির ওপর ঝুলে আছে। 'ওটা রুচিতা'স বার। রুচিতা'স আর নিচের রেস্তোরাঁ দুই ভাই চালায়, সাকো আর টাগলিয়া। আমার চিঠি-পত্র সব ওখানেই আসে। খুব ভাল সম্পর্ক ওদের সঙ্গে আমার। ভায়োলাকে ওরা খুব শ্রদ্ধা করত। এখন আমরা ওখানে যাব, গেলেই বুঝতে পারবেন আমি কি বলছি।'

জেটিতে ভিড়ল ফেরী, পাখির সুটকেস আর নিজের তোবড়ানো ক্যানভাস ব্যাগটা তুলে নিল রানা। ওর পিছু নিয়ে ফেরী থেকে নেমে এল পাখি। 'আমার জীপটা রুচিতা'স-এর পিছনে থাকার কথা,' পাহাড়ী পথ বেয়ে ওঠার সময় বলল রানা।

'আগে আমরা পবনের সঙ্গে দেখা করব না?'

'সে আমার বাড়িতে অপেক্ষা করছে, একটু পরই দেখা হবে।'

একটা র‍্যাম্প বার পর্যন্ত উঠে গেছে। প্রবেশ পথের কাছেই পার্ক করা রয়েছে জীপটা। ওটার পিছনে সুটকেস আর ব্যাগ রেখে পাখির একটা হাত ধরল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ওর মুখের দিকে তাকাল সে। রানা বলল, 'এখন থেকেই শুরু হলো আপনার অভিনয়। হাতটা ধরলাম, কেউ যাতে আপনাকে খুব বেশি অবজ্ঞা না করে।'

বারে ঢুকল ওরা। কয়েকজন জেলে এক কোণে তাস খেলছে। বার কাউন্টারে হেলান দিয়ে বেশ কয়েকজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। পিছনে রয়েছে টাগলিয়া, সাকোর চেয়ে কম বয়েস তার, মাথায় এলোমেলো ঝাঁকড়া চুল। ভেতরে ঢুকেই জেলেদের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। সবাই তারা মুখ তুলে তাকাল, তারপর আবার মন দিল খেলায়।

বার-এ দাঁড়ানো লোকগুলোর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল রানা। তারাও মাথা ঝাঁকাল। টাগলিয়া তাকিয়ে আছে পাখির দিকে। এখনও তার হাতটা ছাড়েনি রানা। বলল, 'টাগলিয়া, এ আমাদের পবনের বড় বোন, পাখি চৌধুরী। কিছুদিন আমার বাড়িতে বেড়াবে। পাখি, ও টাগলিয়া, রুচিতা'স-এর মালিকদের একজন, আমার বন্ধুও।'

চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, পাখির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিল টাগলিয়া। এক সেকেন্ড ইতস্তত করে হাতটা ধরল পাখি। ক্ষণস্থায়ী হ্যান্ডশেক, শুকনো গলায় বলল, ''ওয়েলকাম টু গোজো, পাখি।'

'ধন্যবাদ,' হাসি মুখে বলল পাখি। 'এখানে এসে আমার ভাল লাগছে।'

কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো লোকগুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল রানা, 'টাফি, কার্লো, বাসু, রাহমান, ইনু।'

চারজনই অনিচ্ছাসত্ত্বেও হ্যান্ডশেক করল, বিড় বিড় করে কি বলল ভাল বোঝা গেল না। কাউন্টারের ওপর কয়েকটা প্যাকেট আর এনভেলাপ রাখল টাগলিয়া। সেগুলো নিয়ে রানা বলল, 'ধন্যবাদ। কাল রাতে রেস্তোরাঁয় আমার জন্যে দু'একটা টেবিল খালি রাখা যাবে?'

'যাবে।'

কয়েক মুহূর্ত নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল, তারপর রানা বলল, 'চলো, পাখি, যাওয়া যাক। বাড়িতে পবন অপেক্ষা করছে।' আবার পাখির হাত ধরে রুচিতা'স থেকে বেরিয়ে এল ও। জীপ চালিয়ে দ্বীপের মাঝখানে চলে আসছে, কথা বলছে না কেউ। কিছুক্ষণ পর নিস্তব্ধতা ভাঙল পাখি, 'আপনার কথাই ঠিক। মনে হলো এতক্ষণ একটা ডীপ ফ্রিজের ভেতর ছিলাম।'

'পরিস্থিতি এরচেয়ে ভাল হবার সম্ভাবনা খুব কম।' বাম দিকে হাত তুলল রানা, একটা চার্চের বিশাল চূড়া দেখাল পাখিকে। 'সারা দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় চূড়াগুলোর মধ্যে তৃতীয় ওটা। এই গ্রামে যত লোক বাস করে তার পাঁচগুণ লোক ধরবে ওই চার্চে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল পাখি।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'প্রতিযোগিতা। প্রতিটি গ্রাম পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে। বড়দিন বা ঈদ, ফুটবল ম্যাচ, বিয়ের অনুষ্ঠান—বিষয় বা উপলক্ষ যাই হোক, প্রতিযোগিতা হতেই হবে। এমনকি এক গ্রামের ফাদার অন্য গ্রামের ইমাম সাহেবের সঙ্গেও প্রতিযোগিতা করবেন—কে কত লোককে চার্চে বা মসজিদে টেনে আনতে পারেন। একটা সময় ছিল এক গ্রামের ছেলে অন্য গ্রামের মেয়েকে বিয়ে করলে সেটাকে কেলেঙ্কারির চূড়ান্ত বলে মনে করা হত। এক গ্রামের বাচনভঙ্গি পর্যন্ত অন্য গ্রামের সঙ্গে মেলে না। প্রতিযোগিতা শুধু গ্রামের সঙ্গে গ্রামের,

একই গ্রামের খ্রিস্টান ও মুসলমানের মধ্যে কোন রেষারেষি নেই।

রাবাত, দ্বীপের রাজধানীর ভেতর দিয়ে এগোল ওরা। হাত তুলে কয়েকটা দোকান ও বিল্ডিং দেখাল রানা। পাঁচ মিনিট পর রাস্তার ধারে জীপ থামিয়ে পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল। চূড়ার ওপর বাড়িটা পরিষ্কার দেখতে পেল পাখি। 'ওখানেই কয়েকটা মাস থাকতে হবে আপনাকে।'

'দেখতে তো খুবই সুন্দর লাগছে,' বলল পাখি। 'ভাবছি, ওটাও ডীপ ফ্রিজ নয় তো?'

হেসে ফেলল রানা। 'না, ওটা হবে আপনার নিভৃত আশ্রয়। ওখানে আপনার অভিনয় করার দরকার নেই। শুধু পবন আর আপনি থাকবেন, কাজের একটা মেয়ে ছাড়া তেমন কেউ আসবেও না।'

'কাজের মেয়ের দরকার কি, আমি একাই সব পারব।'

'না, মেয়েটা বিধবা, বেতনের টাকাটা তার দরকার,' বলে গিয়ার বদল করল রানা, ঢাল বেয়ে পাহাড়ে উঠে যাচ্ছে জীপ।

সুইমিংপুলে রয়েছে পবন, দ্রুত সাঁতার কাটছে। গেট খোলার আওয়াজ পায়নি সে, ওদেরকে আসতেও দেখেনি। ব্যাগ আর সুটকেস রেখে পুলের ধারে চলে এল ওরা। অপরপ্রান্ত ছুঁয়ে ফিরে আসছে পবন, তার দিকে তাকিয়ে হাসছে পাখি। পুলের মাঝখানে এসে ওদেরকে দেখতে পেল পবন, তবে সাঁতারের ভঙ্গি বা গতিতে কোন পরিবর্তন হলো না। ওদের পায়ের নিচে পৌঁছুল সে, পুলের কিনারায় কনুই রাখল, বুকটা ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে।

'ক'বার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মুখ তুলে তাকাল পবন। 'একশো বিশ,' বলল সে। 'কাল আমি আপনাকে হারিয়ে দেব…খুব সম্ভব।'

ধীরে ধীরে চেহারা ম্লান হয়ে যাচ্ছে পাখির। রানার দিকে তাকাল সে। এই প্রথম হাসতে দেখল ওকে।

'এসো তাহলে বাজি ধরি,' বলল রানা।

'ইউ আর ওয়েল কাম!' হাসছে পবন।

'চড়িয়ে আমি তোর সব ক'টা দাঁত ফেলে দেব!' রেগে গেছে পাখি, তাকাল রানার দিকে। 'এ কে? একে তো আমি চিনতেই পারছি না! সত্যি আমার ভাই?'

'সরি, ডিয়ার সিসটার,' হাসতে হাসতেই পুল থেকে উঠে এল পবন, দু'হাত বাড়িয়ে দিল বোনকে ধরার জন্যে। 'জানতাম আমাকে একা ছেড়ে থাকতে পারবে না তুমি।'

পিছিয়ে যেতে শুরু করল পাখি। 'অ্যাই, ভিজে যাব, ভাল হবে না…!'

বোনের হাত ধরে পুলের কিনারা ধরে এগোল পবন, ঝগড়াটে সুরে একইসাথে কথা বলছে দু'জন, পিছিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়ল রানা।

আধ ঘণ্টা পর পাহাড় থেকে নেমে গেল পবন। নতুন কয়েকজন বন্ধু জুটেছে, তার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। পাখিকে সঙ্গে নিয়ে গোটা বাড়িটা একবার ঘুরে এল রানা, তারপর দুটো ঠাণ্ডা কোক নিয়ে ঝুল-বারান্দায় বসল। পবন চলে যাবার

পর এই প্রথম কথা বলল পাখি, 'মাত্র এই ক'দিনে পবন এতটা বদলে যাবে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। আপনি কি ওকে জাদু করেছেন?'

'জীবনে এই প্রথম একটা দায়িত্ব পেয়েছে ও,' বলল রানা। 'কঠিন দায়িত্ব, সেজন্যে নিজেকে তৈরি করার জন্যে রীতিমত সাধনা করতে হচ্ছে ওকে। আরও অনেক বদলে যাবে ও, তবে আপনার আতঙ্কিত হবার কোন কারণ নেই। আমি জানি, ওর কোমল বা মানবিক দিকগুলো নষ্ট হবে না, বরং আরও গভীর হবে।'

'কি করে বুঝলেন?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে জিজ্ঞেস করল পাখি।

'আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে,' বলল রানা, তারপর অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'পাশাপাশি যে বেডরুম দুটো দেখালাম, ও-দুটোয় আপনারা শোবেন। আমি যখন থাকব, শেষের বেডরুমটায় থাকব। ভাল কথা, আপনি রাঁধতে জানেন?'

'ভুলে যাবেন না, আমি বাঙালী মেয়ে,' বলল পাখি। 'তবে কেমন রাঁধি সেটা নির্ভর করবে কে খাবে তার ওপর। আপনার প্রিয় খাবারগুলোর নাম বলুন।'

'আমি সহজ খাবার খাই,' বলল রানা। 'স্টেক আর চপ পছন্দ করি, রোস্টও ভালবাসি, বিশেষ করে বীফ। গ্রামের কসাইয়ের দোকানটা দেখিয়ে দেব আপনাকে। লোকটাকে বলবেন, ভাল মাংস না দিলে আমি তার গর্দান নেব।'

'বলার বোধহয় দরকার নেই,' জবাব দিল পাখি। 'সে সম্ভবত আগে থেকেই জানে।'

দু'দিন পরই রোববার এসে পড়ল। আর গোজোয় থাকলে পাজেরো তাজার খামারবাড়িতে প্রতি রোববারে লাঞ্চ খাওয়া বহু বছরের অভ্যাস রানার। মনে একটা অস্বস্তির ভাব নিয়ে বাড়িটায় ঢুকল ও। এই পরিবারে বিশেষ একটা স্থান আছে ওর। সেটা শুধু ভায়োলার কারণে নয়। বিপদের সময় দু'বার ওকে তারা সাহায্য করেছে বলেও নয়। পাজেরো তাজা আর অনোরিয়ার প্রতি নিঃশর্ত শ্রদ্ধাবোধ আছে ওর মনে।

সবাই তাঁরা মন খুলে কথা বলেন, বিশেষ করে অনোরিয়া। এই পরিবারের সমস্ত আনন্দ ও দুঃখ-শোকের অংশীদার রানা। ও জানে, ভায়োলা মারা যাবার মাত্র দু'মাস পরই অন্য একটা মেয়েকে বাড়িতে তোলায় সবাই ওরা খুব দুঃখ পেয়েছে।

যদিও ওদের আচরণ দেখে মনে হলো না যে কোন কিছু বদলেছে। টমেটোর ফলন নিয়ে কথা হলো, কথা হলো নতুন সরকারের কৃষি-নীতি নিয়ে। পাখি বা পবন সম্পর্কে কেউ কোন কথাই তুলল না। লাঞ্চের পর পাজেরো তাজা আর নিডোর সঙ্গে বারান্দায় বসল রানা। নিডোকে তার বান্ধবীর কথা জিজ্ঞেস করল ও, মেয়েটার সঙ্গে এক বছর ধরে মেলামেশা করছে সে। গোজোর সামাজিক রীতি হলো, বিয়ে করার আগে দীর্ঘ কয়েক মাস ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে। ছেলেটা যদি তার বান্ধবীকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে আসে বা মেয়েটার বাড়িতে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে ব্যাপারটা। আরও অনেক মাস পর এনগেজমেন্ট হবে ওদের, আর সেটা হবে চরম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এনগেজমেন্ট হবার পর গোজোয় সেটা কখনও ভাঙে না। এই অবস্থা চলবে অন্তত এক বছর,

তারপর আয়োজন করা হবে বিবাহ উপলক্ষ্যে রাজকীয় খানাপিনার।

'তানিয়া কেমন আছে?'

তরুণ নিডো কাঁধ ঝাঁকাল। 'আছে।'

'কাল ওর বাপের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, রাবাতে। এক সঙ্গে বসে কফি খেলাম। দারুণ মানুষ ওরা, ভদ্র পরিবার।' কথা না বলে আবার কাঁধ ঝাঁকাল নিডো।

'ওদের বাড়িটাও খুব সুন্দর। তুমি দেখেছ, নিডো?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'ভেতরে গেছ কখনও?'

চেয়ারের ভেতর দিকে সামান্য একটু সেঁধিয়ে গেল নিডো। 'না।'

পাজেরো তাজা মিটিমিটি হাসছেন। নিজের ও নিডোর গ্লাসে ওয়াইন ঢালল রানা। 'বাড়িটা সুন্দর, বাড়ির মেয়েটা আরও সুন্দর। সেদিন রুচিতা'স-এ দেখলাম ওকে, ওর বন্ধুদের সঙ্গে। পুলিস লোকটা, ফুরেল, ওকে খুব হাসাবার চেষ্টা করছিল। ফুরেলকে তো তুমি চেনো, তাই না? লম্বা, দেখতে খুব সুন্দর, কালো গোঁফ...'

'হুম,' বলে গ্লাসটা হাতে নিয়ে কিচেনে গিয়ে ঢুকল নিডো।

মৃদু শব্দে হেসে উঠলেন তাজা। 'কথাগুলো আমি যদি বলতাম, দু'দিন না খেয়ে থাকত ও।'

'মেয়েটা সত্যি ভাল,' বলল রানা। 'ওর মা-বাবাও খুব সরল। নিডোকে নিয়ে সমস্যা হলো, ট্যুরিস্ট মেয়েগুলোর সঙ্গে নাচানাচি করার লোভ সামলাতে পারে না। বিশেষ করে গরমের ছুটিতে...'

তাজা বললেন, 'ব্যাপারটা তুমি ঠিকই ধরেছ। জুলাই আর আগস্ট মাসে বাড়িতে ওর দেখাই পাওয়া যায় না। ওদিকে তানিয়ার বাপ মেয়েকে রাত দশটার পর বাইরে বেরুতে দেয় না। কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'আপনার জমির শেষ মাথায় পুরানো যে খামারবাড়িটা আছে, নিডোকে ওটা মেরামত করতে বলুন। আমি যে-ক'দিন গোজোয় আছি, ওকে সাহায্য করতে পারব। বলবেন ঠিকঠাক করার পর ওটা আপনি বিক্রি করে দেবেন।'

'তাতে লাভ?' হাসি চেপে জিজ্ঞেস করলেন তাজা। 'মেরামত করার সময় ঘর বাঁধার কথা ভাববে ও?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভেবে দেখুন না, আপনাদের নাতি-নাতনী দেখার সময় হয়নি?'

রানা চলে যাবার পর বারান্দায় বেরিয়ে এসে স্বামীর পাশে বসলেন অনোরিয়া। 'মেয়েটা রাঁধে খুব ভাল, বুঝলে।'

চোখে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি, স্ত্রীর দিকে তাকালেন তাজা।

অনোরিয়া আবার বললেন, 'ওর খিদে বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে গেছে। তারমানেই মেয়েটা ওকে মনের সাধ মিটিয়ে খাওয়াচ্ছে।'

'এটা একটা গুণ বটে,' বললেন তাজা।

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন অনোরিয়া। 'গুণ তো বটেই।'

ছয়

চেহারা দেখে মনে হবে না অত্যন্ত সফল একটা টেরোরিস্ট গ্রুপের নির্দয় লীডার তিনি। মনে হবে শান্ত-সুবোধ ভাল মানুষ, যেন দায়িত্ব সচেতন একজন করণিক।

বেলগ্রেড-এর মাঝখানে সুসজ্জিত ও সুরক্ষিত একটা অফিসে বসে আছেন লুদভিক মেলানজিক বেলোভিচ। মাঝারি আকৃতির স্বাস্থ্যবান পুরুষ, সদ্য ভাঁজ খোলা গ্রে ট্রাউজার, রুপালি বোতাম সহ ডাবল-ব্রেস্টেড ব্লু ব্লেজার, ক্রীম শার্ট ও মেরুন টাই পরেছেন। উনিশশো সাঁইত্রিশ সালে সারায়েভোতে জন্ম, আজ যেটা মুসলমান প্রধান রাষ্ট্র বসনিয়ার রাজধানী। দেশ, অর্থাৎ সাবেক যুগোশ্লাভিয়া ভাগ হবার পর তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে সংখ্যালঘিষ্ঠ বসনিয়া সার্বদের জন্যে বসনিয়াতেই আলাদা একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। বসনিয়ায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও বলকানে তাদের একটা স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে, এটা বসনিয়ার সার্বরা মেনে নিতে রাজি নয়। বসনিয়া-হার্জেগোভিনায় এখন যে যুদ্ধ চলছে, এটাই তার মূল কারণ। রাদোভান কারাজদিক বসনিয়ার সার্বদের একত্রিত করে বেআইনীভাবে একটা পার্লামেন্ট পর্যন্ত গঠন করেছেন, সেই পার্লামেন্ট রাদোভান কারাজদিককে বসনিয়া সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতা ও যুদ্ধ করার সর্বময় ক্ষমতা দিয়ে একটা বিলও পাস করেছে। রণক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে, চলতে থাকুক, মেলানজিক বেলোভিচ অন্য একটা ক্ষেত্র বেছে নিয়ে বসনিয়ান সার্বদের স্বার্থরক্ষা করছেন। বসনিয়া মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র হওয়ায় তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্যে সারা দুনিয়ার মুসলমানরা নিজেদের দেশে আন্দোলন করছে, অনেক রাষ্ট্র প্রকাশ্যে ঘোষণাও দিয়েছে যে এমবার্গো বহাল রাখা হলে অন্য পথে বসনিয়া সরকারকে সাহায্য করবে তারা। বিশেষ করে এই রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধেই স্যাবোটাজ শুরু করেছেন মেলানজিক বেলোভিচ। ইতিমধ্যে তাঁর টেরোরিস্ট গ্রুপ অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে একটা ইরানী কার্গো ভেসেল ডুবিয়ে দিয়েছে, সুয়েজ ক্যানেলে ডুবিয়েছে মিশরের একটা যুদ্ধজাহাজ, অবরুদ্ধ সারায়েভোর জন্যে মানবিক সাহায্য নিয়ে জাতিসংঘের যে তিনটে কনভয় রওনা হয়েছিল সেগুলোকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে দিয়েছে, পরে সেই সাহায্য সামগ্রী লুঠও করেছে।

মেলানজিক বেলোভিচ সেনাবাহিনীতে ছিলেন এঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর একজন ক্যাপ্টেন। কাকতালীয় বলা যাবে না, বিস্ফোরকের ওপর প্রবল ঝোঁক থাকায় এক সময় ডেমোলিশন এক্সপার্ট হয়ে ওঠেন তিনি। রাদোভান কারাজদিকের সঙ্গেই কাজ করতেন, পরে আলাদা একটা গ্রুপ গঠন করেছেন, নাম বসনিয়া জেনারেল কমান্ড। গ্রুপের মহিলা কমিটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর স্ত্রী, সাবরিনা বেলোভিচ। ওঁদের দুই সন্তান, গোরাজদিক বেলোভিচ ও সেলার্ভিক বেলোভিচ। দু'জনেই সংগঠনের উঁচু পদে আছে।

জাতিগত মিল থাকায় রাশিয়া ও জার্মানী বসনিয়া সার্বদের সাহায্য করছে, স্বাধীন সার্বিয়াও ওই একই কারণে উৎসাহ দিচ্ছে ওদেরকে। ফলে অস্ত্র ও টাকার কোন অভাব নেই বসনিয়ান সার্বদের। এমবার্গো থাকায় বিপদে পড়েছে একা বসনিয়া সরকার।

প্যাসেঞ্জার প্লেন উড়িয়ে দেয়ার কর্মসূচী বসনিয়া জেনারেল কমান্ড শুরু করেছে গত বছরের প্রথম দিক থেকে। তুরস্কের যে প্লেনটা আঙ্কারা থেকে জুরিখে যাবার পথে মাঝ আকাশে বিস্ফোরিত হয় তাতে বোমা রেখে এসেছিল সেলার্ভিক বেলোভিচ। ওরা পিআইএ-র ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ভিয়েনাগামী একটা প্লেনেও বোমা রেখে আসে, তবে টের পেয়ে ইমার্জেন্সী ল্যান্ডিং করে পাইলট, কোন বিপদ হয়নি। চলতি বছরের প্রথম দিকে মেলানজিক বেলোভিচ সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ঘোষণা দেন, 'বসনিয়া সরকারকে সাহায্য করতে চায় এমন যে-কোন মুসলিম-প্রধান রাষ্ট্রের প্লেন যে-কোন মুহূর্তে আকাশে বিস্ফোরিত হতে পারে, কাজেই প্যাসেঞ্জারদের নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা আমরা দিতে পারছি না।'

বসনিয়া জেনারেল কমান্ড ইউরোপের অনেকগুলো শহরে শাখা অফিস চালু করেছে। রোম, ফ্রাঙ্কফুর্ট আর মাল্টাতেও একটা করে শাখা আছে তাদের। একজন রাশিয়ানকেও দলে ভিড়িয়েছেন মেলানজিক, তার নাম ভ্লাদিমির শেরেঙ্কো। শোনা যায়, বোমা বানানোয় সে-ই নাকি দুনিয়ার সেরা কারিগর।

কয়েকটা ম্যাগাজিন ও দৈনিক পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছিলেন মেলানজিক, ডেস্কের লাল টেলিফোনটা বেজে উঠল। ক্রেডল থেকে রিসিভার তুলে কানে ঠেকালেন তিনি, কর্নেল পেত্রোভিচ-এর গলা ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে। বসনিয়ার সার্বদের রাজনৈতিক নেতা রাদোভান কারাজদিক ও সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট মিলানোভিচ-এর সঙ্গে মেলানজিকের সরাসরি কনট্যাক্ট এই কর্নেল।

পেত্রোভিচ বললেন, 'আমাদের প্যারিস অফিসে এক লোক যোগাযোগ করেছে, বলছে আপনার উপকার লাগতে পারে এমন তথ্য আছে তার কাছে।'

'কি ধরনের তথ্য?'

'তা সে বলেনি, তবে একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে—মিডলটন। তারপর জানিয়েছে, আপনার যদি আগ্রহ থাকে, ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন-এর পার্সোনাল কলামে সাতদিনের মধ্যে একটা বিজ্ঞাপন ছাপতে হবে আপনাকে। বিজ্ঞাপনের ভাষা হবে—"সেলিনা কারাভিচ শিগ্গির বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করো"।'

মেলানজিক এক মুহূর্ত চিন্তা করে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি ধারণা?'

'মাত্র কয়েক ডলারেরই তো ব্যাপার। আপনি চান বিজ্ঞাপনটা ছাপার ব্যবস্থা করি আমি?'

'আমি কৃতজ্ঞ থাকব,' মৃদু কণ্ঠে বললেন মেলানজিক।

'ঠিক আছে। নতুন কোন খবর থাকলে জানাব।'

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে ডেস্কের ওপর রাখা ছোট স্ফটিকের জারটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন মেলানজিক। জারের ভেতর কালচে লাল রঙের মাটি রয়েছে। এ তাঁর গ্রামের মাটি, সারায়েভোর কাছাকাছি থেকে সংগ্রহ করা।

*

সকালে ব্যায়াম ও সাঁতার সেরে ব্রেকফাস্ট খায় ওরা, তারপর পবনকে নিয়ে নিজের স্টাডি রুমে ঢোকে রানা। পবনের বই-পত্র সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে পাখি, তাকে পড়ানোর দায়িত্ব রানাকেই নিতে হয়েছে। স্টাডি থেকে বেলা বারোটার দিকে বেরোয় ওরা, রানা চলে যায় পাজেরো তাজার পুরানো খামারবাড়ি মেরামতের কাজে সাহায্য করতে, আর পবন ড্রইংরুমে একজন শিক্ষকের কাছে সার্বো-ক্রোট ভাষা শিখতে বসে। ভদ্রলোকের নাম করিম শ্লোভাক, সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সব ক'টা ভাষায় দখল আছে তাঁর। লিখিত কিছু শেখান না তিনি, সবই মৌখিক।

সেদিন দুপুরের দিকে পবন জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের প্রতিযোগিতার কি হলো?'

'ক'বার যাওয়া-আসা করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল রানা।

চিন্তা করে জবাব দিল পবন, 'দশবার। মানে পাঁচবার যাব, পাঁচবার আসব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে। কি বাজি?'

'যদি জিতি, সন্ধের পর অন্তত এক ঘণ্টার জন্যে আমাকে রুচিতা'স-এ যেতে দিতে হবে,' বলল পবন। 'আমার নতুন বন্ধুরা সবাই ওই সময় ওখানে থাকে।'

'আর যদি হারো?'

মাথা নেড়ে হাসল পবন। 'হারব না। আমার চেয়ে বয়েস আপনার বেশি। আপনি আমার সঙ্গে পারবেন না।'

'ইস, নিজেকে উনি সেয়ানা ভাবতে শুরু করেছেন!' গাছের ছায়ায় একটা চেয়ারে বসে ওদের কথা শুনছিল পাখি। 'এই, বাঁদর, গুরুজনদের সঙ্গে এভাবে কথা বলতে হয়?'

'না, ঠিক আছে, ও কোন বেয়াদপি করছে না,' বলল রানা। 'পবন, আত্মবিশ্বাস থাকা খুব ভাল কথা। তবু, বলা তো যায় না, কোন কারণে যদি হেরেই যাও, কি দেবে আমাকে?'

'কি দেব…কি আছে আমার…' চিন্তা করছে পবন। হঠাৎ তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে চট করে পাখির দিকে তাকাল একবার, বলল, 'এমন একটা জিনিস প্রেজেন্ট করব আপনাকে, দেখে অবাক হয়ে যাবেন। কিন্তু জিনিসটা কি এখুনি তা বলা যাচ্ছে না। আশা করি কাল বিকেলের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে ওটা, তখন দেব।'

'কি রে পবন?' কৌতূহলে চকচক করে উঠল পাখির চোখ দুটো। 'এখানে তোর কি আছে যে প্রেজেন্ট করবি?'

'তোমাকে বলব কেন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঝগড়া কোরো না,' বাধা দিল রানা। 'এসো, শুরু করা যাক।'

আসা ও যাওয়া এক দফা ধরা হয়েছে, প্রথম দফায় দু'ফুট এগিয়ে থাকল পবন. দ্বিতীয় দফায় পাঁচ ফুট। পাখি ভাবছে, রানার গর্বে আঘাত লাগছে কিনা। কে জানে

পরাজয়টা কিভাবে নেবে ও। তবে তৃতীয় দফার শুরু থেকেই পবনের গতি মন্থর হয়ে এল। রানা প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত একই গতিতে সাঁতরাচ্ছে, নির্দিষ্ট ছন্দে। চতুর্থ দফায় ব্যবধান বলে কিছু থাকল না, পাশাপাশি থাকল দু'জন। শেষবারে পবন দশ ফুট পিছিয়ে পড়ল। পানি থেকে উঠে পুলের কিনারায় বসল রানা, হাত বাড়িয়ে পবনকে ওপরে উঠতে সাহায্য করল। ওখানেই কয়েক মিনিট বসে থাকল ওরা, গল্প করছে। বেশিরভাগ রানাই কথা বলছে। খাদে নামানো গলা, তবু চেয়ারে বসে শুনতে পেল পাখি।

'তোমার ভুলটা কি ছিল?'

এখনও হাঁপাচ্ছে পবন। 'শুরুতেই আমার স্পীড খুব বেশি ছিল,' জবাব দিল সে।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওটা ছিল তোমার দ্বিতীয় ভুল। প্রথম ভুল করেছ, জিততে পারবে কিনা তা নিশ্চিতভাবে না জেনেই চ্যালেঞ্জ করে বসে। আর কখনও এরকম কোরো না—না কোন প্রতিযোগিতায়, না কোন অন্য কাজে। কখনও কোন যুদ্ধে যেয়ো না, যদি না নিশ্চিতভাবে জানো যে সে যুদ্ধে তুমিই জিতবে। সেরকম, মন পাবে না জানলে কোন মেয়ের পিছু নিয়ো না।'

পবন কথা বলছে না, হজম করতে সময় নিচ্ছে।

'তুমি সন্ধের পর রুচিতা'স-এ যেতে চেয়েছ,' বলল রানা। 'আমি জানি, ওই সময় ওখানে গোজোর অনেক মেয়ে থাকে। তোমার যেতে চাওয়ার সেটাই কি আসল কারণ?'

ম্লান মুখে চুপ করে থাকল পবন, আড়চোখে বোনের দিকে একবার তাকাতে গিয়েও তাকাল না।

'এতে লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই,' বলল রানা। 'লন্ডনে বড় হয়েছ তুমি। গোজোর পরিবেশও খোলামেলা। তুমি সত্যি কথা বললে আমার মনে হয় না তোমার আপা মাইন্ড করবেন।'

পবন ফিক করে হেসে ফেলে বলল, 'গোজোর মেয়েরা ওখানে যায় ঠিকই, কিন্তু আমাকে তারা একদমই পাত্তা দেয় না।'

'দেবেও না, তার কারণও আছে,' বলল রানা। 'তবে ইতিমধ্যে তো ট্যুরিস্টরা আসতে শুরু করেছে।'

'হ্যাঁ, রমলা বীচ আর রাবাতের রাস্তায় কয়েকটা বিদেশী মেয়েকে দেখেছি, তারা আমার সঙ্গে গল্প করতেও চেয়েছে, কিন্তু···,' থেমে গেল পবন।

'কিন্তু কি?'

'কিন্তু পকেট তো সদরঘাট। শুনলাম লা গারোটা ডিস্কোয় ঢুকতেই লাগে পঁচাত্তর সেন্ট।'

'চলতি মাস থেকে তোমার পকেট মানি ধরা হলো হপ্তায় সাতাশ পাউন্ড—গোজোয় এটাই সর্বনিম্ন বেতন। তবে এর বিনিময়ে তোমাকে খাটতে হবে, পবন। কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।'

আড়চোখে বোনের দিকে তাকাল পবন। 'আমি রাজি, মাসুদ ভাই।'

'ঠিক আছে, নিডো তোমাকে শনিবারে লা গারোটায় নিয়ে যাবে। তবে

সাবধান, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যেয়ো না। ওর অনেক বান্ধবী আছে, তাদের দিকে ঝুঁকবে না, কেমন? মনে রেখো, নিডোর কিন্তু খুব হাত চলে। আমি ওকে মারামারি করতে দেখেছি। এখন যাও, তোমার করিম স্যার আসার সময় হয়েছে।'

পবন চলে যাবার পর পাখির সামনে এসে দাঁড়াল রানা, তোয়ালে দিয়ে গা মুছছে। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আবার কিছু মনে করলেন না তো?'

মাথা নাড়ল পাখি। 'বাবাও বলতেন, ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবু ভয় লাগে, ওর বয়েস তো খুব কম…'

রানা বলল, 'আমি দেখতে চাই ওর ভেতর জড়তা ও ভীতি বলে কিছু নেই। আমার ধারণা, মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা না করলে সপ্রতিভ হওয়া যায় না। পবন যে পেশা বেছে নিতে যাচ্ছে তাতে যে-কোন ধরনের আড়ষ্টতা বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

'কিন্তু ওর লেখাপড়ার কি হবে?' পাখি উদ্বিগ্ন।

'আমি তো ওকে পড়াচ্ছিই, হাতের কাজটা শেষ হলে আবার ওকে কলেজেও পাঠাব,' বলল রানা। 'আপনি চিন্তা করবেন না, ওর সব দায়িত্ব আমার।'

পরদিন বিকেলে সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে ফেলল পবন। কি যেন খুঁজছে সে, কিন্তু কোথাও পাচ্ছে না। 'কি খুঁজছিস অমন করে?' পাখি জিজ্ঞেস করলেও, কোন উত্তর পেল না। সন্ধের পর হতাশায় কালো হয়ে গেল পবনের চেহারা। নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। খানিক পর জানালা দিয়ে উঁকি দিল পাখি, দেখল তার কাগজ আর রঙ তুলি চুরি করে কার যেন ছবি আঁকার চেষ্টা করছে পবন।

এক ঘণ্টা পর উদভ্রান্ত চেহারা নিয়ে ঘর থেকে বেরুল পবন। পাখি তাকে ডেকে বলল, 'কি করছিলি দেখেছি। ভাবলাম তুই আবার কবে ছবি আঁকতে শিখলি। তা কার ছবি আঁকা হচ্ছিল?'

চোখ-মুখ কালো করে পবন বলল, 'আঁকতে পারলে তো সমস্যার সমাধানই হয়ে যেত। এখন যে আমি কি করি! মাসুদ ভাইকে মুখ দেখাব কি করে!'

'তারমানে?'

হঠাৎ বোনের একটা হাত ধরে ফেলে করুণ সুরে পবন বলল, 'তোমার আঁকা ছবিটা আমাকে দাও না, প্লীজ! আমি জানি ওটা তুমি লুকিয়ে ফেলেছ।'

'ওরে পাজি, তাহলে ওটাই তখন খুঁজছিলি! কিন্তু কেন, কি করবি ওটা?'

'মাসুদ ভাইকে ওটাই তো প্রেজেন্ট করব বলে ভেবেছিলাম…'

চড় তুলল পাখি। 'এমন মারব না! তোর আস্পর্ধা তো কম নয়। আমার আঁকা ছবি ওঁকে তুই প্রেজেন্ট করবি?'

'বলব কেন তোমার আঁকা! ভেবেছিলাম নিজের বলে চালিয়ে দেব। দাও না, প্লীজ!'

'ছি-ছি, তোর কি বুদ্ধিশুদ্ধি বলে কিছু নেই, পবন? সে ছবি কি ওঁকে দেখতে দেয়া যায়?'

'এঁকেছ যখন, দেখালে দোষ কি?' তর্ক ছাড়তে রাজি নয় পবন। 'তুমি ওর ছবি আঁকছ দেখেই তো চিন্তাটা আমার মাথায় ঢুকল।'

ঝট করে পবনের মুখে হাত চাপা দিল পাখি, দাঁত দিয়ে জিভ কেটে বলল,

'আস্তে, উল্লুক কোথাকার! শোন, ওটা কাউকে দেখানো যাবে না। ওটা আমি ছিঁড়ে ফেলব।'

'ছিঁড়েই যদি ফেলবে, তাহলে আঁকলে কেন?'

থতমত খেয়ে গেল পাখি। সে বলতে যাচ্ছিল, 'কেন এঁকেছি তা কি তোকে ব্যাখ্যা করে বলতে হবে?' তা না বলে সে বলল, 'এঁকেছি খেয়ালের বশে। একা একা বসে থেকে বোর হচ্ছিলাম, তাই। কিন্তু খবরদার, এ-কথা উনি যেন কোনমতে না জানেন। পবন, আমার মাথা খাবি।'

'ঠিক আছে, বলব না,' রাজি হলো পবন। 'তবে এক শর্তে, আমাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে তুমি।'

'তারমানে?'

'সাঁতারে হেরে গেছি না! মাসুদ ভাইকে কিছু একটা তো দিতে হবে। আমার কাছে টাকাও নেই যে কিছু কিনে দেব...'

চোখ দুটো সরু করল পাখি। 'তুই কি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছিস?'

হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল পবনের চেহারা। 'আপা, কিছু কিনে দিলে হবে না। মাসুদ ভাইকে বলেছি, জিনিসটা দেখে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। ওঁকে ওঁর ওই ছবিটাই দিতে হবে...'

'পবন, ওই ছবির কথা আর যদি মুখে আনিস, আমি কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লন্ডনে ফিরে যাব!'

বোনের হাবভাব লক্ষ করে ভয় পেয়ে গেল পবন। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার সমস্যার কি হবে?'

'দাঁড়া, চিন্তা করি,' বলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল পাখি। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'পেয়েছি।'

'কি?' ব্যাকুল আগ্রহে বোনের দিকে গলা লম্বা করল পবন।

'এই বাড়ির একটা ছবি আঁকব আমি, তাতে সুইমিং পুলটাও দেখা যাবে। কেমন হবে সেটা?'

তালি দিল পবন। 'দারুণ! ধন্যবাদ, আপা। তোমার এই ঋণ আমি কোনদিন ভুলব না।'

'কিন্তু কি বলেছি মনে থাকবে তো? আমি ওর ছবি এঁকেছি, এ-কথা ওঁকে জানানো চলবে না।'

'তুমি আমার ওপর হান্ড্রেড পার্সেন্ট ভরসা রাখতে পারো। তবে উনি অন্য কোনভাবে জেনে ফেললে আমাকে আবার দায়ী কোরো না।'

পাখির চোখে সন্দেহ ফুটল। 'অন্য কোনভাবে জানবেন মানে? তুই না বললে কিভাবে জানবেন?'

'ধরো, ছবিটা উনি দেখে ফেললেন, তখন?'

'কিভাবে দেখবেন? আমি তো ওটা ছিঁড়ে ফেলে দেব।'

'তাহলে তো ভালই,' বলল পবন, কামরা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। 'কিন্তু শিল্পীরা কি তাদের ছবি সত্যি ছিঁড়ে ফেলতে পারে? বিশেষ করে খেয়ালের বশে আঁকা কোন ছবি?'

*

শনিবার সন্ধ্যায় পবনকে নিতে এল নিডো। ওরা রুচিতা'স-এ চলে যাবার পর পাখিকে রানা বলল, 'আজ রাতে আর রান্না করার ঝামেলায় না গেলেও পারেন। আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা দু'জনও বাইরে কোথাও থেকে খেয়ে আসতে পারি।'

মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করল পাখি। গোজোয় মাত্র কয়েকদিন হলো এসেছে সে, এরইমধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখেছে সে, কেউ তার সঙ্গে কথা বলে না, প্রতিবেশীরা সযত্নে এড়িয়ে চলে। রানা আর পবন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ফলে সময়টা তার কাটতেই চায় না। খানিক ইতস্তত করে রাজি হয়ে গেল সে।

বাইরে থেকে ডিনার খেয়ে রাত সাড়ে দশটায় ফিরল ওরা। রুচিতা'স থেকে তখনও ফেরেনি পবন। ওরা যে যার ঘরে ঢুকল, তবে কেউই দরজা বন্ধ করল না। পবন ফিরল আরও প্রায় এক ঘণ্টা পর।

দড়াম করে শব্দ হলো দরজা খোলার, তারপর ভারি কিছু পতনের আওয়াজ শোনা গেল, মনে হলো বিছানা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারেনি পবন, তার আগেই মেঝেতে পড়ে গেছে। করিডরে বেরিয়ে এল পাখি, দেখল তার আগেই নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে রানা। ইঙ্গিতে পাখিকে এগোতে নিষেধ করল ও।

পরদিন সকালে পবনকে বিছানার ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকতে দেখল পাখি, পুরোদস্তুর কাপড়চোপড় পরা, এমন কি পায়ের জুতো জোড়াও খোলেনি।

কাল রাতে সম্ভবত প্রচুর বিয়ার খেয়েছে পবন, তাসত্ত্বেও ব্রেকফাস্টের আগেই তাকে একশো দফা সাঁতার কাটতে বাধ্য করল রানা।

বিকেল তিনটে।

বারান্দা থেকে পুরানো খামারবাড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন অনোরিয়া। ওখানে তাঁর ছেলে নিডোর সঙ্গে নতুন একটা পাঁচিল তৈরি করছে রানা। আজ সকালে পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছিলেন তিনি, প্রতিবেশীদের অনেকের সঙ্গেই কথা হয়েছে। সবাই একবার করে রানার মেহমান পাখি-প্রসঙ্গ তুলেছে। সবারই বক্তব্য, মেয়েটাকে তারা পছন্দ করে না, দেখতে পেলেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। তিনি শুধু শুনে গেছেন, ভাল-মন্দ কোন মন্তব্য করেননি।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে হঠাৎ তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন। ঘরে ঢুকে হাত ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন বাড়ি থেকে, তার আগে একটা চিরকুট লিখলেন স্বামীকে উদ্দেশ্য করে।

পুলের ধারে একটা চেয়ারে চোখ বুজে বসেছিল পাখি, এই সময় মান্ধাতা আমলের ডোর-বেলটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিতেই অপরিচিতা মহিলাকে দেখে অবাক হয়ে গেল সে।

'হ্যালো,' বললেন অনোরিয়া। 'তুমি নিশ্চয়ই পাখি। আমি অনোরিয়া, নিডোর মা। আমাকে তুমি ভেতরে ডাকবে না?'

লাজুক হেসে একপাশে সরে দাঁড়াল পাখি। 'আসুন, প্লীজ!'

দু'দিন পর, আজও পবনকে নিতে এসেছে নিডো। পবন তার ঘরে কাপড় পরছে। পাখি কিচেনে। নিডোকে নিয়ে সুইমিং পুলের ধারে বসল রানা। আলাপ শুরু হলো পুরানো খামারবাড়ি নিয়ে। শুধু মেরামত নয়, খালি জায়গায় কয়েকটা ঘরও তৈরি করছে ওরা। ছাদ হিসেবে কাঠের কড়িকাঠ ব্যবহার করা হবে, নাকি খিলান তৈরি করা হবে, এ নিয়ে এখনও মতভেদ আছে ওদের মধ্যে। সে প্রসঙ্গেই নিডো বলল, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি, মাসুদ ভাই। বীম নয়, খিলানই হবে।'

'কেন?'

'কেন আবার, খিলান আমার পছন্দ, তাই।'

খানিক পর রানা বলল, 'কিন্তু তোমাকে ক্রেতার কথাও তো ভেবে দেখতে হবে। সবাই যেখানে কাঠের বীম পছন্দ করে, খিলান তৈরি করার কি মানে? তুমি তো আর ওখানে বাস করতে যাচ্ছ না।'

চোখ সরু করে রানাকে দেখল নিডো। কথা না বলে চেয়ার ছাড়ল সে, চিৎকার করে বলল, 'পবন, দু'মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে না এলে আমাকে তুমি পাবে না কিন্তু।'

পবনের চিৎকার ভেসে এল, 'আসছি, নিডো, আসছি!'

দাঁত বের করে হাসল নিডো। 'রুচিতা'স-এর মেয়েগুলো না পবনকে দেখে একেবারে পাগল হয়ে গেছে।'

রানা বলল, 'তুমি ওকে একটু সামলে রেখো, নিডো। তুমি ওখানে যাও বলেই ওকে আমি যেতে দিচ্ছি। মনে রেখো, দু'একটা বিয়ার চলতে পারে, তার বেশি কিছু না।'

'সে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না। ভাল কথা, মা আপনাকে একটা কথা বলতে বলেছে।'

'কি কথা?'

'আগামী রোববারে পবন আর ওর বোনকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ি যাবেন আপনি। মা বলে দিয়েছেন, তা না হলে আপনারও যাবার দরকার নেই।'

রানা বলল, 'পাখির মুখে শুনলাম ওকে নিয়ে লেডিস ক্লাবে গিয়েছিলেন আন্টি, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। পাখি কিন্তু সাঙ্ঘাতিক খুশি হয়েছে।'

সোমবারে ডিনারে বসে কথাটা বলল রানা। সকালে রুচিতা'স থেকে কয়েকটা চিঠি নিয়ে এসেছে ও, তার মধ্যে একটায় পোস্ট-মার্ক ছিল ওয়াশিংটনের। বিকেলে নিডোর সঙ্গে আজ খামারবাড়িতে কাজও করেনি, স্টাডিতে বসে কয়েকটা ফোন করেছে—লোকাল ও ওভারসীজ।

'কাল আমি চলে যাচ্ছি,' বলল ও। 'কয়েক দিন ফিরব না।'

পবন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছেন, মাসুদ ভাই?'

'এই এদিক-সেদিক। অনেকগুলো কাজ সারতে হবে। পবন, পিওতর মেনিনো নামে এক লোককে তুমি চেনো? পাজেরো তাজার ভাইপো, নিডোর কাজিন?'

মাথা ঝাঁকাল পবন।

'কি করে সে, জানো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল পবন। 'মাল্টা পুলিসের ইন্সপেক্টর, অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের কমান্ডার।'

'আজ দুপুরে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। কাল থেকে শুরু, সোম আর বুধবার সকাল সাতটার ফেরী ধরে রওনা হবে তুমি, তারপর বাসে চড়ে ভ্যালেটায় পৌছুবে। টার্মিনাল থেকে হাঁটা পথে ফোর্ট সেন্ট এলমো খুব দূরে নয়। ওখানে তোমার জন্যে অপেক্ষা করবে পিওতর।'

'ওখানে গিয়ে কি করব আমি?'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল রানা, তারপর পাখির দিকে একবার তাকিয়ে বলল, 'ওখানেই তোমার ট্রেনিং শুরু হবে।'

সাত

প্রথমে লুক্সেমবার্গে এল রানা, ছোট একটা প্রাইভেট ব্যাংকের অফিসে আধ ঘণ্টা কাটাল। তারপর লন্ডনে পৌঁছে কুইন্সগেট এলাকার একটা বাংলাদেশী হোটেলে উঠল—বাঙালী একটা পরিবার চালায়, নাম শান্তি নিবাস। এখানে সবাই ওকে রফিক ভাই হিসেবে চেনে। হোটেলের রিসেপশনিস্ট 'ফ্যান্টম অব দি অপেরা'-র একটা টিকেটের ব্যবস্থা করল ওর জন্যে।

হোটেলে যখন ফিরল রানা, মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। নাইট পোর্টার জানাল, বার-এ এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন ওর জন্য। বারটেন্ডার অনেক আগেই চলে গেছে, তবে নাইট পোর্টার নিজের কাজে ফিরে যাবার আগে ওদেরকে কফি বানিয়ে দিয়ে গেল।

ভদ্রলোকের বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, মাথায় বালি রঙের চুল। ছোটখাট কাঠামো। বললেন, 'ওরা আপনার কথা জিজ্ঞেস করছে, মি. রানা। খোঁজ নিচ্ছে কোথায় আছেন আপনি, কি করছেন।'

'কারা?'

'একজনের নাম মাইকেল ম্যানডেক্স। মিডলটন ইনভেস্টিগেশন-এর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাঁকে। অত্যন্ত যোগ্য ডিটেকটিভ। তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চকে প্রশ্ন করেন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ আমাদেরকে। ফাইলটা আমার ডেস্কে চলে আসে।' ভদ্রলোক বিদেশী একটা ইন্টেলিজেন্সে চাকরি করলেও, রানা এজেন্সি তাঁকে নিয়মিত মাসোহারা দেয়।

'তারপর?'

ছোটখাট মানুষটা হাসলেন। 'তারপর এফবিআই-এর ওপর মহল থেকে একই প্রশ্ন করা হলো।'

'কত ওপর থেকে?'

'ভদ্রলোকের নাম লী আলেকজান্ডার। উনিই ডেপুটি ডিরেক্টর।'

'আপনারা কি জবাব দিলেন?'
ভদ্রলোক ক্ষমাপ্রার্থনার সুরে বললেন, 'ইমরুল হাসান সম্পর্কে যে-সব তথ্য আমাদের কম্পিউটরে ছিল, সব জানিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। বলেছি, ইমরুল হাসানই মাসুদ রানা, এবং তিনি বেঁচে আছেন। বর্তমানে কোথায় আছেন, জানা নেই।'
মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তদন্ত কেমন এগোচ্ছে?'
ভদ্রলোকের মুখে গম্ভীর হাসি ফুটল। 'খুব ধীরে। শেষ মেমোটা দেখেছি এক হপ্তা আগে। ম্যানডেক্স খুব কাজের লোক, তবে জার্মান পুলিসের সঙ্গে ঝামেলা হচ্ছে তাঁর। বোমাটা ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে প্লেনে তোলা হয়নি, এ-কথা প্রমাণ করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে জার্মানরা। হিথরোকে চিহ্নিত করতে চাইছে তারা। স্বভাবতই হিথরোর সিকিউরিটিও চিহ্নিত করতে চাইছে ফ্রাঙ্কফুর্টকে।'
রানা জানতে চাইল, 'আপনার কি ধারণা?'
'তদন্তের ফলাফল কি হয় তা জানার আগেই মার্কিন প্রশাসন থেকে সিআইএ ও এফবিআইকে বলে দেয়া হয়েছে, দায়ী করতে হবে প্যালেস্টাইনী কোন টেরোরিস্ট্র গ্রুপ, সিরিয়া অথবা লিবিয়াকে। তবে, আমার ধারণা, আসল সত্য ঠিকই বের করে ফেলবেন ম্যানডেক্স। তদন্তের ফলাফল যাই ঘোষণা করা হোক, ভেতরের আসল তথ্য সব আমি জানতে পারব। জার্মানরা সহযোগিতা না করলেও, আমরা তাকে সব রকম সহযোগিতা করছি। আমাদের পুরো একটা টীম এই কাজে লেগে আছে। তার মধ্যে চারজন ফিল্ডে।'
'কতদিন লাগবে?'
'আর খুব বেশি হলে এক মাস।'
'কারা দায়ী? আপনার কি ধারণা?'
'ঠিক বলতে পারছি না,' বালি রঙা চুলে আঙুল চালালেন ভদ্রলোক। 'তবে মেলানজিক বেলোভিচ আর তাঁর গ্রুপ একদম চুপ মেরে আছে। ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।' চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন তিনি, রানার দিকে একটা হাত বাড়ালেন। 'নতুন কিছু জানা গেলে আপনাকে আমি খবর দেব।'

ক্যাপিটল হিল থেকে খুব বেশি দূরে নয়, এরকম একটা হোটেলে মিলিত হলো ওরা। অল্প ঝাল-মরিচ দেয়া স্টেক অর্ডার দিলেন সিনেটর, সঙ্গে টমেটো ও লেটুস পাতার সালাড।
সোবার গ্রে সুট পরেছে রানা, সঙ্গে পিন-স্ট্রাইপ ক্রীম শার্ট আর মেরুন টাই। ভেতরের পকেটে হাত ভরে ছোট একটা বিজনেস কার্ড বের করে সিনেটরের দিকে বাড়িয়ে দিল ও। 'লুক্সেমবার্গ ব্যাংকটার নাম আছে এতে, পিছনে অ্যাকাউন্ট নম্বর লেখা আছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে ওখানে আপনি আড়াই লাখ ডলার ট্র্যান্সফার করবেন। কাজের শেষে যদি কিছু বাঁচে, ফেরত দেয়া হবে। আমার আড়াই লাখ এরইমধ্যে ওই অ্যাকাউন্টে জমা দেয়া হয়েছে। আপনি যদি চেক করে দেখতে চান, কার্ডে লেখা নম্বরে ফোন করলেই সব জানতে পারবেন।'
'মি. রানা, আপনি ওই আঙুলটা পাঠাবার পর আপনাকে কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন

না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।'

রানা জানতে চাইল, 'আপনার বন্ধু লী আলেকজান্ডার নতুন কোন তথ্য দিলেন?'

'লী সম্পর্কে কোত্থেকে জানলেন আপনি?'

'তিনি আমার সম্পর্কে লোকজনকে প্রশ্ন করছেন।'

'কে বলল আপনাকে?'

'সিনেটর!'

মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকালেন ডেভিড ক্রিস্টোফার। 'হ্যাঁ, আমারই ভুল। সিনেটর বেশি ফরম্যাল হয়ে যায়, আপনি আমাকে ডেভিড বলে ডাকবেন। আমার সব বন্ধুই তাই বলে। আমিও আপনাকে শুধু রানা বলে ডাকতে পারি তো?'

মাথা ঝাঁকিয়ে রানা আবার জিজ্ঞেস করল, 'মি. লী আপনাকে নতুন কোন তথ্য দিতে পারেননি?'

'সিআইএ ও এফবিআইকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে ঘটনার সঙ্গে মুসলিম চরমপন্থী কোন গোষ্ঠী জড়িত কিনা তা ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট অফিসাররা এমন কিছু আলামত আবিষ্কার করেছেন, যা দেখে সন্দেহ হয় ওরা কেউ দায়ী নয়—দায়ী সম্ভবত...কথাটা বলার আগে আপনাকে জানানো দরকার, এ-সব গোপন তথ্য, লী শুধু আমাকে জানিয়েছেন, আমি শুধু আপনাকে জানাচ্ছি—আনঅফিশিয়ালি। প্রচার মাধ্যমকে এ-সব তথ্য দেয়া যাবে না। ঠিক আছে?'

'অবশ্যই।'

'দায়ী সম্ভবত বসনিয়া জেনারেল কমান্ড,' বললেন সিনেটর। 'তবে ব্যাপারটা প্রমাণ করতে আরও সময়ের দরকার। লী সন্দেহ করছেন, মেলানজিক বেলোভিচ জড়িত থাকতে পারেন।'

রাতের ফ্লাইট ধরে নিউ ইয়র্ক থেকে ব্রাসেলসে চলে এল রানা, ইমিগ্রেশন ও কাস্টমস শেড থেকে বেরিয়ে এসে একটা পে ফোনের বুদে ঢুকল। সকাল মাত্র সাতটা বাজলেও, বারটা এতক্ষণে খুলে গেছে বলেই ওর ধারণা। অপরপ্রান্তে এক লোকের সাড়া পাওয়া গেল, পরিচিত কণ্ঠস্বর। তবে নিজের গলা একটু বদলে নিল, যাতে চিনতে না পারে। ও বলল, 'বটলনেক-এর জন্যে একটা মেসেজ। তাকে বলতে হবে মেসেজটা ই-র তরফ থেকে। আজ রাত দশটার কথা বলতে হবে তাকে।' যোগাযোগ কেটে দিয়ে টার্মিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে এল ও, একটা ট্যাক্সিতে চড়ে ড্রাইভারকে বলল, 'প্যাপাগাল। কোথায় জানো তো?'

'তা আর জানব না!' জবাব দিল ড্রাইভার। 'তবে এই সময় ওখানে গিয়ে কোন লাভ নেই।'

'আমি অপেক্ষা করব।'

ইসি হেডকোয়ার্টারের কাছাকাছি একটা সাইড রোডে ব্রথেলটা। ভারি কাঠের দরজা খুলে দিল প্রৌঢ়া কাজের বুয়া। 'ব্যবসা এখন বন্ধ। আপনি রাত আটটার পর আসুন।'

'ন্যানিকে বলো হাসান এসেছে।'

মুখ তুলে রানার চোখ দেখল প্রৌঢ়া, তারপর এক পাশে সরে দাঁড়াল।

'আমি কিচেনে আছি,' বলল রানা। করিডরে নরম কার্পেট পাতা, অর্ধেকটা পেরিয়ে এসে খোলা দরজা দিয়ে একটা লম্বা ঘরের ভেতর তাকাল। অত্যন্ত দামী সব আসবাব দিয়ে সাজানো। গভীর সেটী, ভারি পর্দা, ক্রিস্টাল ঝাড়বাতি, রঙিন টিভি ও স্টেরিও সেট, মখমলের চাদর ঢাকা উঁচু বিছানা। তবে কামরার ভেতর কেউ নেই। থামেনি রানা, করিডর ধরে এগোচ্ছে ওর বাম দিকের একটা দরজা লক্ষ্য করে।

দশ মিনিট পর কফি বানাচ্ছে, খুলে গেল দরজা। ভেতরে ঢুকলেন ন্যানি, পরনে ফরমাল নাইটড্রেস। বয়স পঁয়ষটি হলেও, মাথায় ঘন কালো চুল, অসংখ্য রিঙ-এর সমষ্টি। মুখে এই মুহূর্তে কোন মেকআপ নেই। ভেতরে ঢুকলেন চোখে নগ্ন সন্দেহ নিয়ে। তাঁর পিছনে পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে আছে এক লোক, কুচকুচে কালো উদোম গায়ে কিলবিল করছে অসংখ্য পেশী। লোকটার ডান হাত ট্রাউজারের পকেটে। চোখ দুটো কালো বোতাম। দৃষ্টি ভাবলেশহীন।

বুকে ক্রস চিহ্ন এঁকে ইটালি ভাষায় বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলেন ন্যানি। তারপর ফ্রেঞ্চ ভাষায় বললেন, 'আমি শুনেছিলাম বাছা আমার বেঁচে নেই!'

একটু হাসল রানা। ওর হাসিতে শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল। 'দুঃখিত, ন্যানি। আপনাকে আমার জানানো উচিত ছিল।'

কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনের লোকটার দিকে তাকালেন ন্যানি। 'তুমি এবার যেতে পারো। এ আমার নাতির বন্ধু। দরজাটা বন্ধ করে যাও।'

দরজা বন্ধ হতে এগিয়ে এসে রানাকে আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধা। তারপর কষে একটা চড় মারলেন ওর গালে। এত জোরে, মাথাটা যেন ঘুরে উঠল রানার। 'আর কক্ষনো এমন কাজ করবে না,' হিসহিস করে বললেন। 'রোজ আমি চার্চে গেছি। তোমার আত্মার শান্তির জন্যে প্রার্থনা করেছি, মোমবাতি জ্বেলেছি, ভিক্ষুকদের মুঠো-মুঠো টাকা দিয়েছি··· তোমার জন্যে আমি কেঁদেছি।'

বৃদ্ধা এখনও কাঁদছেন।

তাঁর মাথায় হাত রেখে রানা বলল, 'সত্যি আমার অন্যায় হয়েছে, ন্যানি। এবারের মত মাফ করে দিন।'

আস্তিন দিয়ে চোখ মুছলেন ন্যানি। 'নিশ্চয়ই কোন দরকারে এসেছ···?'

'প্রথমে এক কাপ কফি খাব, তারপর নিরেট কিছু মুখে দেব, শেষে নাক ডেকে ঘুমাব কিছুক্ষণ।'

'কতক্ষণ থাকবে?'

'দু'দিন, বড় জোর তিন দিন।'

এরপর কিচেনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ন্যানি, দায়িত্ব সচেতন গৃহকর্ত্রীর মত। 'তুমি যে কামরাটায় উঠতে, সোজা ওখানে চলে যাও। খাবার আর কফি নিয়ে আসছি আমি। ব্রেকফাস্টে কি খাবে বলতে হবে না, আমি জানি।' রানা কিচেন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, পিছন থেকে আবার বললেন, 'ঘুমাবার আগে সব কথা বলতে হবে আমাকে···আমার প্রার্থনা, মোমবাতি, দান আর চোখের পানি শোধ করতে হবে তোমাকে।'

*

বারে ঢুকল রানা ঠিক পৌনে দশটায়। কয়েকটা মুখ চিনতে পারল ও। ওকে কেউ চিনল না। চেহারা বদলে দেয়ার পাকা হাত ন্যানির। এক ঘণ্টা খেটে ওর মুখের আকৃতিই বদলে দিয়েছেন তিনি। নতুন এক জোড়া গোঁফও জায়গামত বসিয়ে দিয়েছেন।

কামরাটা বেশ বড়, লম্বা বারটা এক ধারে। বারে পৌঁছে একটা বিয়ারের অর্ডার দিল রানা, লক্ষ করল বারটেন্ডার জ্যাক-এর চেহারা এ ক'বছরে এতটুকু বদলায়নি। বিয়ার নিয়ে দূর এক কোণের টেবিলে চলে এল ও। এখানে সবারই জানা আছে যে কেউ যদি ব্যবসা নিয়ে কথা বলতে চায় কোণার টেবিলই পছন্দ করবে সে।

ন্যানির এই বার তথ্য বেচাকেনার জন্যে আদর্শ। এখানে বসে নানা ধরনের লোক পরস্পরের সঙ্গে চুক্তি করে।

বটলনেক ঠিক দশটায় পৌঁছুল। দেখে মনে হবে ষাটের কাছাকাছি বয়েস, তবে রানা জানে লোকটার বয়েস আরও অনেক বেশি। কামরার চারদিকে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল সে। ন্যানির হাত যতই পাকা হোক, বটলনেককে ফাঁকি দিতে পারবে না। তার সঙ্গে কম বয়েসী এক লোক রয়েছে, বিড়বিড় করে কি যেন বলল তাকে। লোকটা বার-এর দিকে চলে গেল।

রানার টেবিলের দিকে এগিয়ে এল বুড়ো। 'এ ঘটনা আর মাত্র একবার ঘটেছে,' চেয়ারে বসে বলল সে।

'কি?' জিজ্ঞেস করল রানা। বটলনেককে ডাকার কারণ হলো, লোকটার মাধ্যমে যে-কোন ফাটলে ঢুকে আবার বেরিয়ে পড়াটা কোন সমস্যা হয় না।

'মরা মানুষের জ্যান্ত হবার ঘটনা।'

রানা তাকে ড্রিঙ্ক অফার করল না। বটলনেক শুধু পানি পান করে, তা-ও কখনোই কোন বারে বসে নয়। লোকটা কথাও বলে খুব কম।

'কি বিষয়?' জানতে চাইল সে।

'জটিল একটা কাজ,' বলল রানা। 'তবে পেমেন্ট ভাল।'

'কত ভাল?'

'তিন লাখ।' মুদ্রার নাম বলার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। এই বারে সব চুক্তিই সুইস ফ্র্যাঙ্কে হয়। 'সময়ের স্কেল বেশ লম্বা। তিন থেকে ছ'মাস লাগতে পারে। তবে প্রতি মাসে তোমার সার্ভিস দরকার হবে চার কি পাঁচ দিন।'

'কোথায়?'

'তিনটে গর্ত দরকার আমার। একটা জাগরেবে, একটা বেলগ্রেডে আর একটা মিলানে। ব্যস্ত এলাকায় ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট, শপিং সেন্টার বা বাজারের কাছাকাছি হলে ভাল হয়। ওগুলোয় প্রতি মাসেই চার-পাঁচ দিন করে বসবাস করা হবে, কেউ যাতে কিছু সন্দেহ না করে। আপনার কাভারে কোন খুঁত থাকা চলবে না, বিশেষ করে ডকুমেন্টে—ব্যবসায়ী হিসেবেই বেশি মানাবে আপনাকে। প্রতিটি গর্তে কিছু কিছু মেশিনারিও আপনাকে পৌঁছে দিতে হবে।'

'হেভি মেশিনারি?' বটলনেক জিজ্ঞেস করল।

মাথা নাড়ল রানা। 'মিডিয়াম টু লাইট। একজোড়া আরপিজিসেভেন,

একজোড়া সাবমেশিন-গান, উজি হলে ভাল হয়; একজোড়া হেভি'হ্যান্ডগান, খুশি হই ওগুলো যদি কোল্ট নাইনটীন ইলেভেন হয়। সেই সঙ্গে দুটো স্নাইপার রাইফেল, সাইলেন্সার আর নাইটস্কোপ সহ। আর দরকার কিছু গ্রেনেড—দু'ডজন, ফ্র্যাগমেন্টেশন ও ফসফোরেসেন্ট। সঙ্গে অ্যামুনিশন। আরপিজিসেভেনের জন্যে চারটে রকেট, প্রতিটি উজির জন্যে আটটা ম্যাগাজিন, কোল্টের জন্যেও তাই। আমি চাই প্রতিটি আইটেম এক মাসের মধ্যে জায়গামত পৌঁছে যাবে। প্রতিটি গর্তে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ মেডিকেল কিট চাই। পারবেন?'

বটলনেক মাথা নাড়ল। 'না।'

'আপনি ব্যস্ত?'

আবার মাথা নাড়ল বটলনেক। 'না, আমি অবসর নিয়েছি। গত বছর আমি সত্তরে পড়লাম না!'

রেগে গেলেও, রানার গলা চড়ল না, 'তাহলে আগে কেন বললেন না? আমার কথা শুনলেন কেন?'

বারের দিকে মুখ তুলে ইঙ্গিত করল বটলনেক। তার সঙ্গী এগিয়ে এসে টেবিলে বসল। তার বয়েস হবে চল্লিশের কাছাকাছি। এত রোগা, কঙ্কাল বললেই হয়। কপালের ওপর এরইমধ্যে টাক দেখা দিয়েছে, চোখে রিমলেস চশমা। তার চেহারায় দৃষ্টি আকৃষ্ট করার মত আর কিছু নেই। কেউই তার দিকে দ্বিতীয়বার তাকাবে না। 'আমার ছেলে,' বলল বটলনেক। 'আপনার কাজ ও-ই করবে।'

প্রশ্ন জাগল রানার মনে। জিজ্ঞেস করতে গিয়েও থেমে গেল। পুরোপুরি যোগ্য না হলে বটলনেক তার ছেলেকে দায়িত্ব দেবে না। পারিবারিক ব্যবসায় ছেলেকে সে নিজে ট্রেনিং দিয়েছে। 'আপনার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল ও।

'বটলনেক-টু।'

'বিবাহিত?'

'হ্যাঁ, দুটো বাচ্চা আছে। বটলনেক-থ্রী আর বটলনেক-ফোর।'

বুড়োর দিকে তাকাল রানা। 'আমি কি ওকে ব্রিফ করব?'

'না, সেটা আমি করব। দুটো প্রশ্ন আছে শুধু। প্রথম প্রশ্ন, গর্তগুলো কি ভাড়া করা হবে, নাকি কিনে ফেলব?'

'কিনবেন। কোন রকম বিলাসিতার দরকার নেই, তবে মাঝারি ধরনের একজন ব্যবসায়ীর জন্যে মানানসই হওয়া চাই।'

'ফান্ড?'

'লুক্সেমবার্গে আপনার সেই আগের অ্যাকাউন্টটা কি আছে?'

'আছে।'

'কাল বিজনেস আওয়ার শেষ হবার আগেই ওই অ্যাকাউন্টে এক লাখ ফ্র্যাঙ্ক জমা হয়ে যাবে। ওটা খরচের টাকা, গর্তগুলো আর মেশিনারি কেনার জন্যে। ওতে যদি না কুলোয়, আমাকে জানাবেন। তিন লাখ ফ্র্যাঙ্ক দেয়া হবে ভেঙে ভেঙে, প্রতি মাসে পঞ্চাশ হাজার করে। কাজটা যদি আগে শেষ হয়ে যায়, শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হবে।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বটলনেক-ওয়ান-এর দিকে বাড়িয়ে দিল রানা। 'এই ঠিকানায় খবর পাঠাবেন

আমাকে। ইমার্জেন্সি দেখা দিলে ওই নম্বরে ফোন করবেন। আমাকে না পেলে মেসেজ দেবেন পবনকে।'

এই প্রথম বটলনেকের চেহারায় ভাব ফুটল। 'আমার জানামতে কোন কাজে আপনি সঙ্গে কাউকে রাখেন না।'

'এই কাজটায় একজনকে রাখছি,' জবাব দিল রানা। দ্বিতীয় লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'আপনি যেমন ওঁকে ট্রেনিং দিয়েছেন, আমিও তেমনি একজনকে ট্রেনিং দিচ্ছি।'

ঠিক মাঝরাতে প্যাপাগাল-এ ফিরল রানা। ন্যানি নিজেই দরজা খুলে দিলেন।

'আমার একটা সমস্যা হয়েছে,' বললেন তিনি। 'জ্যাকসন অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। ব্যাক আপ হিসেবে যে ছিল সে ছুটিতে আছে।'

'চিন্তার কিছু নেই, আমি আছি।' ন্যানির পিছু পিছু করিডর ধরে হাঁটছে রানা। ওর ডান দিকের খোলা দরজার পাশ ঘেঁষে যাবার সময় তাকাল ও। বিজনেস সুট পরা কয়েকজন লোক বসে আছে বার-এ, সেটীতে কাত হয়ে বসে তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েগুলো। সবাই তারা তন্বী যুবতী, বাহারি কাপড়চোপড় পরে আছে। ন্যানির এখানে শিক্ষিতা ও সুন্দরী মেয়েরাই শুধু কদর পায়। তার কারণও আছে। এখানে শুধু দেশ-বিদেশের ধনী বা বিখ্যাত মানুষরাই মনোরঞ্জনের জন্যে আসা-যাওয়া করেন। তাসত্ত্বেও মাঝে মধ্যে গোলযোগ বাধে, ছোটখাট সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে ঝামেলা বাধান তৃতীয় বিশ্বের ডিপ্লোম্যাটরা। তাঁদের অনেকেই ডিপ্লোম্যাটিক ইমিউনিটির কারণে একটু বেশি আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে ফেলেন।

ন্যানির পিছু পিছু কিচেনে এসে ঢুকল রানা। শোল্ডার হোলস্টারটা টেবিলে পড়ে আছে, বাইরে বেরিয়ে রয়েছে পিস্তলের কালো বাঁট। জ্যাকেট খুলে সেটা পরে নিল ও, তারপর বেরেটা বের করে ম্যাগাজিন চেক করল। গুলি নেই, খালি। এরপর ব্রীচ টানল, তা-ও খালি। পিস্তলটা হোলস্টারে রেখে দিল ও। পুলিসের সঙ্গে ন্যানির একটা সমঝোতা আছে। পিস্তল সব সময় খালি রাখা হবে। যদি কখনও দেখানো হয়, স্রেফ হুমকি হিসেবেই দেখানো হবে। জ্যাকেট পরে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

পিছন থেকে ন্যানি বললেন, 'আমি তোমার জন্যে কফি আনছি।'

বারোটা কামরা আছে প্যাপাগালে, তার মধ্যে এগারোটা ব্যবহার করে মেয়েরা, শেষ কামরাটা জ্যাকসন আর তার বদলী লোকের জন্যে। মেয়েদের কামরাগুলো মূল্যবান আসবাব-পত্রে সাজানো, প্রতিটি দেয়ালে অনেকগুলো আয়না আছে। জ্যাকসনের কামরায় শৃঙ্খলাবোধ সহজেই নজর কাড়ে। ছোট বিছানা, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার। একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে ছোট একটা রঙিন টিভি। টিভির মাথায়, দেয়ালে, এগারোটা বালব, প্রতিটির নিচে নম্বর লেখা। কোন মেয়ের ঘরে মক্কেল যদি ঝামেলা করে, বিছানার মাথার কাছে একটা বোতামে চাপ দেবে সে, সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকসনের কামরায় নির্দিষ্ট নম্বরের বালব জ্বলে উঠবে। টিভি অন করে নিউজ কেবল নেটওয়ার্কের খবর শুনল রানা। পাঁচ মিনিট পর ট্রে হাতে ভেতরে ঢুকলেন ন্যানি। ট্রেটা টেবিলে নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কি খিদে

পেয়েছে?'

মাথা নাড়ল রানা। 'আমি খেয়ে এসেছি। আপনি আপনার কাজে যান।'

'আজ রাতে যারা আসছেন তাদের মধ্যে ঝামেলা করার লোক একজনই আছে,' বললেন ন্যানি। 'একটার দিকে আসার কথা তার। চিলিয়ান অ্যামব্যাসীর মিলিটারি অ্যাটাশে। বেলেন্ডার ঘরে আসবেন। পীড়ন করতে ভালবাসেন। সাত নম্বরটা বেলেন্ডার ঘর।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কফি খাচ্ছে রানা, সারা দুনিয়ার দুর্দশা দেখছে টেলিভিশনে। বৈরুত, জেরুজালেমের পশ্চিম তীর, কাশ্মীর, ইথিওপিয়া, শ্রীলংকা আর বসনিয়া—মানুষের যেন হত্যা আর যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু করার নেই। চারদিক থেকে শুধু বিপদ সঙ্কেত আসছে।

রাত দেড়টায় সাত নম্বর কামরা থেকে এল, জ্বলে উঠল বালবটা। ওখানে পৌঁছুতে ষাট সেকেন্ড লাগল রানার। দরজা খুলছে, চাপা একটা গোঙানির আওয়াজ ঢুকল কানে। উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে বেলেন্ডা, মুখটা চেপে ধরা হয়েছে বালিশে। তার উদোম পিঠে একটা হাঁটু গেড়েছেন ভদ্রলোক, নিতম্বে আঘাত করার জন্যে হাতের বেল্টটা উঁচু করছেন।

দরজা ঠেলে দিয়ে রানা বলল, 'স্টপ ইট!'

ভদ্রলোক ঘাড় ফেরালেন। তাঁর চেহারায় নগ্ন উল্লাস। সেটা ম্লান হয়ে গেল, তার বদলে রাগে লালচে হয়ে উঠল মুখ। খুব লম্বা-চওড়া মানুষ, ঘন লোমে শরীরটা প্রায় ঢাকা। রানার একটা হাত জ্যাকেটের ভেতর ঢুকল, থেকে গেল ওখানেই।

'ওর ওপর থেকে নামুন,' বলল রানা। 'কাপড় পরে বেরিয়ে যান।'

চিলির সামরিক উপদেষ্টা স্প্যানিশ ভাষায় গাল দিলেন।

একই ভাষায় জবাব দিল রানা, 'আমার কাছে আপনার ডিপ্লোম্যাটিক মর্যাদার কোন দাম নেই। যা বলছি করুন।' বেরেটাটা বের করল ও।

আবার একটা গাল দিয়ে বেলেন্ডার পিঠ থেকে হাঁটু নামিয়ে সিধে হলেন ভদ্রলোক। চিৎ হলো বেলেন্ডা—লম্বা পা, লম্বা শরীর, কালো লম্বা চুল। চোখে ঘৃণা, তাকিয়ে আছে মক্কেলের দিকে।

'কি ঘটেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমাকে বোনাস দিতে চায়,' জবাব দিল বেলেন্ডা। 'বলল, শুধু একটু আঘাত করবে। এক হাজার ফ্র্যাঙ্ক। আমি রাজি হইনি। তারপর ধাক্কা দিয়ে আমাকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে মারধর শুরু করল। কুত্তাটা কাল দেশে চলে যাচ্ছে, আর ফিরবে না...'

মক্কেল কাপড় পরছেন আর ফ্রেঞ্চ ও স্প্যানিশ ভাষায় অশ্রাব্য খিস্তি করছেন বেলেন্ডাকে। রেগে গিয়ে বিছানা থেকে নামতে শুরু করল বেলেন্ডা, তার মারমুখো ভাব দেখে বাধা দিল রানা। 'নড়বে না, যেখানে আছ সেখানেই থাকো।' ওর গলায় কর্তৃত্বের সুর, স্থির হয়ে গেল মেয়েটা।

টাই পরে গায়ে জ্যাকেট চড়ালেন মক্কেল। ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েস হবে, পেশী দেখে বোঝা যায় গায়ে শক্তি রাখেন। কাপড় পরা শেষ করে রানার দিকে এক পা এগোলেন, ওর চোখে চোখ রেখে হিসহিস করে বললেন, 'শোনো হে, দালাল, অস্ত্র

না থাকলে আমি তোমার হাত দুটো শরীর থেকে ছিঁড়ে আনতে পারি।'

দরজা খুলল রানা, পিস্তলটা বাইরের কার্পেটে ফেলে দিল, আবার বন্ধ করল দরজা, তারপর হাত দুটো বাড়িয়ে দিল সামনে। 'বী মাই গেস্ট।'

হাসলেন মক্কেল। 'তোমার দেখা যাচ্ছে সাহস আছে!'

হাসল রানাও। 'তুমিও তো দেখছি ভয় পাবার পাত্র নও।' লোকটাকে সাবধানে, একটু একটু করে এগিয়ে আসতে দেখছে ও, লক্ষ করল চোখে আক্রোশ ফুটে উঠছে। আবার কথা বলতে শুরু করলেন তিনি। নরম সুরে।

'শোনো, ঠিক আছে, আমি কোন ঝামেলা চাই না। অন্তত এই সস্তাদরের একটা মেয়ের জন্যে ঝামেলা করে কি লাভ।' আবার হাসলেন তিনি, হাত দুটো ওপরে তুললেন, বাইরের দিকে তালু। 'শান্তি, ঠিক আছে?'

'আপনি যা বলেন।'

মক্কেলের ডান হাত মুঠো হয়ে যেতে দেখল রানা, সেই সঙ্গে তাঁর নিতম্ব পাক খেতে শুরু করল। পিছন ও বাম দিকে কাত হলো ও, মুঠোটা ওর মুখ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ঝোঁকটা সামলাতে না পেরে রানার ডান হাতি জ্যাব-এর মোক্ষম টার্গেটে পরিণত হলেন মক্কেল, মেঝেতে পড়ে গিয়ে একটা স্তূপের আকৃতি পেলেন। তাঁর মুখে ঝেড়ে লাথি মারল রানা। চিৎ হলেন মক্কেল, বেহুঁশ হয়ে গেছেন, নাক আর মুখ থেকে সামান্য রক্তও বেরুচ্ছে। ঝুঁকল রানা, মক্কেলের বাঁ হাতটা কব্জির কাছে ধরে নিজের হাঁটুর ওপর রাখল। তারপর ডান হাতের কিনারা দিয়ে হাতটার মাঝখানে জোরাল একটা কোপ মারল।

বিছানা থেকে হাড় ভাঙার শব্দটা শুনতে পেল বেলেন্ডা। পাঁচ সেকেন্ড পর ওই একই শব্দ আবার শুনতে পেল সে, এবার মক্কেলের ডান হাত ভেঙেছে।

মুখ তুলে তাকাল রানা। চেহারায় কোন ভাব নেই। বুকে ক্রস চিহ্ন এঁকে বিড়বিড় করে কি যেন বলল মেয়েটা।

'যাও, ন্যানিকে ডেকে নিয়ে এসো,' বলল রানা। 'বলো একটা বস্তা সরাতে হবে।'

লাল ভেলভেটের ড্রেসিং গাউনটা পরে নিল বেলেন্ডা। মক্কেলকে ডিঙাল সে, তারপর পিছন ফিরে তাকাল তার দিকে। একটু ঝুঁকে থুথু ছিটাল মুখে। তারপর মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'কুত্তাটা কাল দেশে ফিরতে পারছে না।'

রাত তিনটের দিকে বিছানায় ওঠার সুযোগ হলো রানার। পনেরো মিনিট পর নক হলো দরজায়। লাল নয়, নীল একটা ড্রেসিং গাউন পরেছে বেলেন্ডা। কথা না বলে এগিয়ে এল সে, ধীরে ধীরে বিছানার কিনারায় বসল। বেশ কয়েক সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তারপর নরম গলায় বলল, 'ন্যানি আমাকে অযথা সময় নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন। বললেন, আপনি নাকি জীবনেও আমার মত মেয়েদের ছোঁননি।' রানা কিছু বলছে না দেখে আবার বলল সে, 'সেজন্যে আমি আসিওনি। আমি এসেছি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে। আর যদি অনুমতি দেন, আপনি না ঘুমানো পর্যন্ত আপনার চুলে বিলি কেটে দিই। তারপর আমি চলে যাব।'

'না, তার কোন দরকার...'

কিন্তু রানার আপত্তি শুনল না মেয়েটা, বিছানায় আরেকটু উঠে কাত হলো সে, রানার চুলে আঙুল ঢোকাল, তবে লক্ষ রাখল ওর শরীরে যেন ছোঁয়া না লাগে। তিন কি চার মিনিট পর বেলেন্ডার হাতটা স্থির হয়ে গেল।

মাথা তুলে তাকাল রানা। একদম শিশুর মত লাগছে মেয়েটাকে। কুণ্ডলী পাকানো ভঙ্গিতে কাত হয়ে ছিল, সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে বিছানা থেকে নামল রানা। মেয়েটার গায়ে একটা চাদর চাপিয়ে চেয়ারে গিয়ে বসল। একটু পরেই ঘুম এসে গেল চোখে।

আট

কর্নেল পল পেত্রোভিচ সার্বিয়ান এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স-এর একজন কর্মকর্তা। প্রয়োজন হলে সাধারণত মেলানজিক বেলোভিচকে নিজের অফিসে ডেকে নেন তিনি। আজ অবশ্য নিজেই মেলানজিকের আস্তানায় হাজির হলেন। ফোন করে আগেই জানিয়েছেন যে তিনি আসছেন।

কালো মার্সিডিজ বিল্ডিংটার সামনে চলে এসেছে, রাস্তার সিকিউরিটি লক্ষ করলেন কর্নেল—তাঁর নিজের লোকজন তো আছেই, জেনারেল কমান্ডের সদস্যরাও সংখ্যায় কম নয়, সব মিলিয়ে বারোজন। তিনি জানেন, রাস্তার উল্টোদিকের বিল্ডিঙেও হেভী সাবমেশিন গান নিয়ে দু'জন লোক রাস্তার ওপর নজর রাখছে, তিনতলার দুটো কামরা থেকে।

বিল্ডিঙের প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল মার্সিডিজ, গার্ডরুম থেকে দু'জন গার্ড বেরিয়ে এল, দু'জনের হাতেই সাবমেশিন গান, গাড়ির পিছনে উঁকি দিয়ে কর্নেলকে চিনতে পারল তারা, স্যালুট করল, তারপর হাত নেড়ে সামনে এগোতে বলল ড্রাইভারকে। উঠনে আরও লোকজন রয়েছে, সবাই সশস্ত্র।

পরনে ইটালিতে তৈরি বিজনেস স্যুট, ধাপ ক'টা বেয়ে মেলানজিক নিজেই অভ্যর্থনা জানাতে নেমে এলেন। হ্যান্ডশেক করার পর কর্নেলের কাঁধে হাত রাখলেন তিনি, ধাপ বেয়ে দরজার দিকে উঠে যাচ্ছেন।

অফিসে বসেই কাজের কথা পাড়লেন কর্নেল। 'প্যারিসে আমাদের লোক আবার যোগাযোগ করেছে।'

একজন এইডকে ডেকে ব্র্যান্ডি দিতে বললেন মেলানজিক, লোকটা চলে যেতে জানতে চাইলেন, 'নতুন কোন তথ্য?'

'হ্যাঁ, লোকটার নাম জেনেছে সে—যে আমাদের ইনফর্মার হতে চাইছে।'

'কি নাম তার?'

'সাব্বির খান।'

মেলানজিকের স্মরণশক্তি খুবই ভাল। চোখ বন্ধ করে এক মিনিট চিন্তা করলেন তিনি। তারপর মাথা নাড়লেন। 'এই নাম আমি আগে কখনও শুনিনি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কর্নেল। 'শুনিনি আমিও। তবে ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্সে আমাদের

ইনফর্মার আছে, সে লোকটার একটা ফাইল বের করেছে ওখান থেকে। লোকটাকে এক ধরনের মার্সেনারিই বলা যায়, নীতির কোন বালাই নেই, মানে জাত বেঈমান। অন্তর্ঘাত, সন্ত্রাস, এই সব কাজে হাত পাকিয়েছে। তবে জালিয়াতিতেই বেশি দক্ষ। আমেরিকান পাসপোর্ট থাকলেও, ইউরোপেই বেশিরভাগ সময় দেখা যায়। আমাদের লোক এই সাব্বির খানের সঙ্গে দেখা করার একটা ব্যবস্থা করে।'

একটা ট্রেতে ব্র্যান্ডির বোতল আর দুটো গ্লাস নিয়ে ভেতরে ঢুকল এইড। লোকটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন কর্নেল, তারপর বললেন, 'কথা বলার পর মনে হয়েছে খুবই আত্মবিশ্বাসী সে। বলছে, এক লোকের নাম আছে তার কাছে—সাঙ্ঘাতিক বিপজ্জনক লোক; এই লোককে নাকি সাউদিয়া একশো তিন ধ্বংস হবার জন্যে যে দায়ী তাকে খুন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

মেলানজিক হাসলেন। 'কর্নেল, যাই বলুন, প্ল্যানটা কিন্তু দারুণ ছিল!'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলেন কর্নেল। 'আমি বলব নিখুঁত শিল্পকর্ম।'

'আর কি বলছে লোকটা?' গ্লাসে চুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন মেলানজিক।

'বলছে, প্রজেক্টটায় অর্থ যোগান দিচ্ছেন একজন ধনী আমেরিকান, তাঁর স্ত্রী সাউদিয়া একশো তিনে ছিলেন। সেই ধনী আমেরিকান এমন এক লোককে ভাড়া করেছেন, সাব্বির হলফ্ করে বলছে তার মত বিপজ্জনক লোক নাকি দুনিয়ার বুকে আর দ্বিতীয়টি নেই।'

'নামটা জানায়নি?'

'না। তার নাম আর আমেরিকান ভদ্রলোকের পরিচয় জানানোর বিনিময়ে এক লাখ ডলার চাইছে সে।'

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলেন মেলানজিক, তারপর নিঃশব্দে হাসলেন। 'কিন্তু ওই বোমার জন্যে আমাকে কেউ দায়ী করতে পারবে না। কাজটায় আমি কোন খুঁত রাখিনি, কর্নেল।'

'আমারও সেরকম ধারণা ছিল,' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স থেকে জানা যাচ্ছে, এফবিআই-এর ইনভেস্টিগেটররা এরইমধ্যে আপনাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। যদিও, ব্রিটিশ ও মার্কিন প্রশাসন থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে ঘটনার জন্যে জঙ্গী ইসলামী গ্রুপগুলোকে দায়ী দেখাতে পারলে ভাল হয়।'

মেলানজিককে চিন্তিত দেখাল। কর্নেল বললেন, 'আমরা ধরে নিতে পারি আবু নিডাল বা দু'একটা প্যালেস্টাইনী চরমপন্থী গ্রুপকেও সাব্বির খান এই একই প্রস্তাব দিয়েছে। আমার ধারণা সত্যি কিনা দিন কয়েকের মধ্যেই জানতে পারব বলে আশা করছি।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?' জানতে চাইলেন মেলানজিক।

কর্নেল বললেন, 'কাজটার জন্যে পাঁচ মিলিয়ন ডলার পেয়েছেন আপনি। ধরে নিচ্ছি এত তাড়াতাড়ি সব টাকা খরচ করে ফেলেননি।'

'তা করিনি,' বলে হাসলেন মেলানজিক। 'সৌদি রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী দু'জন আরবকে শুধু পঞ্চাশ হাজার করে দিয়েছি। সমস্ত ঝুঁকি তারাই নিয়েছে।'

'কাজেই দুটো বিকল্প আছে আপনার সামনে। হয় সাব্বির খানকে টাকাটা দিয়ে তথ্যগুলো কিনে নিন, তা না হলে ইউরোপে আপনার লোকদের বলুন

ব্যাটাকে ধরুক, গুঁতিয়ে কথা আদায় করুক। এক্ষেত্রে আপনাকে আমি তেমন সাহায্য করতে পারব না। সার্বিয়ার ওপর নানা মহলের চাপ আছে, ঘাপটি মেরে থাকতে হচ্ছে আমাদের। ভাল কথা, প্যারিসে আমার লোকের সঙ্গে চারদিন পর সাব্বির খানের আবার দেখা হবার কথা, আপনি কি উত্তর দেন জানানোর জন্যে।'

'আমি ভাবছি এই একই প্রস্তাব পেলে আবু নিডাল কি করবে,' মেলানজিক বললেন।

মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'আবু নিডাল বা জঙ্গী কোন ইসলামী গ্রুপ টাকা দেবে না। কারণ তারা জানে কাজটার পিছনে আপনি ছিলেন। তাছাড়া, আবু নিডাল মেজাজী ও অহঙ্কারী লোক, এত সহজে তাকে ভয় দেখানো যাবে না।'

'হুম।'

কর্নেলের গলা নরম হলো। 'কিন্তু আপনি, মেলানজিক, আবু নিডাল নন। আপনি তার চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট। আপনার সাফল্যও অনেক বেশি। আর তাই টাকা-পয়সাও ভাল কামিয়েছেন।'

তোষামোদ শুনতে পছন্দ করেন মেলানজিক। তৃপ্তির হাসি ফুটল তাঁর মুখে। 'কর্নেল, আমি খুবই কৃতজ্ঞবোধ করব পরবর্তী সাক্ষাৎকারে আপনার লোক যদি সাব্বির খানের সঙ্গে একটা চুক্তি করে। এখুনি আমি টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। আপনার কাছে আরও ঋণী হয়ে পড়লাম আমি।'

এক বুধবার বিকেল তিনটের দিকে গোজোর বাড়িতে ফোন বেজে উঠল। কিচেনের এক্সটেনশন তুলল পাখি।

'সব খবর ভাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, সব ভাল। আপনি ভাল?'

'ভাল। পবন ঠিকঠাক মত চলছে তো?'

'কি বলব, ওকে দেখলে আপনি চিনতেই পারবেন না!' হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল পাখি। 'রোজ সকালে আমাকে নাস্তা বানিয়ে খাওয়ায়, তিনবেলা খাওয়াদাওয়া শেষে বাসন-পেয়ালা ধোয়। পড়াশোনাও করছে খুব মন দিয়ে। আপনার দিয়ে যাওয়া সবগুলো বই প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছে। রোজ সকালে আগের মতই একশোবার আসা-যাওয়া করছে পুলে, এমনকি ডিসকো থেকে ফিরতে যে রাতে দেরি করে তার পরদিনও বাদ দেয় না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা, তারপর বলল, 'এটাই আমি চেয়েছিলাম, কোন কাজ ফেলে রাখবে না বা ফাঁকি দেবে না। ও এখন কোথায়?'

'মাল্টায়। ছ'টার সময় ফেরি থেকে নামবে, তখন আমি থাকব ওখানে।'

'ও কি রোজই ডিসকোয় যাচ্ছে?' জানতে চাইল রানা। 'নিডোর সঙ্গে?'

'নিডোর সঙ্গে নয়, একা যায়,' বলল পাখি। 'দিন কয়েক আগে নাদুরে গিয়েছিল নিডো, তানিয়ার মা-বাবার সঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া করেছে। বলছিল, আপনি তাড়াতাড়ি ফিরে এলে রাড়িটা শেষ করতে পারত।'

হেসে উঠল রানা। 'তাকে বলবেন আর তিন-চার দিন পর ফিরছি আমি। বলবেন, বীম দরকার নেই, খিলানই হোক। বললেই বুঝবে সে। কেউ ফোন

করেছিল?'

'হ্যাঁ, আরভিং মস, আজ সকালে। আপনাকে যোগাযোগ করতে বলেছেন।'

'ঠিক আছে।' এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর রানা আবার বলল, 'দেখুন কি স্বার্থপর আমি। একবারও জিজ্ঞেস করা হয়নি আপনি কেমন আছেন। খুব কি একঘেয়ে সময় কাটছে?'

'ন্‌না! আমি তো দিব্যি আছি। গত রোববারে নিডোদের বাড়িতে দাওয়াত ছিল আমার আর পবনের। নিডোর আম্মা অনোরিয়া তো প্রায়ই বেড়াতে আসছেন। প্রতিবেশীরাও এখন কথা বলে আমার সঙ্গে। সেদিন শপিং করতে গেছি, দেখি কি সবাই আমাকে চেনে। আমাকে দেখলেই ফিসফিস করে সবাই, উমোর মেহমান, উমোর মেহমান!'

'তাই!'

আরও অনেক কথাই আভাসে-ইঙ্গিতে বলে গোজোর লোকজন, সে-সব মনে পড়ে যাওয়ায় চেহারা লালচে হয়ে উঠল পাখির। সে-সব কথা কাউকে বলার নয়। সে রানাকে বলল, 'আপনাকে ওরা সাঙ্ঘাতিক ভালবাসে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমাকে এত তাড়াতাড়ি মেনে নিতে পারার সেটাই কারণ।'

রানা বলল, 'গোজোর মানুষদের কাছে আমি চিরঋণী হয়ে আছি। ওরা আমাকে ভুল বুঝলে সত্যি সেটা আমার জন্যে খুব দুঃখের বিষয় হবে।'

পাখি বলল, 'একথা কেন বলছেন? আমার তো মনে হচ্ছে ওদের মনে একটা ভুল ধারণা ছিল, সেটা ভেঙে গেছে বা যাচ্ছে।'

'ওটা ভুল ধারণা ছিল না, ছিল রাগ,' জবাব দিল রানা। 'রাগটা কেটে গিয়ে এখনই বরং একটা ভুল ধারণা জন্ম নিচ্ছে ওদের মনে—আমাকে আর আপনাকে ঘিরে।'

রিসিভারটা আরও শক্ত করে ধরল পাখি। কথা বলছে না সে।

'বুঝতে পারছেন কি বলছি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল পাখি।

অপরপ্রান্তে দু'তিনবার হ্যালো হ্যালো বলল রানা, তারপর যোগাযোগ কেটে গেছে বুঝতে পেরে রিসিভারটার দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড।

রাতের ফ্লাইট ধরে লুক্সেমবার্গ থেকে লন্ডনে ফিরে এল রানা, মাঝরাতের খানিক আগে শান্তি নিবাসে পৌঁছুল। পৌঁছেই একটা মেসেজ পেল। ঠিক সাড়ে বারোটায় বার-এ থাকবে আরভিং মস।

ব্যাগ নিয়ে নিজের কামরায় চলে এল রানা, টিভি অন করে কেবল নিউজ নিউ ইয়র্ক চ্যানেল ধরল, আওয়াজ বাড়িয়ে দিয়ে ঢুকল বাথরুমে। শাওয়ার সারতে সারতে খবর শোনা হয়ে গেল। বিশ মিনিট পর বার-এ পৌঁছুল ও।

এক কোণে অল্প বয়েসী এক ছেলে ও এক মেয়ে বসে আছে, পরস্পরের হাত ধরে ভালবাসার কথা বলছে। আরভিং মস তাদের দিকে সন্দেহের চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন, তারপর ওরা ওয়াচার নয় বুঝতে পেরে রানাকে বললেন, 'লার্জ হুইস্কি আর সোডা নেব আমি···গত চব্বিশ ঘণ্টা খুব ধকল গেছে।'

অর্ডার দিল রানা, নিজের জন্যে কফি চাইল। নাইট পোর্টার সরে যেতে বালি রঙের চুলে আঙুল চালিয়ে মস আবার বললেন, 'মিডলটন কেসের খবর ভাল।'

'কি রকম?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনাকে আগেই বলেছি, পুলিস অফিসার ম্যানডেক্স অত্যন্ত যোগ্য ডিটেকটিভ। ফরেনসিক-এর লোকগুলোও ভারি দক্ষ। সাউদিয়া একশো তিন জোড়া লাগাচ্ছে যারা। এখন ওরা জানতে পেরেছে কোন সুটকেসে বোমাটা ছিল আর সুটকেসটাই বা ব্যাগেজ হোল্ডের কোনখানটায় রাখা ছিল। এফবিআই, তাদের এক্সপার্টরাও আছে ওখানে, একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। সুটকেসে কিছু কাপড় পাওয়া গেছে, সেগুলোর কয়েকটা আইডেনটিফাই করতে পেরেছে ওরা। ওগুলোর উৎস পর্যন্ত আবিষ্কার করে ফেলেছেন ম্যানডেক্স—মাল্টা। এমন কি যে দোকান থেকে কেনা হয়েছে, সেটারও ঠিকানা বের করে ফেলেছেন। জায়গাটার নাম সেলিমা, দোকানের নাম মারিয়া'স হাউস। দোকানদার মনে করতে পেরেছে—মিডলটন বম্বিং-এর দিন কয়েক আগে একজন আরবকে ওই কাপড়গুলো বিক্রি করেছে সে।'

'মাল্টা,' বিড়বিড় করল রানা। 'এত থাকতে মাল্টা।'

'হ্যাঁ,' মস বললেন। 'এবং তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ এই জন্যে যে আমরা জানি, বিএনডি জানে, বসনিয়া জেনারেল কমান্ডের একটা সেল আছে ওখানে। মাল্টায় এখন যিনি ক্ষমতায় আছেন, জাতিগত বিরোধে সব সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখার রেকর্ড আছে তাঁর। বসনিয়া সার্ব আর সার্বিয়ার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও খুব ভাল।'

'বসনিয়া জেনারেল কমান্ডের সেলটা কি এখনও ওখানে আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আছে,' বললেন মস। 'ফ্রন্টটা কোথায় তা-ও আমরা জানি।' নিজের ব্রিফকেসে টোকা দিলেন তিনি। 'এখানে এ বিষয়ে একটা রিপোর্ট আছে। পরে পড়বেন, তারপর পুড়িয়ে ফেলবেন। এ-সবের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, জেনারেল কমান্ড বা মেলানজিক বেলোভিচই দায়ী।'

'হ্যাঁ। আর কিছু?'

'আরেকটা ব্যাপার হলো, সার্বিয়ান এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স। আমরা জানি, বসনিয়ার সার্বদের গোপনে সাহায্য করছে ওরা। জার্মান ইন্টেলিজেন্স বিএনডি আর ফ্রেঞ্চ ইন্টেলিজেন্স এসডিইসিই ওদের কয়েকজন এজেন্টকে চেনে, বসনিয়ার বিরুদ্ধে সাবোটাজ করার দায়ে চিহ্নিত করা হয়। সার্বিয়ান এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্স আর জেনারেল কমান্ড একযোগে কাজ করছে, ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করছে সার্বিয়ান দূতাবাসগুলো। আমরা ওগুলোর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখছি। প্যারিসে সার্বিয়ান দূতাবাসের ট্রেড অ্যাটাশে, বরিস সেরাজদিক, প্যারিসেই এক আমেরিকান-বাঙালীর সঙ্গে দু'বার গোপনে মিলিত হন। প্রথমবার দেখা হয় ছ'দিন আগে। শুধুই কথাবার্তা। চারদিন পর দ্বিতীয় বার দেখা হয়—এবার সেরাজদিক আমেরিকান-বাঙালী ভদ্রলোককে একটা প্যাকেট দেন, বিনিময়ে তিনি একটা এনভেলাপ গ্রহণ করেন।'

'আমেরিকান-বাঙালী লোকটা কে, জানেন?'

'জানি,' মস জবাব দিলেন। 'আপনিও জানেন। প্রথম সাক্ষাতের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে, দ্বিতীয়বার পারা যায়নি।' ব্রিফকেস খুলে একটা ফটোগ্রাফ বের করলেন তিনি।

ছবিটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করল রানা, 'সাব্বির খান, তোমাকে আমি "ট্যাপ সিটি মানি" দিয়েছিলাম। আপনি জানেন এখন সে কোথায় আছে?'

'জানি, প্রথম সাক্ষাতের পর থেকে তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে। দুই সাক্ষাতের মাঝখানের সময়টা মন্টপারনাসে-র উল্টোদিকের এক হোটেলে ছিল। দ্বিতীয় সাক্ষাতের পরপরই হোটেল বদলে প্লাজা প্যারাডাইস-এ উঠেছে।'

'উঠবে না, হাতে টাকা আসতে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'এখনও কি তার ওপর নজর রাখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কয়েক ঘন্টার জন্যে সরিয়ে নেয়া যায় ওয়াচারদের? কাল রাতে?'

মাথা নাড়লেন মস। 'গোটা ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করছে আমাদের প্যারিস স্টেশন। আমি নাক গলাতে পারি না। ওয়াচারদের সরিয়ে নিতে বলার পর সাব্বির খানের যদি কিছু হয়, আমি বিপদে পড়ে যাব।'

নিজের ঘরে ফিরে এসে ব্রাসেলসে ফোন করল রানা। অপরপ্রান্তে সাড়া দিল জ্যাকসন। রানা বলল, 'ন্যানিকে দাও।'

'আপনি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'হাত দুটোর জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ। কুত্তাটার এই শাস্তি পাওনা ছিল।'

এক মিনিট পর লাইনে এলেন ন্যানি।

'বেলেন্ডাকে দরকার আমার,' বলল রানা। 'প্যারিসে। কাল।'

'ব্যাপারটা এত সিরিয়াস?' অবাক হয়ে জানতে চাইলেন ন্যানি।

'না। সেরকম সিরিয়াস কিছু নয়। এক লোককে কাছে টানার জন্যে ওকে আমার দরকার। বেলেন্ডার সঙ্গে এমন কাপড়চোপড় থাকতে হবে যাতে মনে হয় খুব অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও, প্যারিসের যে-কোন দামী হোটেল-রেস্তোরাঁয় ওকে যেন মানিয়ে যায়। খানিকটা ঝুঁকি নেয়ার জন্যেও তৈরি থাকতে হবে ওকে।'

'ঠিক কোথায় ওকে যেতে হবে?'

'প্লাজা প্যারাডাইস হোটেলে উঠবে ও—ফলস নেম, ফলস পাসপোর্ট। পাসপোর্ট যোগান দেবে বটলনেক। সকালের প্লেন ধরে চলে আসতে বলবেন। প্যারিস এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে আসবে, অপেক্ষা করবে নিজের কামরায়। যদি কিছু দরকার হয়, রূম সার্ভিসকে অর্ডার দেবে। কাল সন্ধের দিকে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করব আমি। আপনি প্লীজ ওর প্লেনের টিকেট কেটে দিন আর হাতে নগদ তিন হাজার ডলারও দিন। আপনার সঙ্গে পরে আমার হিসাব হবে।'

'ঠিক আছে, পৌছে যাবে ও।'

প্লাজা প্যারাডাইসের বার-এ রাত আটটায় এল সাব্বির। বিলাসিতা পছন্দ করে সে,

সামর্থ্যে কুলালে উপভোগ করে সময়টা। রাতের প্রোগ্রাম তার ঠিক করা আছে। প্রথমে বারে বসে কয়েক পেগ হুইস্কি খাবে, বার থেকে বেরিয়ে ডিনার খেতে যাবে লা পাপুলি-তে, তারপর যাবে ক্রেজি হর্স-এ লেট শো দেখতে। ওখানে যাবে উত্তেজিত হতে, সবশেষে বেটিনা'স-এ পৌঁছে বেছে নেবে ওখানকার সেরা কোন মেয়েকে।

বারে খুব ভিড়, সুন্দরী মেয়েদের যেন মেলা বসেছে। ট্যুরিস্ট আর লোকাল মেয়েরা নিয়মিত আসে এখানে, শুধু যাদের অঢেল টাকা আছে আর বিলাসিতা পছন্দ করে। বার কাউন্টারের এক ধারে বসে থাকা সুন্দরীর ওপর সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল তার। ওই একটাই মেয়ে একা বসে আছে। কে কখন দখল করে নেয়, তাড়াতাড়ি সেদিকে এগোল সে। আকর্ষণীয় হাসি ফুটল মুখে, হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে সপ্রতিভ আভিজাত্য চলে এল। একটা টুল টেনে বসে পড়ল মেয়েটার পাশে।

বারটেন্ডারকে ডেকে পঁচিশ বছরের পুরানো ম্যাকালান স্কচ চাইল সাব্বির। কাপড়চোপড় আর অলঙ্কার দেখেই বুঝে নিয়েছে সে অভিজাত পরিবারের মেয়ে। মিডনাইট ব্লু সিল্ক পরেছে ও। নরম, গায়ে একেবারে সেঁটে আছে। দামী পাথর চেনে সাব্বির। মেয়েটার দুই স্তনের মাঝখানে আধ লুকানো জেড পাথরটা যে খুবই মূল্যবান, তা তাকে বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই। সে জানে বাঁ কব্জির ডায়মন্ড ব্রেসলেটটাও খাঁটি জিনিস, হীরাগুলো নিখুঁত নীলচে-সাদা। কম পক্ষে দশ ক্যারাট। কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার ডলার।

সাব্বির সিদ্ধান্ত নিল, বেশি সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। সরাসরি প্রশ্ন করল সে, 'আপনি কি একা? নাকি কারও জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'আমি আমার স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছি,' ঠাণ্ডা সুরে জবাব দিল মেয়েটা। 'কিন্তু দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আগামীকাল ফিরছে সে।'

বাচনভঙ্গি লক্ষ করে সাব্বির জানতে চাইল, 'আপনি কি ফ্রেঞ্চ?'

'বেলজিয়ান।'

'এই হোটেলেই উঠেছেন?'

'হ্যাঁ, বাধ্য হয়ে। সাধারণত রিজ-এ উঠি আমরা, কিন্তু এবার খালি পেলাম না। মধ্যপ্রাচ্যের শেখ আর আমীররা সব দখল করে নিয়েছেন।'

মেয়েটাকে পটাতে আধ ঘণ্টা লেগে গেল সাব্বিরের। অন্তত তার ধারণা সে-ই পটিয়েছে। মেয়েটা প্রশ্ন করায় জানাল, সে আসলে ইন্টারন্যাশনাল লইয়ার, বর্তমানে আইবিএম-এর একটা অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছে, পেটেন্ট কেসে। তারপর, কথা প্রসঙ্গে বলল, 'সাধারণত ব্যবসার কাজে বাইরে থাকলে একাই ডিনার খাই। আমি পুরানো সেই কথাটায় বিশ্বাস করি, ডিনারে সঠিক লোক সংখ্যা হলো দু'জন—আমি আর ড্যাম গুড হেড ওয়েটার।'

মৃদু হেসে, খানিকটা বিষণ্ন সুরে মেয়েটা বলল, 'একা ডিনার খেতে আমি পছন্দ করি না।'

লা পাপুলিতে একসঙ্গে ডিনার খেলো ওরা। খেতে বসে মাঝে মধ্যেই মেয়েটাকে ছুঁলো সাব্বির, কখনও হাত, কখনও বাহু। দু'একবার তার পা-ও মেয়েটার পা স্পর্শ করল টেবিলের তলায়। কফি আসার সময় হলো, ইতিমধ্যে

সাব্বিরের ধারণা জন্মেছে সে জিততে যাচ্ছে। কথায় কথায় জানা গেল মেয়েটার স্বামী বিরাট এক স্টীল কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট, বয়েসের পার্থক্য পঁচিশ বছর—ভদ্রলোককে বৃদ্ধই বলা যায়।

কফির কাপ খালি হয়ে আসছে, সাব্বির বলল, 'আমার প্ল্যান ছিল ক্রেজি হর্স-এ গিয়ে লেট শো দেখব। ভাবছি তোমার জন্যে যাওয়াটা ঝুঁকি হয়ে যায় কিনা।'

হাসিমুখে মেয়েটা মাথা নাড়ল। 'ওখানে আমি একা কোনদিনই যাব না। তবে ঝুঁকি নিতে ভাল লাগে আমার।'

ক্রেজি হর্সে উত্তেজক শো দেখার পর সাব্বিরের মুড এমন হয়ে উঠল, এখন তাকে যেখানে যেতে বলা হবে সেখানেই যাবে সে। তাকে প্লাজা প্যারাডাইসে, নিজের কামরায় নিয়ে এল মেয়েটা। বলল, ব্যাপারটা নিজের ঘরে ঘটলে বেশি ভাল লাগবে ওর। লবিতে পৌঁছে সাব্বিরের কানে নরম গলায় ফিসফিস করল, ব্যাপারটা শেষ হবার পর বিছানা ছাড়তে পছন্দ করে না ও।

দরজা খুলল মেয়েটা, একপাশে সরে গিয়ে ভেতরে ঢুকতে দিল সাব্বিরকে, খসখসে গলায় বলল, 'তুমি ভাবছ আমাকে আজ রাতে জিতে নিয়েছ। জিত হয়েছে ঠিক, তবে তোমার নয়।'

সাব্বিরের পিছনে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। বড় ডাবল বেড-এর দিকে তাকিয়ে থাকল সে, তাকিয়ে থাকল বিছানায় বসা রানার দিকে। তার দিকে তাক করা ওর হাতের পিস্তলটাও দেখতে পাচ্ছে, সাইলেন্সার লাগানো।

বাতাসে ভেসে এল শব্দগুলো, ভরাট ও ঠাণ্ডা। 'তোমাকে আমি ট্যাপ সিটি মানি দিয়েছিলাম, সাব্বির। তারপরও এই কাজ করলে!'

সাব্বিরের কথা শুনে মনে হলো কেউ যেন তার গলা টিপে ধরেছে। 'কি করলাম, রানা?'

রানা একটা ফটো ছুঁড়ে দিল তার দিকে। হাঁটুতে লেগে মেঝেতে পড়ে গেল সেটা। চোখ নামিয়ে দেখল সে। ফটোয় তাকে আর বরিস সেরাজদিককে দেখা যাচ্ছে, বসে আছে একটা রেস্তোরাঁয়।

সাব্বির বুঝতে পারল আজই তার শেষ দিন।

'কিভাবে, সাব্বির? কষ্ট পেয়ে, নাকি কষ্ট না পেয়ে? হাতে আমার সারারাত সময়।'

কিছু বলতে গিয়ে পারল না সাব্বির। তার দৃষ্টি অস্ত্রটার ওপর স্থির হয়ে আছে।

'তুমি ওদেরকে আমার নাম বলেছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সাব্বির মাথা ঝাঁকাল।

'তুমি ওদেরকে ডেভিড ক্রিস্টোফারের নাম বলেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সাব্বির।

'আবু নিডালের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছ?'

বারবার শুধু মাথা ঝাঁকাচ্ছে সাব্বির।

'উনি কি টাকা দিয়েছেন?'

মাথা নাড়ল সাব্বির।

'তাহলে একা শুধু মেলানজিকের কাছ থেকে টাকা খেয়েছ। টাকা খেয়ে আমার

সম্পর্কে যা জানো সব তাকে বলে দিয়েছ। আমার ধারণা, ওগুলো বাথরুমে আছে।'

আবার মাথা ঝাঁকাল সাব্বির। রানার চোখ আর ওর হাতের পিস্তল তাকে যেন জাদু করেছে।

পপ করে আওয়াজ হলো। দু'চোখের মাঝখান দিয়ে মগজে ঢুকে গেল বুলেট।

দরজা খুলল রানা। করিডরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেলেন্ডা। ইঙ্গিত পেয়ে ঘরে ঢুকল সে, মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটা দেখল। বাইরের হাতলে 'ডু নট ডিসটার্ব' সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। জিজ্ঞেস করল, 'ওর কামরার চাবি কোথায় জানো?'

'ওর পকেটে।'

লাশের পকেট হাতড়ে চাবি বের করল রানা, বেলেন্ডার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'যাও, বাথরুমটা সার্চ করো। সম্ভবত টয়লেট সিস্টেমের পিছনে এক বান্ডিল টাকা পাবে। ওগুলো নিয়ে এসো।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে এল বেলেন্ডা, হাতে মোটা একটা প্যাকেট। লাশটা ইতিমধ্যে সাদা লম্বা এক তোয়ালে দিয়ে ঢাকা হয়েছে, শেষ মাথায় লাল দাগ দেখা যাচ্ছে। টাকাগুলো গুণল রানা। ব্যবহার করা পঞ্চাশ ডলারের নোট, সব মিলিয়ে আটাত্তর হাজার ডলার। বিশ হাজার ডলার আলাদা করে এনভেলাপে ভরল ও, ধরিয়ে দিল বেলেন্ডার হাতে। 'এটা তোমার।'

ওয়াশিংটনের সেই একই রেস্তোরাঁয় ঢুকে রানার সঙ্গে এক ভদ্রলোককে বসে থাকতে দেখলেন সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার। হেঁটে এসে কোণার টেবিলটায় বসে পড়লেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দিল রানা। 'কায়েস চৌধুরী।'

ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে দেখলেন সিনেটর। চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মত বয়েস হবে, মাথা জোড়া মস্ত টাক। খুলিটা ছোট, তবে শরীরটা বিরাট। মুখটা গোলগাল, হাসিখুশি সরল ভাব। গাঢ় রঙের স্যুট পরে আছেন, সাদা শার্টের সঙ্গে গাঢ় নীল টাই।

ডিনারের অর্ডার দিল রানা।

এক রাত আগে সিনেটর রানার ফোন পেয়েছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি খানিকটা বদলে গেছে, তাই আলোচনা হওয়া দরকার। 'কি ঘটেছে, মি. রানা?' সিনেটর জানতে চাইলেন। 'পরিস্থিতি বদলাল কেন?' কায়েস চৌধুরীর দিকে একবার তাকালেন তিনি।

তাঁর দৃষ্টি লক্ষ করে রানা বলল, 'মি. কায়েস আমার এজেন্সির অফিসার, তাঁর সামনে কথা বলতে কোন অসুবিধে নেই। মি. ডেভিড, আমি একটা ভুল করেছি। প্রথমবারই সাব্বির খানের ব্যবস্থা করা উচিত ছিল আমার, তা না করে আমি তাকে ট্যাপ সিটি মানি দিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম টাকা পেলে মুখ খুলবে না। কিন্তু আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আমার আর আপনার নাম মেলানজিক বেলোভিচের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে। নামটা আপনার পরিচিত, তাই না? বসনিয়া

জেনারেল কমান্ডের ডিরেক্টর?' মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর। 'মেলানজিক সাব্বিরকে টাকা দেয়ায় আমি এখন নিশ্চিত, তিনিই প্লেনে বোমাটা তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। সমস্যা হলো, এখন মেলানজিক জানেন যে আমি তাঁকে ধরতে যাচ্ছি। আমার ক্ষমতা ও যোগ্যতা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেয়ে যাবেন তিনি। আমাকে কোথায় পাওয়া যাবে তা তিনি জানবেন না, তবে জানবেন আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে। আপনি, সিনেটর, নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে জেনারেল কমান্ডের একটা সেল আমেরিকাতেও আছে। এতেও কোন সন্দেহ নেই যে ওরা আপনার নাগাল পাবার চেষ্টা করবে। আমার ধারণা, কিডন্যাপ করে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করবে।'

সিনেটরের চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, তবে তিনি কোন মন্তব্য করলেন না।

ইঙ্গিতে কায়েস চৌধুরীকে দেখাল রানা। 'সেটা ঠেকাবার জন্যে মি. কায়েসকে সঙ্গে করে এনেছি আমি।'

কায়েস চৌধুরীর দিকে একবার তাকিয়ে সিনেটর বললেন, 'আমার সিকিউরিটি সিস্টেম যথেষ্ট ভাল। সিনেটরদের রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব।'

মাথা নাড়ল রানা। 'যথেষ্ট ভালয় কাজ হবে না। মি. ডেভিড, ব্যাপারটা যতদিন না মিটে যায়, মি. কায়েস আর তাঁর দুই সহকারীর সঙ্গে বসবাস করতে হবে আপনাকে। শুধু আপনার স্বার্থে নয়, আমার স্বার্থেও। প্রতিটি দিনের চব্বিশটি ঘণ্টা আপনার সঙ্গে থাকবেন ওঁরা, থাকবেন আপনার কয়েক গজের মধ্যে, এমন কি যখন আপনি টয়লেটে বসবেন তখনও।'

এমন সুরে কথা বললেন সিনেটর, যেন কায়েস চৌধুরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন নন। 'কে উনি?'

'রানা এজেন্সির একজন অপারেটর। এক সময় মার্সেনারি ছিলেন।' এরপর কায়েস চৌধুরীর কর্মজীবনের সাফল্য সংক্ষেপে বর্ণনা করল ও।

আরও কয়েকটা প্রশ্ন করার পর সিনেটর বললেন, 'মি. কায়েস, তাঁর দুই সহকারী···বিরাট খরচের ব্যাপার হয়ে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, সেরা লোকদের ভাড়া করলে টাকা বেশি লাগে। তবে সুখবর হলো, টাকাটা আসছে মেলানজিকের কাছ থেকে।'

চেহারায় বিস্ময়, শিরদাঁড়া খাড়া করলেন সিনেটর।

রানা বলল, 'আমাদের নামের বিনিময়ে সাব্বিরকে মোটা টাকা দিয়েছেন মেলানজিক। আংশিক উদ্ধার করেছি আমি। ওই টাকা এই খাতে ব্যয় হবে।'

ডিনারের আগে পানীয় পরিবেশন করা হলো। সিনেটর লক্ষ করলেন, কায়েস চৌধুরী মদ ছুঁলেন না। খেতে বসেও শুধু মিনারেল ওয়াটার পান করলেন। আরও লক্ষ করলেন যে ভদ্রলোক কথা বলেন খুব কম, চোখ দুটো সারাক্ষণ রেস্তোরাঁর চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সাবধানে খেয়াল করছেন কে ঢুকছে বা কে বেরিয়ে যাচ্ছে। কফি খাবার সময় রানাকে বাংলায় কি যেন বললেন কায়েস। রানাও ওই ভাষায় জবাব দিল, তারপর সিনেটরকে বলল, 'মি. ডেভিড, দু'জনেই আমরা লক্ষ করেছি এখানে একজন ওয়াচার আছে। লোকটা একা, ওদিকের এক কোণে। তাকাবেন না, তবে আমার ধারণা লোকটা ফেডারেল এজেন্ট। আপনার বন্ধু লী

আলেকজান্ডার কি আপনার ওপর নজর রাখার ব্যবস্থা করেছেন?'

'অসম্ভব নয়,' বললেন সিনেটর। 'তাঁকে হয়তো প্রশ্ন করা হচ্ছে আমি কি করছি। কিংবা আমাকে নিয়ে হয়তো তিনি উদ্বিগ্ন।'

'ফোনে তাঁকে ডেকে ওয়াচারকে সরিয়ে নিতে বলতে পারেন? ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ।'

'ইট'স ভেরি ইমপরট্যান্ট,' কায়েস বললেন। 'আমি চাই না অতিরিক্ত কোন লোক আশপাশে অযথা ঘুরঘুর করুক।'

একটা আঙুল তুললেন সিনেটর, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওয়েটার একটা পোর্টেবল ফোন এনে দিল তাঁকে। ডায়াল করে তিনি বললেন, 'লী, তোমার লোককে এখুনি ফিরিয়ে নাও, তা না হলে তার কপালে খারাবি আছে।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে যোগাযোগ কেটে দিলেন।

তিন মিনিট পর এক লোক ঢুকল রেস্তোরাঁয়। কোণায় বসে থাকা প্রথম লোকটার সঙ্গে কথা বলল। প্রথম লোকটা একা ডিনার খাচ্ছিল, খাওয়া শেষ না করেই দ্বিতীয় লোকটার সঙ্গে রেস্তোরাঁ ছেড়ে বেরিয়ে গেল, সিনেটরের দিকে একবারও না তাকিয়ে।

'এখন যদি কেউ আপনার ওপর নজর রাখে,' বললেন কায়েস, 'তারা কারা বুঝতে পারব আমি।'

'আপনি নিশ্চিত, মেলানজিকই দায়ী?' রানাকে প্রশ্ন করলেন সিনেটর।

'কোন কারণ ছাড়া এত টাকা কেন তিনি দেবেন? তিনিই আমার টার্গেট।'

'আপনি রওনা হবেন কবে?'

'আমি তো আগেই রওনা হয়ে গেছি।'

'কতদিন লাগবে?'

'আমি ধীরে ধীরে, সাবধানে এগোচ্ছি। সমস্যা হলো মেলানজিক জানেন যে আমি আসছি। বেলগ্রেড শহরের পরিবেশ আমার জন্যে নিরাপদ নয়। দুর্ভেদ্য প্রোটেকশন আছে তাঁর। নিজের লোকজন তো আছেই, সার্বিয়ান ইন্টেলিজেন্সের লোকও সাহায্য করছে।' কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিনেটরের চোখে তাকাল রানা। 'তবে মেলানজিক মরা মানুষ বেঁচে আছেন। আমার শুধু অস্ত্রে শান দেয়ার জন্যে সামান্য একটু সময় দরকার। এই সময়টা তিনি ঘামতে থাকুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, সিনেটর, মেলানজিক মারা যাবার সময় তাঁর কানে শেষ শব্দগুলো ঢুকবে জুডি, ভায়োলা আর বৃষ্টি। তিনি জানবেন কেন তাঁকে মরতে হচ্ছে।'

হুইস্কির গ্লাসটা এক ঢোকে খালি করে ফেললেন সিনেটর। 'আমি জীবনে কখনও কাউকে ঘৃণা করিনি। অপছন্দ করেছি, হ্যাঁ...অনেককে। তবে সত্যিকার অর্থে ঘৃণা করিনি কাউকে। মেলানজিক আর সাব্বির যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আমি ওদের ঘৃণা করব—এই ঘৃণা আমার আত্মা থেকে উঠে আসছে।'

মাথা নাড়ল রানা। 'বলছেন ওরা মারা গেলে আপনি আর ঘৃণা করবেন না? তাহলে সাব্বিরকে বাদ দিন।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকালেন সিনেটর। 'আপনি ওকে ফুটো করেছেন?'

'দু'চোখের মাঝখানে।'

*

বিদায় নেয়ার জন্যে চেয়ার ছাড়লেন সিনেটর। কায়েস বললেন, 'ওয়েট।'

দাঁড়ালেন তিনি, রেস্তোরাঁর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন বাইরে। দু'মিনিট পর ভেতরে ঢুকে টেবিলের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন।

'ভদ্রলোক সাবধানী,' মন্তব্য করলেন সিনেটর।

'উনি আপনার মা-বাপ, মি. ডেভিড,' বলে হাসল রানা। 'আপনার ডোবারম্যানের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দেবেন। আরও একটা কথা, ওঁর সঙ্গে কোন রকম ছল-চাতুরী করবেন না। আপনি যদি ওঁর কাছ থেকে সরে যান, সেটা আমার কাছ থেকে আপনার সরে যাওয়া হবে। একটা কথা মনে রাখবেন। মেলানজিকের হয়তো একশো বডিগার্ড আছে। সবাই সশস্ত্র। তাদের বদলে একা কায়েস চৌধুরী পাহারা দিলে অনেক বেশি নিরাপদ থাকতেন তিনি।'

নয়

এবার মেলানজিকই কর্নেল পেত্রোভিচের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কর্নেল তাঁর হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন। কাগজটায় শুধু দুটো নাম লেখা। তারপর বললেন, 'এক লাখ ডলারের বিনিময়ে এই আপনি পেয়েছেন।'

'এদের সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'দু'জনেরই সাউদিয়া একশো তিনে আত্মীয়স্বজন ছিল,' জবাব দিলেন কর্নেল। 'ডেভিড ক্রিস্টোফার মার্কিন সিনেটর, কলোরাডো রাজ্যের। অত্যন্ত ধনী মানুষ। অপরজন, ইমরুল হাসান, বাংলাদেশী। তাঁর আসল নাম মাসুদ রানা, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির ডিরেক্টর। ধারণা করা হয় রাষ্ট্রীয় ইন্টেলিজেন্স-এ আছেন তিনি, এজেন্সিটা আসলে কাভার। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, ইমরুল হাসান ছদ্মনাম নিয়ে ইটালিয়ান মাফিয়াদের বিরুদ্ধে একটা অপারেশনে বছর কয়েক আগে তাঁর মারা যাবার কথা শোনা গিয়েছিল।'

মেলানজিক বললেন, 'তারমানে বাস্টার্ডটা আমাকে এক মরা লোকের নাম বিক্রি করেছে?'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন কর্নেল, জানালার সামনে গিয়ে নিচের রাস্তার দিকে তাকালেন। 'তা নয়,' বললেন তিনি। 'দু'রাত আগে সাব্বির খানের লাশ পাওয়া গেছে প্যারিসের এক হোটেলে। তার মগজে একটা মাত্র বুলেট ছিল। হতে পারে প্যারিসে আমার লোকের সঙ্গে দেখা করার সময় ধরা পড়ে যায় সে। যাই হোক, ইমরুল হাসান মারা গেলেও, মাসুদ রানা বেঁচে আছেন।' জানালার দিকে পিছন ফিরলেন তিনি। 'তা যদি থাকেন, আপনি সত্যিই একটা সমস্যার মধ্যে পড়েছেন, মেলানজিক—সিরিয়াস প্রবলেম।'

'একটা মাত্র লোক সমস্যা হয় কি করে?'

ডেস্কে ফিরে এসে দেরাজ থেকে ফাইল বের করলেন কর্নেল। ফাইলটা

মেলানজিককে দিলেন তিনি। 'একজন মাত্র লোক, তবে বিশেষ একজন লোক। এই ফাইলে মাসুদ রানা সম্পর্কে কিছু তথ্য আছে, পড়লেই বুঝতে পারবেন। নির্ভুল তথ্য, ইন্টারপোল থেকে পেয়েছি। পড়ে দেখুন।'

জানালার কাছে ফিরে গিয়ে পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলেন তিনি। ফিরে এসে দেখলেন মেলানজিক আবার প্রথম থেকে ফাইলটা পড়ছেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর তিনি বললেন, 'আপনার সিকিউরিটি সিস্টেম অত্যন্ত ভাল, মেলানজিক। আমারও তাই। তবু আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, এই ভদ্রলোক আমার কাছে আসছে শুনলে আমি ভয় পাব। বিশেষ করে তার যে মোটিভ আন্দাজ করতে পারছি, ঘেমে যাব আমি।'

মেলানজিকের চেহারায় অস্বস্তি। 'ওরা কে কোথায় থাকেন বা আছেন,-এ-সব তথ্য?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কর্নেল বললেন, 'সিনেটরের নাগাল পাওয়া কোন সমস্যা নয়। কলোরাডোর ডেনভারে আর ওয়াশিংটনে তাঁর বাড়ি আছে। পালা করে দুটোতেই থাকেন। মাসুদ রানা সম্পর্কে শেষ খবর পাওয়া যায়নি। শেষ খবর কয়েক বছর আগের—নেপলসের একটা হাসপাতালে মারা গেছেন। কোথায় তিনি আছেন বা থাকেন, কেউ তা জানে না, মেলানজিক। তবে আমার ধারণা, দু'রাত আগে প্যারিসে ছিলেন তিনি।'

মাল্টা এয়ারপোর্টে রানাকে অভ্যর্থনা জানাতে এল পিওতর মেনিনো। ফেরিতে ওঠার পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করছে ও?'

'ন্যাচারাল বলব না, বলব তারচেয়েও এক কাঠি সরেস,' জবাব দিল মেনিনো, মাল্টা পুলিসের অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের চীফ। 'চালিকাশক্তি বলে একটা কথা আছে না? নিজেই নিজেকে প্রেরণা সাপ্লাই দেয়। স্পঞ্জের মত, যা বলা হয় সব শুষে নেয়।'

'অস্ত্র?'

'মাত্র তিন হপ্তা হয়েছে, এরইমধ্যে কোল্ট নাইনটিন ইলেভেন দিয়ে বিশ মিটার দূর থেকে তিন ইঞ্চি টার্গেট ভেদ করতে পারে। গতকাল চারটে ম্যাগাজিন ফায়ার করল, সবগুলো টার্গেটে বা কাছাকাছি লেগেছে।' রানার দিকে ফিরে হাসল মেনিনো। 'এটা প্রায় আপনার লেভেল, মি. রানা।'

'অন্যান্য অস্ত্র?'

'সেক্ষেত্রেও ন্যাচারাল বলব না, তারচেয়েও বেশি। সাবমেশিন-গানে খুবই ভাল। এমন ভঙ্গিতে ধরে, যেন মায়ের পেট থেকে শিখে এসেছে।'

'আর স্নাইপার রাইফেল?'

'এই ব্যাপারটায় একটু বেশি অধৈর্য,' বলল মেনিনো। 'আপনি জানেন, একজন স্নাইপারের ধৈর্য থাকতে হবে। সেরা স্নাইপাররা সবাই বুড়ো। পবন একদম বাচ্চা, সঙ্গে সঙ্গে রিঅ্যাক্ট করে। খুব ভাল করবে সে, তবে সময় লাগবে।'

'আনআর্মড কমব্যাট?'

'ইয়াকোহামা বলছেন, স্ট্রীট ফাইটার হতে যাচ্ছে ও। সব কৌশলই শিখে

নেবে, তারপরও স্ট্রীট ফাইটারই হবে। বলছেন, তাঁর ভয় লাগছে।'

'গুড।'

'কথা প্রসঙ্গে বলছি, ওর সাহসও সাঙ্ঘাতিক। গত হপ্তায় স্কোয়াড নিয়ে পরিত্যক্ত একটা খনিতে গিয়েছিলাম। পাথুরে একটা খাড়া খাদে নামা প্র্যাকটিস করছিল ওরা। প্রথম সবাই খুব ভয় পেয়ে যায়। কিনারা থেকে একদম খাড়াভাবে একশো মিটার নেমে গেছে খাদের গা, সরু একটা রশি ধরে নামার সাহস পায়নি কেউ। একটা কথাও না বলে, কারও দিকে একবারও না তাকিয়ে, কিনারা থেকে তরতর করে নেমে গেল পবন। আপনি ওকে পেলেন কোথায়?'

মৃদু হেসে এড়িয়ে গেল রানা। 'পেয়েছি।'

'কি করাবেন ওকে দিয়ে?'

ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল রানা। 'চুপ, দেয়ালেরও কান আছে!'

'ঠিক আছে, জানতে চাইব না। তবে আপনাকে একটা কথা দিতে হবে, মি. রানা।'

'কি কথা?'

'আমাকে না জানিয়ে এখানে অন্তত কিছু আপনারা করবেন না।'

রাজি হলো রানা। 'ঠিক আছে।'

'আরেকটা কথা দিতে হবে।'

'কি?'

'ছেলেটা যদি সারভাইভ করে, ওকে আমাদের পুলিস বাহিনীতে চাইব আমি...আমার স্কোয়াডে যোগ দেবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'মেনিনো, আপনাকে তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। ওকে আমার নিজেরই দরকার হবে। তবে আপনাকেও আমি হতাশ করব না। সারভাইভ করলে আপনার স্কোয়াডে যোগ দেবে পবন, ঠিক আছে, কিন্তু তা শুধু দু'এক বছরের জন্যে। এই সুযোগে ওর ট্রেনিংও কমপ্লিট হয়ে যাবে। কিন্তু তারপর আমি ওকে নিয়ে যাব।'

'আমি রাজি, তবে ঠেকায়-বেঠেকায় ওকে ডাকলে পাব তো?'

'কেন পাবেন না? সেরকম ক্ষেত্রে আমাকে আপনারা পান না?'

হাসল মেনিনো। 'আরেকটা কথা দিতে হবে।'

'আজ কি আমার শুধু কথা দেয়ার পালা?'

'বৃহস্পতিবারে চল্লিশে পড়বে শীলা, আমার স্ত্রী। পবন আর ওর বোন পাখিকে নিয়ে অবশ্যই আসবেন আপনি।'

'কথা দিচ্ছি না, তবে সময় করতে পারলে যাব।'

'আপনার লেডি মেহমানকে অবশ্যই নিয়ে যাবেন, কেমন?'

'দেখি।'

পাখির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হওয়ায় রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে আছে। খামারবাড়িতে কাজ করতে এসে দেখে নিডোর চেহারাও থমথম করছে। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার আবার কি হলো?'

নিডো সরাসরি তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আমি নই কেন?'

'আমি নই কেন মানে?'

হাতের কাজ ফেলে কোমরে হাত দিল নিডো। 'আমি বোকা নই, মাসুদ ভাই। ইটালিতে আপনি কি করেছিলেন, আমি জানি। ভায়োলা আর বৃষ্টি মারা যাবার পর গোজোয় আপনি ঘন ঘন আসছেন। পবন আর তার বোনকে নিয়ে এসে রেখেছেন এখানে। পবনকে ট্রেনিং নিতে পাঠাচ্ছেন। ভেবেছেন ব্যাপারটা কি ঘটতে যাচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না? আপনি প্রতিশোধ...'

'পবন ট্রেনিং নিচ্ছে, কে বলল তোমাকে? পবন?'

মাথা নাড়ল নিডো। 'মেনিনোর ইউনিটে আমার এক বন্ধু আছে, মাসুদ ভাই।'

'তার কাছ থেকে শুনেছ?'

'না। আমার প্রশ্ন শুনে চুপ করে ছিল সে। আমি আন্দাজ করে নিয়েছি। কেন, মাসুদ ভাই? আপনি আমাকে কেন সঙ্গে নিচ্ছেন না? ভায়োলা আমার বোন ছিল, বৃষ্টি আমার বোন-ঝি ছিল।'

'তুমি বোকা নও, নিডো, কথাটা সত্যি,' বলল রানা। 'একটু মাথা ঘামাও, কারণটা নিজেই বুঝতে পারবে।' আর কিছু না বলে কাজে হাত দিল রানা।

পাঁচ মিনিট কাটল। নিডোর চেহারা এখনও থমথম করছে। কাজ থামিয়ে রানা বলল, 'তোমরা ছিলে এক ভাই আর দু'বোন, নিডো। দুই বোনই মারা গেছে, তাদের সঙ্গে তোমার বোন-ঝি বৃষ্টিও। তুমি ছাড়া তোমার বাবা-মার আর কেউ নেই। তুমি আর তোমার হবু স্ত্রী তানিয়া, এই দু'জনকে নিয়েই তো এখন ওঁরা বেঁচে থাকবেন। ঠিক কিনা?'

আরও দশ মিনিট কাটল। কাজ থেকে মুখ তুলে নিডো বলল, 'আমি জানি এই বাড়িটা কেন আমাকে দিয়ে মেরামত করানো হচ্ছে। আমি যাতে বিয়ে করে সংসারী হই...'

'এবং ন'মাস পর তোমার মা-বাবা যাতে নাতির মুখ দেখতে পান।' রানা হাসছে। 'মেয়েটা রাজি তো, নিডো?'

মাথা ঝাঁকাল নিডো। 'শীলার জন্মদিনে আসছে ও। রাজি কিনা আপনিই জিজ্ঞেস করে দেখবেন।'

গম্ভীর হয়ে গেল রানা। 'শীলার জন্মদিনে আমি যাচ্ছি না, নিডো। সেদিন আমি পবনকে নিয়ে আরেক জায়গায় যাব।' মেনিনোর স্ত্রী শীলার জন্মদিনে যাওয়া নিয়েই পাখির সঙ্গে তর্ক হয়েছে ওর। বাড়ির সবাইকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে শুনে খুব খুশি হয়ে উঠেছিল পাখি। রানা বলল, পাখিকে নিয়ে গোজোর কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ওর যাওয়া ঠিক হবে না, লোকের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। পাখি ওর এই কথার ব্যাখ্যা চেয়ে বসে, কিন্তু রানা এড়িয়ে যায়। ও বলেছে, বৃহস্পতিবারে পবনও বাড়িতে থাকবে না, ফলে পাখিকে একাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যেতে হবে।

'পবনকে নিয়ে...কোথায় যাবেন?' জানতে চাইল নিডো।

'দ্বীপের আরেক দিকে।'

'কিন্তু ওদিকে তো কিছু নেই, একদম খালি।'

'ঠিক তাই,' বলল রানা। 'ওকে আমি শেখাব শুধু জমিন আর সাগরে কিভাবে

অস্তিত্ব রক্ষা করতে হয়। শেখাব কোন্ প্ল্যান্ট খাওয়ার যোগ্য, কোন্টা বিষাক্ত। শুধু একটা ছুরি আর ফিশিং লাইন নিয়ে কিভাবে বেঁচে থাকা যায়।'

'কিন্তু ওদিকে গাছপালা তো নেই বললেই চলে! শুধু পাথর আর লাইমস্টোন...'

'গাছপালা বেশি নেই, তবে লতা ও চারা প্রচুর আছে, তুমি লক্ষ করোনি। তাছাড়া, সাগর আছে, আর সাগর মানেই মাছ। ওখানে আরও আছে খরগোশ, ইঁদুর, ছুঁচো, সাপ, ফড়িং।'

বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল নিডোর মুখ। 'সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ, ফড়িং—এ-সব খাবেন আপনারা?'

'যদি প্রয়োজন হয়। এ-সব আমি আগেও খেয়েছি।'

'আপনি...পানির কি হবে? পানি কোথায় পাবেন?' নিডো যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল।

'পানিও পাব।'

হেসে উঠল নিডো। 'বহু বছর ধরে ওখানে পানি পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সরকার। হোটেলটাকে নিজস্ব ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্ট বসাতে হয়েছে। কয়েকদিন থাকলে পিপাসাতেই মারা পড়বেন আপনারা।'

রানা গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একজন কৃষক, নিডো। বলো তো, কোমিনোর ঝোপ-ঝাড়গুলো পানি পায় কোথা থেকে?'

'মাটি থেকে,' জবাব দিল নিডো। 'বৃষ্টির মরশুমে।' আকাশের দিকে তাকাল সে। 'বৃষ্টির দিন অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, মাসুদ ভাই। মাটিতে যে পানি রিজার্ভ ছিল তাও শেষ।'

'আর খরগোশ? ফড়িং, সাপ, ইঁদুর—এরা কোথা থেকে পানি পায়?'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল নিডো, তারপর বলল, 'কোথা থেকে?'

'শুধু জমিনই পানি রিজার্ভ করে রাখে না, ঝোপ-ঝাড়ও রাখে। ওই ঝোপের রিজার্ভ থেকে পানি পায় ওরা। ওরা জানে কোন্ ঝোপ ভালভাবে পানি জমিয়ে রাখে। তাছাড়া, কৌশল জানা থাকলে সাগরের পানিও খাওয়া যায়।'

ঘাড় ফিরিয়ে দূরে, কোমিনোর দিকে তাকাল নিডো। 'মাসুদ ভাই, আমাকেও আপনারা সঙ্গে নেবেন?'

'নিডো,' অন্য প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করল রানা, 'আমাদের কাজটা শুরু হলে তোমাকেও আমাদের দরকার হবে। তখন তুমি আমার বাড়িতে উঠবে, ওটাকে একটা অপারেশনাল বেস হিসেবে ব্যবহার করব আমরা। দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন আসবে। চলো, কোমিনোতে তুমি আমাদের সঙ্গে চলো, সব তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলব।'

'কারা ওরা, মাসুদ ভাই? কারা আমার বোনকে মারল?'

'সব বলব, কোমিনোয় গিয়ে।'

বৃহস্পতিবার রাতে শীলার জন্মদিনে পাখি যখন লোভনীয় স্টেক, লবস্টার আর রোস্ট খাচ্ছে, পবন আর নিডোর সঙ্গে রানা তখন কোমিনোয় সাপ খাচ্ছে। পরিস্থিতি এমন

ছিল না যে সাপ ওদেরকে খেতেই হবে, কারণ বিকেলে সান্তা মারিয়া বে থেকে এক জোড়া ঈল মাছ ধরেছিল ওরা। ঠিক সন্ধের আগে ক্যাম্পসাইটে ফেরার সময় বাঁ দিকে কালো সাপটাকে দেখতে পায় রানা। পবন আর নিডোকে ওটার পিছনে পাঠিয়ে দেয় ও, খেদিয়ে ওর দিকে নিয়ে আসবে। তাড়া খেয়ে লাইমস্টোনের একটা ফাটলে লুকিয়ে পড়ে সাপটা। ওরা শুকনো ডাল আর পাতা কুড়িয়ে আনল, আগুন জ্বালতেই প্রচুর ধোঁয়া পাওয়া গেল। ফাটলের কিনারায় পজিশন নিল রানা, ডালপালা নেড়ে গর্তের ভেতর ধোঁয়া দিল পবন আর নিডো। আধ মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল সাপ, খপ করে ধরে ফেলল রানা ঠিক মাথার পিছনে। তিন ফুট লম্বা সাপটা পেঁচিয়ে ধরল ওর হাত। মাথাটা নিজের মুখের সামনে এনে চোখ দুটোর পিছনে কামড় দিল রানা। বিপুল বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে দেখল ওরা দু'জন। দু'জনেই জানে, সাপটা বিষাক্ত নয়। এই প্রজাতির সাপ শুধু মাল্টিজি দ্বীপগুলোতেই পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে, একবার জাহাজ ডুবির শিকার হয়ে মাল্টায় ভেসে আসেন সেন্ট পল, সে-সময় তাঁকে এই সাপ কামড়ে দেয়। তখন এটা নাকি বিষাক্ত ছিল। কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে, সেন্ট পল মারা যাননি, কারণ সাপের দাঁত থেকে বিষ বের করে তা তিনি মাল্টিজি মহিলাদের জিভে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বলা হয়, সেই থেকেই মাল্টিজি মহিলারা পরনিন্দার চর্চা শুরু করে।

ওদের ক্যাম্পটা কোন রকম একটা আশ্রয়, আকাশের দিকটা খোলা। এখন বর্ষা মরশুম নয়, কাজেই বৃষ্টি থেকে বাঁচার ব্যবস্থা না করলেও চলে, তারপরও বিভিন্ন আবহাওয়ায় কিভাবে শেলটার তৈরি করতে হবে ওদেরকে শিখিয়ে দিল রানা। সেই সঙ্গে শেখাল দেশলাই ছাড়া আগুন জ্বালতে, কিভাবে শরীরের তাপমাত্রা শীত ঠেকানোর কাজে লাগানো যায়, একজন মানুষ কত সামান্য খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে ইত্যাদি।

'কিন্তু যদি প্রচণ্ড শীত পড়ে,' জিজ্ঞেস করল পবন। 'আর যদি সারারাত জ্বলার মত যথেষ্ট কাঠ না থাকে?'

'শীতের দিনে ভেড়া চরাতে গিয়ে ফিরতে দেরি করে ফেললে রাখালরা কি করে জানো? ওদের সঙ্গে শিপ-ডগ থাকে, সেই কুকুরকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমায় সে। ঠাণ্ডা খুব বেশি পড়লে দু'পাশে দুটো কুকুরকে রাখে। তাতেও যদি শীত না মানে, তৃতীয় কুকুরটাকে গায়ের ওপর তুলে নেয়।'

'কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোন কুকুর নেই।'

'তার বদলে আমরা মানুষ আছি।' জমিনের দিকে ইঙ্গিত করল রানা। 'আমরা একটা গর্ত তৈরি করতে পারি। ধরো দু'ফুট গভীর হবে সেটা। কিনারায় গাছের পাতা আর মাটির স্তূপ তৈরি করলাম। ওই গর্তে শুতে পারি আমরা, পাশাপাশি, তারপর আলগা মাটি টেনে ঢেকে ফেলতে পারি নিজেদের। প্রথম দিকে খুব ঠাণ্ডা লাগবে, তবে আধ ঘণ্টা পর আমাদের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা গরম করে তুলবে পরিবেশ।'

সাপের চামড়া ছাড়িয়ে কিভাবে নাড়িভুঁড়ি বের করতে হয় দেখিয়ে দিল রানা। সাপটাকে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল আগুনে। ঝোপের সরু ডাল দিয়ে তিন সেট চপস্টিক তৈরি করল, শেখাল কিভাবে ওগুলো ব্যবহার করতে হবে। 'আগুনে

বেশিক্ষণ পুড়তে দিয়ো না, তাহলে পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়ে যাবে।'

এক মিনিট পর জ্বলন্ত কয়লার ভেতর নিজের চপস্টিক ঢোকাল রানা, সাপের একটা টুকরো বেছে নিল, চপস্টিকে গেঁথে তুলে আনল সেটা, মুখে পুরে তৃপ্তির সঙ্গে চিবাতে শুরু করল। ওরা দু'জন আগুনের দিকে তাকিয়ে আছে, চোখে ঘৃণা।

'কল্পনা করো ঈল খাচ্ছ,' বলল রানা। 'কারণ সাপ আসলেই ঈল। ঈল, তবে বাস করে জমিনে।'

চেহারায় অনিচ্ছার ভাব নিয়ে এরপর পবন আগুনে চপস্টিক ঢোকাল, তার দেখাদেখি নিডোও। কয়েক সেকেন্ড চিবাবার পর বিষম খেলো নিডো, থো থো করে ফেলে দিল সব মুখ থেকে। পবনের কোন বিকার নেই, আপন মনে চিবিয়ে যাচ্ছে। সে বলল, 'আমি কখনও ঈল খাইনি, তবে সত্যি কথা বলতে কি খেতে আমার খারাপ লাগছে না।'

রানা বলল, 'নিডো, তুমি বরং পানির ঈলগুলো কেটে আগুনে ফেলো। তবে মনে রেখো, কাল আমাদের ফার্স্ট কোর্স হবে রোস্ট করা ঘাসফড়িং, তারপর খরগোশ। তাড়া করে কিভাবে ওগুলোকে ধরতে হয় দেখিয়ে দেব তোমাদের।'

ঠিক মাঝরাতের পাঁচ মিনিট আগে বারে ঢুকল বটলনেক-টু। বাপের মতই কোন ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে ব্যবসার কথা পাড়ল সে। 'সমস্ত মেশিনারি যোগাড় করেছি, শুধু উজি বাদে। ওগুলো পৌঁছুবে আগামী হপ্তার প্রথম দিকে।'

'জাগরেব আর মিলানের গর্ত দুটো বাতিল করে দিন,' বলল রানা। 'টার্গেট এরিয়া হবে বেলগ্রেড।'

'আপনি ভাগ্যবান,' জবাব দিল বটলনেক-টু। 'কাল বা পরশু আমি মিলানে যাচ্ছিলাম চুক্তি করতে, মেশিনারিগুলোও রেখে আসার ব্যবস্থা করতাম। সময় ও টাকা, দুটোই বেঁচে গেল।'

'বেলগ্রেড সম্পর্কে বলুন।'

'এক বেডরুমের একটা অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া গেছে, টিটো এভিনিউয়ের একদম কাছাকাছি।'

'গুড। এখন যখন টার্গেট এরিয়া জানা গেছে, কাছাকাছি একটা ব্যাক-আপ হোল চাই আমি। ভেনিস হলে সবচেয়ে ভাল হয়, বন্দর এলাকায়। জাগরেব আর মিলানে যে মেশিনারি পাঠানোর কথা ছিল সেগুলো আপনি ওখানে পাঠিয়ে দিন।'

ক্ষুরের মত ধারাল হাসি ফুটল বটলনেক টু-র ঠোঁটে। 'সুবিধেই হবে। বেলগ্রেডে যে মেশিনারি পাঠাব, সেগুলো ভেনিস হয়েই ওখানে পৌঁছুবে।'

'সময় লাগবে কি রকম?' জানতে চাইল রানা।

'দুই থেকে তিন হপ্তার মধ্যে সব কাজ শেষ করে ফেলব। আমার সঙ্গে ট্রেডিং লাইসেন্স থাকবে, লোক দেখানো কিছু আমদানি-রফতানির কাজও করব। স্টেশনারি ছাপতে হবে। আপনি হবেন কোম্পানীর ভাইস-প্রেসিডেন্ট, আপনার নাম হবে হেনরি মিরাক। আপনার ফ্রেঞ্চ খুব ভাল, ফরাসী নন বলে কেউ সন্দেহ করবে না।'

'নামটা আমার পছন্দ হলো না,' বলল রানা।

আবার সেই ক্ষুরের ধার ফুটল বটলনেক টু-র ঠোঁটে। 'খারাপ কথা। ওই নামে জেনুইন একটা পাসপোর্ট আছে আমার কাছে, নির্ভেজাল ইতিহাস সহ। কাল আপনার ফটো দরকার, পাসপোর্টে বসাবার জন্যে। ইতিহাসটা পরে আপনাকে জানিয়ে দেব।'

'আরও একটা পাসপোর্ট লাগবে,' বলল রানা। 'উনিশ বছরের এক ছেলের জন্যে। তার জাতীয়তা সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সার্বিয়া, আর্কিওলজির ছাত্র, বাস করে বেলগ্রেডে।'

'এটা জাল হবে।'

'জানি,' বলল রানা। 'তবে নিখুঁত হওয়া চাই।'

'অবশ্যই নিখুঁত হবে। তবে খরচ পড়বে। ত্রিশ হাজার।'

রানা উঠে দাঁড়াল। ওরা হ্যান্ডশেক করল না। 'দু'হপ্তার মধ্যে যোগাযোগ করব আমি,' বলল রানা। 'এরমধ্যে কিছু ঘটলে ন্যানির মাধ্যমে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।'

রোববার দুপুর দুটোর খানিক পর পিওতর মেনিনোর ফোন পেল পাখি। কর্কশ গলায় বলল সে, 'অস্থির হবেন না। পবন অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'কি!'

'সেন্ট লুক'স হসপিটালে আছে ও, ইনটেনসিভ কেয়ারে।'

'কি…কি ঘটেছে?'

'আপনি বরং তিনটের ফেরি ধরে এখানে চলে আসুন,' মেনিনো বলল। 'ঘাটে একজন পুলিস অপেক্ষা করবে। সঙ্গে কিছু কাপড়চোপড় আনবেন। হাসপাতালে আমার সঙ্গে শীলাও আছে।'

'কিন্তু ঘটেছে কি?'

'তাড়াতাড়ি চলে আসুন,' বলে যোগাযোগ কেটে দিল মেনিনো।

থরথর করে কাঁপছে পাখি, তাড়াহুড়ো করে কাপড় বদলাচ্ছে, এই সময় ফোন এল আবার। নিডোর মা, অনোরিয়া। 'এইমাত্র শুনলাম আমি। কিন্তু মেনিনো সব কথা খুলে বলল না। তুমি চাও তোমাকে আমি ফেরিতে তুলে দিয়ে আসি?'

'হ্যাঁ, প্লীজ।' কেঁদে ফেলল পাখি। 'ধন্যবাদ।'

চারটের খানিক পর হাসপাতালে পৌঁছুল পাখি। গেটেই অপেক্ষা করছিল মেনিনো। সে তার ড্রাইভারকে দিয়ে পাখির ব্যাগটা নিজেদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল। 'কি ঘটেছে?' জানতে চাইল পাখি।

'সত্যি আমি দুঃখিত, মিস চৌধুরী। পবন এখনও অপারেটিং টেবিলে। সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্ট…ফিফটি-ফিফটি চান্স।'

মেনিনোর পিছু পিছু বিশাল হলে ঢুকল পাখি। 'কি ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে মেনিনো বলল, 'এটা একটা পুলিসী ব্যাপার, মিস চৌধুরী। ব্যাপারটা তাই গোপন রাখতে হবে।'

চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল পাখি, তারপর

বিস্ফোরিত হলো রাগে। 'গোপন রাখতে হবে?' পরিবেশ পরিস্থিতি ভুলে চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'সে আমার ভাই, আর আপনি গোপনীয়তা রক্ষার কথা বলছেন?'

লোকজন ওদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। পাখির একটা কনুই চেপে ধরে একপাশে টেনে আনল মেনিনো। 'চলুন, ওপরে গিয়ে বসি। ওখানে পুলিস বিভাগের একটা অফিস আছে। পবন কেমন আছে আধ ঘণ্টা পর জানতে পারব। চলুন, আপনাকে চা খাওয়াই।'

ঝাপটা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল পাখি। 'ছাড়ুন! কি ঘটেছে না বললে কোথাও আমি যাচ্ছি না!'

'ঠিক আছে, বলছি, কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে এ বিষয়ে কারও সঙ্গে কোন আলাপ করবেন না।' আবার কনুই চেপে ধরল সে।

ওপরের অফিসে এসে পাখির জন্যে প্রথমে এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করল মেনিনো। জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানেন, মি. রানা কবে ফিরবেন?'

'এক হপ্তার আগে নয়।'

'ফোনও করবেন না?'

'আপনি বলবেন কি ঘটেছে, নাকি আমি উকিল ডাকব?'

ঠোঁট টিপে এক মুহূর্ত চিন্তা করল মেনিনো, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'আপনি জানেন আমি কি কাজ করি?'

'পুলিসের চাকরি করেন। সম্ভবত সুপারিনটেনডেন্ট।'

'আমি দ্বীপগুলোর সিকিউরিটি চীফ,' বলল মেনিনো। 'সেই সঙ্গে অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের হেড। ফোর্ট সেন্ট এলমো-তে আমাদের ট্রেনিং ফ্যাসিলিটি আছে। আন্ডারগ্রাউন্ড শূটিং রেঞ্জ, জিমনেশিয়াম ইত্যাদি।' পায়চারি শুরু করল সে। 'পবন অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের সঙ্গে ট্রেনিং নিচ্ছিল—উইপন, আনআর্মড কমব্যাট ইত্যাদি। এ-ধরনের ট্রেনিঙে সব সময় ঝুঁকি থাকে। শেষ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটেছে দু'বছর আগে, তারপর আজ আবার ঘটল।'

'এত কথা না বলে আপনি শুধু...'

'ব্যাপারটা ঘটেছে শূটিং রেঞ্জে,' পায়চারি থামিয়ে বলল মেনিনো। 'দু'জন লোকের সঙ্গে পবন নাইন এমএম পিস্তল প্র্যাকটিস করছিল। একজনের ম্যাগাজিন জাম হয়ে যায়। ব্রীচে তখনও একটা বুলেট ছিল। লোকটা নতুন রিক্রুট, কোন অভিজ্ঞতা নেই। সরে না গিয়ে রেঞ্জে দাঁড়িয়ে জাম ছাড়াবার চেষ্টা করছিল। পবন তাকে সাহায্য করতে যায়। এই সময় গুলিটা বেরিয়ে পবনের বুকে লাগে—হার্টের খুব কাছাকাছি। ঘটনাটা ঘটেছে একটার পরপরই। চল্লিশ মিনিট পর তাকে অপারেটিং টেবিলে আনা হয়।' হাত-ঘড়ি দেখল সে। 'এখনও বেঁচে আছে ও। অপারেশনের বিশ-পঁচিশ মিনিট পর ইনটেনসিভ কেয়ারে আনা হবে ওকে। তারপর ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

দশ

ইনটেনসিভ কেয়ারে পাখিকে থাকতে দিল ওরা। বিছানার পাশে একটা চেয়ারে সারারাত জেগে বসে থাকল সে। পবনের নাকে-মুখে অক্সিজেন মাস্ক, এক জোড়া বোতল থেকে স্বচ্ছ টিউব সাপের মত এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে ওর দুই কব্জিতে। গোটা বেড স্বচ্ছ প্লাস্টিক তাঁবুতে ঢাকা। কামরার এক কোণে বসে বই পড়ছে এক নার্স, মাঝে মধ্যে চোখ তুলে সারি সারি রাখা মনিটর স্ক্রীনগুলোর দিকে তাকাচ্ছে।

সারারাতে ডেস্কের বোতামে তিনবার চাপ দিয়েছে নার্স, ডাক্তাররা এসে পবনকে পরীক্ষা করার সময় চেয়ার ছেড়ে এক কোণে সরে দাঁড়িয়েছে পাখি। সার্জেন এলেন খুব ভোরে। ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলে পবনকে পরীক্ষা করলেন তিনি, তারপর পাখির সামনে এসে দাঁড়ালেন। 'ছেলেটার বয়েস কম, শরীরটাও খুব ফিট। তা না হলে রাতটুকু পার করতে পারত না। এখনও বিপদ কাটেনি, তবে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা টিকে গেলে আর কোন ভয় থাকবে না।'

'ও কি পঙ্গু হয়ে যেতে পারে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল পাখি।

'আরে না। সেরে উঠলে পুরোপুরি সুস্থ থাকবে।'

আধ ঘণ্টা পর শীলা আর মেনিনো এল। ওরা অনেক চেষ্টা করেও চেয়ার থেকে তুলতে পারল না পাখিকে। সে কিছু মুখেও দেবে না, ঘুমাবেও না। কথা খুব কম বলল, তবে বারবার জিজ্ঞেস করল, 'মাসুদ ভাই ফোন করেছিলেন?'

'না,' জবাব দিল মেনিনো। 'আচ্ছা, মি. রানার কোন ফোন নম্বর বা ঠিকানা, কিছুই আপনার কাছে নেই?'

অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে চোখের পানি গোপন করল পাখি। 'না। এমন কি কোথায় গেছেন তার কোন আভাসও আমাকে দিয়ে যাননি।'

পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা টিকে গেল পবন।

সকাল আটটায় ওকে পরীক্ষা করলেন সার্জেন। ইউনিটের দুই তরুণ ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করলেন তিনি, ডাটা শিট পড়লেন, তারপর সন্তুষ্টচিত্তে মাথা ঝাঁকালেন। পাখিকে তিনি বললেন, 'জটিলতা দেখা দিতে পারে না, তা নয়; তবে দেখেশুনে মনে হচ্ছে এ-যাত্রা বেঁচে গেল আপনার ভাই।'

কথা বলতে পারছে না পাখি, একদৃষ্টে পবনের দিকে তাকিয়ে থাকল।

'শুনলাম আপনি নাকি কিছু খাচ্ছেন না, ঘুমাচ্ছেন না—খুব খারাপ!'

'ওর জ্ঞান ফিরবে কখন?' জিজ্ঞেস করল পাখি, যেন সার্জেনের কথা শুনতে পায়নি।

'আজ সন্ধ্যায় বা রাতে। ওকে রিকভারি রুমে নিয়ে যাবার পর ঘুমের ওষুধ দেয়া বন্ধ করব।'

'জ্ঞান ফেরার সময় আমি ওর কাছে থাকতে চাই।'

সার্জেন হাসলেন। 'জানি, চেষ্টা করলেও ওখান থেকে আপনাকে ভাগানো যাবে না।'

•

পরদিন ভোর তিনটের সময় চোখ খুলল পবন। সিলিঙের দিক একবার তাকাল সে, তারপর আধ মিনিট চোখ বন্ধ করে থাকল। আবার খোলার পর সিলিঙটা দেখতে পেল না, ঝুলতে দেখল পাখির মুখ। পাখিকে উদভ্রান্ত আর ব্যাকুল বলে মনে হলো। অনুভব করল ওর একটা হাত ধরে আছে পাখি। তারপর বোনের গলাও শুনতে পেল।

'পবন, আমি রে, পাখি···শুনতে পাচ্ছিস আমার কথা?'

পবন বেসুরো গলায় বলল, 'পাচ্ছি, আপা···।' পাখি অনুভব করল ওর হাতে মৃদু চাপ দিল পবন।

এক মুহূর্ত পর পবন পানির স্পর্শ পেল, তার মুখে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে।

•

আগের রাতে ফোন করেছিল রানা।

এয়ারপোর্টে ওকে নিতে এল মেনিনো। হাসপাতালে যাবার পথে সব শুনল রানা। শোনার সময় কোন কথা বলল না। হাসপাতালের ভেতর ঢোকার সময় একটা মাত্র প্রশ্ন করল, 'পুরোপুরি সুস্থ হতে কতদিন লাগবে ওর?'

'ডাক্তাররা বলছেন অন্তত দু'হপ্তা হাসপাতালে থাকতে হবে। তারপর বাড়িতে ফিরে আরও কয়েক হপ্তা সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হবে।'

রানা গম্ভীর হয়ে গেল।

হলে ঢুকে রানার একটা হাত ধরে মেনিনো বলল, 'আমি দুঃখিত।'

'আপনার কি দোষ,' বলল রানা। 'আপনি তো আর একই সময় সব জায়গায় থাকতে পারেন না। ব্যাপারটা নিয়ে আপনাকে কি সমস্যায় পড়তে হবে?'

'না, আমরা চেপে গেছি, প্রেসকে কিছুই জানতে দেয়া হয়নি। কমিশনার মিনিস্টারকে জানিয়েছেন যে সেন্ট এলমোয় পবনকে রাখার ব্যাপারে আমি তাঁর অনুমতি নিয়েছিলাম··· আমার স্বার্থে ছোট্ট একটা মিথ্যে।'

'কমিশনার আপনাকে খারাপ কিছু বলেছেন?'

'সামান্য,' হাসল মেনিনো। 'তবে আমি তাঁকে বলেছি পবন এক সময় আমার স্কোয়াডের সেরা সদস্য হবে।'

'ধন্যবাদ।'

•

দু'হপ্তা পর হাসপাতাল থেকে পবনকে নিতে এল রানা।

গত দশ দিন চারতলার জেনারেল ওয়ার্ডে রয়েছে পবন, সেটা কোথায় লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হলো। এই দু'হপ্তা পবনকে একবারও দেখতে আসেনি ও। ওয়ার্ডে ঢুকে দেখল, পবন একটা হুইলচেয়ারে বসে আছে, তার পরনে জিনস আর টি-শার্ট, পায়ের কাছে ছোট একটা প্লাস্টিক ব্যাগ। 'সব ঠিক আছে তো?'

হাসল পবন। 'হ্যাঁ, এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। হাসপাতালের খাবার!

তারচেয়ে রোজ আমি কালো সাপ খাব।'

হাসির জবাব দিল না রানা, বলল, 'চলো তাহলে।'

হুইলচেয়ারটা বেডের পাশেই, হাত বাড়িয়ে তার নিচে একটা বোতামে চাপ দিতে গেল পবন, বলল, 'আপনি এলে ওরা একজন পোর্টারকে ডেকে নিতে বলেছে।'

'তুমি হাঁটতে পারো না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, তবে···।'

'তবে কি?'

'তবে ওঁরা বলেছে যে নিচে নেমে গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত আমি যেন একজন পোর্টারের সাহায্য নিই।'

তার দিকে ঝুঁকল রানা, কঠিন সুরে বলল, 'শোনো। এখানে তোমাকে স্ট্রেচারে করে আনা হয়, কারণ লোড করা একটা পিস্তলের সামনে দাঁড়াবার মত বোকামি করেছিলে তুমি। এখন যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, নিজের পায়ে হেঁটে বেরুতে হবে তোমাকে। তা না হলে যতদিন না হাঁটতে পারো থেকে যাও এখানে।'

বোতামের দিক থেকে হাতটা টেনে নিল পবন। হুইলচেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে দাঁড়াল সে, ব্যাগটা তুলে নিল, বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। তার পিছু নিল রানা।

গাড়িতে বসে অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর এক সময় পবন বলল, 'আপনি আমার ওপর রেগে আছেন।'

'না।'

'আছেন। ব্যাপারটা ফেয়ার নয়।'

সোজা রাস্তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। 'তোমাকে তো ওখানে বললামই। লোড করা পিস্তলের সামনে দাঁড়ানোটা বোকামি।'

সেন্ট পল'স বে-কে পাশ কাটিয়ে এল ওরা। নিস্তব্ধতা ভাঙল পবন, 'তাহলে বেশ কয়েকবার আপনিও বোকামি করেছেন।'

আবার নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধল। এবারও সেটা পবন ভাঙল। তার গলায় তিক্ততা, অভিমান নয়। 'আপনি আমাকে দেখতে আসেননি। একবারও না। আপনি এমনকি আপাকেও আসতে দেননি। আপা আমার জন্যে প্রতিদিন খাবার আনতে চেয়েছিল। শীলা আন্টিকেও আপনি আসতে মানা করে দেন। উনি বলেছিলেন আমার জন্যে স্টু আনবেন, কিন্তু আসেননি। বোঝাই যায়, আপনি মানা করেছেন···কেন?'

রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। স্টার্ট বন্ধ করে হাত দুটো স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাখল। কথা না বলে ওই ভঙ্গিতে বসে থাকল ও।

অবশেষে পবন আবার বলল, 'হাসপাতালের খাবার মুখে তোলা যায় না।'

'কিন্তু তুমি বেঁচে আছ।'

'হ্যাঁ, তবে আমি অসুস্থ ছিলাম। প্রায় তো মরেই গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে এই আচরণ করার কি দরকার ছিল?'

৬

'কি দরকার ছিল কোমিনোয় গিয়ে সাপ-ব্যাঙ খেয়ে বাঁচতে শেখার, এক মাইল হেঁটে গেলেই যেখানে সুইস রেস্তোরাঁয় ভাল ভাল খাবার পাওয়া যায়?'

চেহারা দেখে বোঝা গেল বিস্মিত হয়েছে পবন। 'কিন্তু আমি অসুস্থ ছিলাম। ডাক্তাররা বলেছেন, আমি যে বেঁচে আছি এটা একটা মিরাকল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'মিরাকল বলে কিছু নেই। আর, তুমি যখন অসুস্থ, তুমি যখন তীব্র সঙ্কটে পড়েছ, সারভাইভ করতে শেখার সেটাই আদর্শ সময়।'

কথাগুলো হজম করতে সময় নিল পবন, তারপর সে বলল, 'তারমানে ব্যাপারটা ছিল আরও একটা লেসন···আপনি বোধহয় এরপর বলবেন মানুষের গোটা জীবনই একটা লেসন।'

'না, তবে তোমাকে আমার বলার কথা হলো, মৃত্যুই হলো ফাইনাল লেসন।' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা।

'আপনার বয়েস এত বেশি কেন?'

স্টেকে কামড় দিলেন কায়েস চৌধুরী। 'বেশি?'

'মানে এই পেশার জন্যে আপনার বয়েস অনেক বেশি মনে হচ্ছে,' বললেন সিনেটর। ফর্কটা কায়েসের দিকে তাক করলেন তিনি। 'কত বয়েস আপনার?'

'পঁয়তাল্লিশ।'

'শেখ রাশেদ আর আবীর মাহমুদের?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কায়েস। 'সম্ভবত আমার মতই। কেন?'

হেসে উঠে পরিবেশটাকে হালকা করলেন সিনেটর। 'না, আমার ধারণা কম বয়েসীদের কাজ এটা। আমি সিক্রেট সার্ভিস বডিগার্ড যাদের চিনি, কারও বয়েস পঁচিশ-ত্রিশের বেশি নয়।'

কায়েসের হাসিটা বিদ্রূপাত্মক। 'হ্যাঁ,' বললেন তিনি। 'এবং কোন সন্দেহ নেই সবাই তারা কারাতে ফাইটে ব্ল্যাক বেল্ট, দশ সেকেন্ডে একশো মিটার ছুটতে পারে, পঞ্চাশ কদম দূরের একটা পোকার চোখে গুলি মারতে পারে।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর। 'হ্যাঁ, অনেকটা সেরকমই।'

মুখের খাবার সময় নিয়ে গলায় নামালেন কায়েস, তৃপ্তির সঙ্গে একটা ঢেকুর তুলে বললেন, 'সরি। অথচ ওই অল্পবয়েসী বডিগার্ডরাই একজন পিস্তলধারীকে প্রেসিডেন্ট রিগ্যানের কয়েক ফুটের মধ্যে চলে আসতে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, লোকটা কয়েকটা গুলি করারও সুযোগ পায়। প্রেসিডেন্ট শুধু ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছেন।'

কৌতূহলী হলেন সিনেটর। 'আপনার সঙ্গে আমি একমত। তাহলে বলুন, আপনাদের বৈশিষ্ট্য কি?'

কায়েস জিজ্ঞেস করলেন, 'সিনেটর, কতদিন হলো আপনি কংগ্রেসে আছেন?'

'তিন টার্ম···আঠারো বছর।'

'প্রথম টার্মের সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে আপনি কি দ্বিতীয় টার্মের মত দক্ষ ছিলেন?'

হাসলেন সিনেটর, মাথা নেড়ে বললেন, 'না। একজন সিনেটরকে অভিজ্ঞতার

ভেতর দিয়ে শিখতে হয়।'

'ঠিক তাই,' বলে রানা এজেন্সির অপারেটর স্টেকে শেষ কামড়টা দিলেন।

যেন জাদু বলে হাজির হলো আলবিনো, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে টেবিল পরিষ্কার করে ফিরে গেল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সিনেটর বললেন,'তবে কোন কোন পেশায় বিশেষ দক্ষতা লাগে। আমার ধারণা, আপনাদের কাজে দক্ষতাই সব।'

মাথা নাড়লেন কায়েস। 'ঠিক তা নয়, সিনেটর। বডিগার্ড হওয়া মানে বিরতিহীন কমব্যাটের মধ্যে থাকা, বিশেষ করে টার্গেট যখন সারাক্ষণ হুমকির মধ্যে রয়েছে। যে-কোন জেনারেল জানেন, একজন সৈনিক যত বছর ধরে যত ভাল ট্রেনিংই পাক, প্রথমবার তার দিকে গুলি ছুটে এলে দিশেহারা হয়ে পড়ে সে। গোলাগুলির মধ্যে পড়লেই প্রথম উপলব্ধি করে, কি করছে সে। অনেক কারণের মধ্যে এই একটা কারণেও আপনারা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে হেরে গেছেন। একদল নবিসকে পাঠানো হয়, অল্প দিন পরেই তাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আরেক দল নবিসকে পাঠানো হয়।'

'বলতে চাইছেন, আপনারা নবিস নন?' কৌতুক করলেন সিনেটর।

'শুনতে চাইলে আমাদের সাফল্যের ফিরিস্তি দিতে পারি আমি,' বললেন কায়েস।

'মি. রানা আমাকে খানিক আভাস দিয়েছেন, বিশদ জানার দরকার নেই।'

'বয়েসের কথা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নিজের চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন?'

'না, মি. কায়েস, মোটেও উদ্বিগ্ন নই,' আশ্বস্ত করলেন সিনেটর।

'হওয়া উচিত।'

ঝট করে মুখ তুললেন সিনেটর।

কায়েস বললেন, 'বিশদ আমি জানি না, তবে মি. রানা আমাকে বলেছেন, মেলানজিক বেলোভিচ হয় নিজে আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইবেন, কিংবা কথা বলাবার জন্যে আর কাউকে পাঠাবেন। যেদিক থেকেই দেখা হোক, ব্যাপারটা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। মেলানজিককে আমি চিনি। তিনি ভয়ঙ্কর মানুষ, তাঁর টাকাও আছে। এত টাকা, এ-দেশে লোক ভাড়া করা তাঁর জন্যে কোন সমস্যা নয়। আপনাকে কিডন্যাপ করা হতে পারে। কাজেই আপনার উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত।'

'এমনকি আপনারা তিনজন আমাকে এভাবে পাহারা দেয়া সত্ত্বেও?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন কায়েস। 'আপনার নিজেকেই সারাক্ষণ সতর্ক থাকতে হবে। ইউ আর আ হাইলি ইন্টেলিজেন্ট ম্যান, সিনেটর। বেমানান কিছু দেখলে বা শুনলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন আমাকে—কিংবা রাশেদ বা মাহমুদকে। কিছু একটা ঘটবে না জানলে মি. রানা আমাদেরকে এই কাজে পাঠাতেন না। মাত্র একটা ব্যাপার আমাদের অনুকূলে—মেলানজিক আপনাকে কথা বলাতে চান, খুন করতে চান না। যদি খুন করতে চাইতেন, আপনাকে রক্ষা করা দশগুণ কঠিন হত।'

দরজার দিকে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালেন কায়েস। দরজার সামনে গিয়ে কবাটটা সামান্য ফাঁক করলেন প্রথমে, তারপর পুরোপুরি খুলে দিলেন। ভেতরে ঢুকে সিনেটরের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ।

'হাই, মি. রাশেদ, কফি চলবে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'নো থ্যাঙ্কস, সিনেটর। এইমাত্র কিচেনে বসে এক কাপ খেলাম।' কায়েসের দিকে তাকালেন তিনি। 'কায়েস, গত দু'ঘণ্টায় নীল একটা পন্টিয়াক সামনের রাস্তা দিয়ে দু'বার গেল। ভেতরে দু'জন লোক।'

'প্লেট চেক করেছ?' জিজ্ঞেস করলেন কায়েস।

'হ্যাঁ, মি. লী আলেকজান্ডারের অফিসকে দিয়ে। আজ সকালে ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে ভাড়া করা হয়েছে ওটা দু'দিনের জন্যে, লস এঞ্জেলসের একটা কোম্পানীর নামে, নগদ টাকায়। কোম্পানীটা রেজিস্টার করা নয়।'

'এটা প্রথম রেকি হতে পারে,' বিড়বিড় করলেন কায়েস, চিন্তা করছেন। সিনেটরের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কাল আপনি কখন ওয়াশিংটন যাবেন?'

'সন্ধের দিকে।'

'জানা কথা আপনার অনেক টাকা আছে, কিন্তু কত টাকা আছে একটা ধারণা দিতে পারেন, প্লীজ?'

বিস্মিত হলেও উত্তর দিতে দ্বিধা করলেন না ডেভিড ক্রিস্টোফার। 'এই একশো বিশ মিলিয়ন।'

কায়েসের চেহারায় কোন ভাব ফুটল না। 'সেক্ষেত্রে, সিনেটর, আমরা যখন ডেনভার থেকে ওয়াশিংটন বা অন্য কোথাও যাব, প্রাইভেট জেট নিয়ে যাব আমরা—প্রতিবার আলাদা চার্টার কোম্পানী, অল্প সময়ের নোটিশে ভাড়া করা হবে।'

চেয়ার ছাড়লেন সিনেটর। 'ব্যবস্থা করছি,' বললেন তিনি।

'তবে আপনার অফিসের মাধ্যমে নয়, এখানের হোক বা ওয়াশিংটনের,' বললেন কায়েস। 'দু'জায়গাতেই তো আপনার অনেক ব্যবসায়ী বন্ধু আছে, তাই না? ওদেরকে দিয়ে চার্টার করান। বলে দেবেন, আপনার নাম উল্লেখ করার দরকার নেই। আমি এখন শুতে যাচ্ছি, গুডনাইট, সিনেটর।'

'গুডনাইট, মি. চৌধুরী।'

কর্নেল পেত্রোভিচের মাধ্যমে সঙ্কেতটা পেলেন মেলানজিক। সঙ্কেতের উৎস ওয়াশিংটন ডিসি-তে এক সার্বিয়ান ব্যবসায়ীর অফিস। সঙ্কেতে বলা হয়েছে সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফারকে এক থেকে দেড় হপ্তার মধ্যে অপহরণ করার আয়োজন করা হবে। সঙ্কেতে আরও বলা হয়েছে, টার্গেটের গুরুত্বের কারণে কাজটার মূল্য ধরা হয়েছে পাঁচ লাখ ডলার। দু'হপ্তা রেকি করার জন্যে তিনি যে পঁচাত্তর হাজার ডলার দিয়েছেন, সেটা বাদেই।

মনে মনে গাল দিয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন মেলানজিক। পাঁচদিনের মধ্যে তাঁর ইন্টারোগেটরকে ডেনভারে পাঠাতে হবে। ওখানে একটা সেফ হাউসের ব্যবস্থাও করতে হবে। তিনি যদি চান ইন্টারোগেশনের পর সিনেটরকে মেরে

ফেলতে হবে, তাহলে আরও এক লাখ ডলার বেশি দিতে হবে। আর যদি চান শুধু বন্দী করে রাখবেন, তাহলে চার্জ ধরা হবে প্রতি হপ্তার জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার। জবাব দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

চীফ অভ স্টাফ পিটার মেলভিককে ডেকে পাঠালেন মেলানজিক। দু'জন মিলে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলেন। অবশেষে একমত হলেন তাঁরা, ইন্টারোগেশনের ফলাফল দেখার পর সিদ্ধান্ত নেয়া হবে সিনেটরকে বাঁচিয়ে রাখা যায় কিনা। 'খরচ খুব বেশি পড়ে যাচ্ছে,' বলল মেলভিক। 'হয়তো আমাদের নিজেদের লোকজনকে পাঠালেই ভাল হত।'

'আমেরিকায় ভাল লোক শুধু একজন আছে আমাদের,' মাথা নেড়ে বললেন মেলানজিক। 'আরও লোক পাঠাতে কয়েক মাস লেগে যাবে। ইউরোপ সেল গঠন করতে এক বছরের বেশি লেগে গেছে আমাদের।' মেসেজের গায়ে টোকা দিলেন তিনি। 'সন্দেহ নেই, এই লোকগুলো আমেরিকার সেরা।'

'ওরা স্রেফ ক্রিমিনাল,' বলল মেলভিক। 'শুধু টাকা চেনে।'

'তা সত্যি,' বললেন মেলানজিক। 'তবে ওরা খুব সফল ক্রিমিনাল, ওদের পিছনে ভাল একটা অর্গানাইজেশন আছে। টাকা যায় যাক, আমাদের দরকার কাজ।'

দু'দিন পর সিনেটরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন লী আলেকজান্ডার। দরজা খুলে দিলেন আবীর মাহমুদ। সেটা আবার বন্ধ করে পাশের চেয়ারটায় বসলেন। ডেস্ক থেকে মুখ তুলে সিনেটর বললেন, 'কি নিয়ে এত আতঙ্ক?' হাতঘড়ির দিকে তাকালেন একবার। 'তাড়াতাড়ি সারতে হবে, লী। দশ মিনিটের মধ্যে একটা মীটিঙে থাকতে হবে আমাকে।'

'তাড়াতাড়িই সারব,' বললেন এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর। 'সার্বিয়ার ফরেন মিনিস্ট্রি থেকে তাদের বিভিন্ন দূতাবাস ও সওদাগরি অফিসে পাঠানো বেশ কিছু সঙ্কেতের কোড ভাঙতে পেরেছে সিআইএ। তুমি হয়তো জানো, কয়েকটা টেরোরিস্ট গ্রুপকে সাহায্য করছে সার্বিয়া। তার মধ্যে প্রধান গ্রুপটা হলো বসনিয়া জেনারেল কমান্ড। সার্বিয়া নিয়মিত ওদেরকে সাহায্য করছে নিজেদের ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে। জেনারেল কমান্ডের হেড অফিস বেলগ্রেডে। ওদের সঙ্গে সার্বিয়া সরকারের কনট্যাক্ট বা লিয়াজোঁ হলেন একজন কর্নেল, তার নাম পল পেত্রোভিচ, সার্বিয়ান এয়ারফোর্স ইন্টেলিজেন্সে আছেন, কোডনেম ঈগল। কর্নেল পেত্রোভিচ সার্বিয়ার প্রেসিডেন্টের খুব কাছের মানুষ। তাঁর পাঠানো ও তাঁর কাছে পাঠানো সঙ্কেতগুলো আইডেনটিফাই করতে পেরেছে সিআইএ।

'হঠাৎ করে গত হপ্তায় ওয়াশিংটন ডিসি-র এক সার্বিয়ান সওদাগরি অফিসে ঈগলের কয়েকটা সঙ্কেত এসে পৌঁছায়। ওগুলোর কোড ভাঙার চেষ্টা করছে সিআইএ। আমরা অফিসটার ওপর কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা করি। চারদিন আগে ওই অফিসের এক কর্মকর্তা এক লোকের সঙ্গে দেখা করল, নির্জন পার্কে। আমরা ছবি তুলি। কম্পিউটরকে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছে। জানা গেছে, লোকটা ছিল ডিনো ফসেলা, শিকাগোর। সে আর তার দুই ভাই পারিবারিক ব্যবসাটা চালায়।

ওদের পারিবারিক ব্যবসা হলো চুক্তিতে মানুষ খুন করা।'

'আজ সকালে সিআইএ ঈগলের পাঠানো আরেকটা সঙ্কেতের কোড ভেঙেছে। সেটার সারমর্ম হলো, এ-দেশের গুরুত্বপূর্ণ এক ব্যক্তিকে অপহরণ বা খুন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ফসেলা পরিবারকে।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং,' মন্তব্য করলেন সিনেটর।

চুরুট ধরিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকলেন লী আলেকজান্ডার। 'এবং আমার ধারণা সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটি হলে তুমি।'

'কেন?'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'সাউদিয়া একশো তিনে জুডি মারা গেছেন। সন্দেহের তালিকায় প্রথম নামটাই জেনারেল কমান্ডের মেল্যানজিক, তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে সার্বিয়া এয়ারফোর্স ও ঈগলের। ইতিমধ্যে অদ্ভুত সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করেছ তুমি। তাদের মধ্যে একজন বছর কয়েক আগে মারা গেছে বলে মিথ্যে রটনা করা হয়। তারপর তিনজন বডিগার্ড রেখেছ তুমি। স্বভাবতই তাদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। এটা আমার দায়িত্ব, ডেভিড। শুধু পেশাগত দায়িত্ব নয়, তুমি আমার বন্ধু।'

'বলে যাও।'

'ফসেলা পরিবার সাধারণ "মব" পরিবার নয়, ডেভিড। আকারে তত বড় না হলেও, অত্যন্ত যোগ্য বারোজন "সৈনিক" আছে তাদের। ওরা কি করে আমরা জানি, কিন্তু ধরার সুযোগ একবারও পাইনি। সাব্বির খানকেও ভাড়া করো তুমি, তারপর সে মারা গেল। কে দায়ী, ফ্রেঞ্চ পুলিস বলতে পারছে না। না-না, তোমাকে আমি অভিযুক্ত করছি না। তবে এ প্রায় দিবালোকের মত স্পষ্ট যে প্রতিপক্ষ ভয় পেয়েছে এবং সতর্ক হয়ে গেছে, ফসেলা পরিবারের সাহায্য নেয়ার সেটাই কারণ। আমি বলতে চাইছি, তুমি খুব বিপদের মধ্যে আছ, ডেভিড।'

সিনেটর নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছেন, কথা বলছেন না।

'তিনজন বডিগার্ড যথেষ্ট নয়, ডেভিড। তাছাড়া, ওদের বয়েসও এসব কাজের তুলনায় একটু বেশি...'

'ওদের ওপর আমার পুরোপুরি আস্থা আছে, লী।'

'আমার নেই।' আবার সামনের দিকে ঝুঁকলেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'এখানে আসার পথে ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলে এসেছি আমি। তিনি বলেছেন, পুরো একটা টীম তোমাকে পাহারা দেবে। তারমানে বারোজন হাইলি ট্রেইন্ড লোক, টগবগে তরুণ সবাই।'

মাথা নাড়লেন সিনেটর। 'দায়িত্ববোধের প্রশংসা করি, কিন্তু না। ডিরেক্টরকে বলো, আমি রাজি নই।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন লী আলেকজান্ডার। 'দুঃখিত, আমার কিছু করার নেই। টীমটা রওনা হয়ে গেছে, ডেভিড।'

হাত বাড়িয়ে ফোন কনসোল-এর একটা বোতামে চাপ দিলেন সিনেটর। 'গ্লেনডা, হোয়াইট হাউসের লাইন দাও। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলব, যদি তাঁকে পাওয়া যায়। তা না হলে তাঁর পার্সোন্যাল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলব।'

এক মিনিট পর তাঁর কথা শুনে বোঝা গেল প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, আজ সন্ধ্যার সময়। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডেপুটি ডিরেক্টর। 'তোমার ধারণা, উনি নাক গলাবেন?'

'আমাকে তাঁর দরকার,' মৃদু হেসে বললেন সিনেটর।

হতাশ লী আলেকজান্ডার বিদায় হতেই অফিসরুমে ঢুকলেন শেখ রাশেদ। ভেতরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করলেন তিনি, পুরোটা কামরায় দু'বার চোখ বুলালেন, তারপর স্থির দৃষ্টিতে সিনেটরের দিকে তাকালেন।

'মি. চৌধুরী কোথায়?'

'কাছাকাছি আছেন।'

'এখুনি একবার ডাকা যায়?'

পকেট থেকে কালো একটা ছোট বাক্স বের করলেন রাশেদ, দু'বার চাপ দিলেন বোতামে। পাঁচ সেকেণ্ড পর পিপ-পিপ করে উঠল সেটা। 'দু'মিনিটের মধ্যে আসছেন।'

এক মিনিট দশ সেকেন্ডের মাথায় পৌঁছুলেন কায়েস চৌধুরী। 'কি ব্যাপার, সিনেটর?'

ডেস্কের সামনে একটা চেয়ার দেখিয়ে সিনেটর বললেন, 'দু'জনেই বসুন। কথা আছে।'

মাথা নেড়ে বাংলায় রাশেদের সঙ্গে কথা বললেন কায়েস। সঙ্গে সঙ্গে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন রাশেদ। সিনেটরের দিকে ফিরে কায়েস বললেন, 'আমাদের একজন ভেতরে থাকলে, অপরজনকে বাইরে থাকতে হবে। কি ঘটল?'

লী আলেকজান্ডারের তথ্যগুলো জানালেন সিনেটর।

সব শোনার পর কায়েস বললেন, 'গুড।'

'গুড?'

'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে যে কোন তথ্য উপকারী।'

সিনেটর উদ্বিগ্ন নন, তবে চিন্তিত। 'লী বললেন, ওদের বারোজন "সৈনিক" আছে। আপনারা তো মাত্র তিনজন।'

'না, পাঁচজন। তিন দিন আগে আরও দু'জন এসেছে।'

অবাক হলেন সিনেটর। 'কই, আমি তো দেখলাম না!'

'না, দেখতে পাবার কথা নয়। ওরা বাইরের লোক···বলতে পারেন বন্দুকবাজ।'

'মি. রানা ওদেরকে পাঠিয়েছেন?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'হ্যাঁ। আপনি শুনে খুশি হবেন, বয়েসে দু'জনেই ওরা তরুণ।'

মৃদু হাসলেন সিনেটর। 'এতে রুটিনের কি কোন বদল হবে?'

'না। আপনি কি শিওর, ফেডারেল এজেন্টদের সরিয়ে দিতে পারবেন?'

'সাতটায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা হবে। আপনাকে পরে জানাব।'

কায়েস চিন্তা করছেন। 'আপনার বন্ধু আলেকজাণ্ডার দুটো ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন। ইটালিয়ান মাফিয়া সম্পর্কে ধারণা আছে আমার, কিন্তু আমেরিকান মাফিয়া পরিবারগুলো সম্পর্কে খুব কম জানি। ফসেলাদের সম্পর্কে

যত বেশি সম্ভব তথ্য দরকার আমাদের। বিশেষ করে "সৈনিকদের" ফটো।'

একটা প্যাডে নোট নিলেন সিনেটর। 'আর কি?'

'এজেন্টদের বসিয়ে না রেখে ডেট্রয়েট-এ পাঠাতে পারেন তিনি, ফসেলা সৈনিকদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার জন্যে।'

নোট নিতে নিতে সিনেটর বললেন, 'ঠিক আছে। এবার আমাকে মীটিঙে যেতে হয়।'

খুব দ্রুত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠছে পবন। দশ দিন পর ফাইন্যাল চেক-আপ করানোর জন্যে ওকে নিয়ে হাসপাতালে এল রানা। পবন এত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠেছে দেখে ডাক্তাররা সবাই খুব অবাক হলেন। পরে ওকে নিয়ে ফোর্ট সেন্ট এলমোয় চলে এল রানা, অসমাপ্ত ট্রেনিং শেষ করতে হবে ওকে।

সিনেটর ক্রিস্টোফার ও কায়েস চৌধুরী সবেমাত্র ডিনার শেষ করেছেন, ফোনটা বেজে উঠল। আলবিনো কফি পরিবেশন করছিল। তাকেই ফোন ধরতে বললেন সিনেটর। 'আমি জানি নিক কার্টিস ফোন করেছেন, বলে দাও আমি নেই।'

সাইডবোর্ড-এর দিকে এগিয়ে গেল আলবিনো, ফোনের রিসিভার তুলল। এক মুহূর্ত অপরপ্রান্তের কথা শুনল সে, তারপর স্প্যানিশ ভাষায় দ্রুত কথা বলতে শুরু করল।

স্প্যানিশ ভালই বোঝেন সিনেটর। আলবিনোর কথা শুনে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘুরল আলবিনো, তার চেহারা মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'আমার মা,' বলল সে। 'হার্ট অ্যাটাক। অবস্থা ভাল নয়। ফোন করেছিল আমার ভাই।'

ফোনের কাছে এসে রিসিভার তুললেন সিনেটর। ডায়াল করে বললেন, 'গ্লেন্ডা, আমি ডেভিড। মেক্সিকোগামী প্রথম যে প্লেনটা পাওয়া যাবে তাতে একটা সীট দরকার···না, আমার জন্যে নয়, আলবিনোর জন্যে। ওর মায়ের হার্ট···হ্যাঁ, আমি অপেক্ষা করছি।' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে আলবিনোকে বললেন, 'মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তুমি তোমার মায়ের কাছে পৌঁছে যাবে। দরকার হলে চার্টার করা প্লেনে পাঠাব তোমাকে।'

শার্টের আস্তিন দিয়ে চোখের পানি মুছল আলবিনো। 'ধন্যবাদ, স্যার। কিন্তু আপনার কি হবে?'

'তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না,' বললেন সিনেটর। 'এজেন্সি থেকে দিন কয়েকের জন্যে কাউকে আনিয়ে নেব। যতদিন প্রয়োজন মায়ের পাশে থাকবে তুমি।' রিসিভার থেকে হাত সরিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, এখনি পৌঁছে যাবে ও, তবে খেয়াল রেখো ওকে রেখে প্লেনটা যেন চলে না যায়। প্রয়োজন হলে হ্যারি মর্টনকে ফোন করো, আমার নামটাও ব্যবহার করতে পারো। আমার অফিসের সেফ থেকে পাঁচ হাজার ডলার বের করে আলবিনোকে দেবে, এয়ারপোর্টে, কেমন?' রিসিভার নামিয়ে রেখে আলবিনোর দিকে তাকালেন তিনি। 'যাও, একটা সুটকেস গুছিয়ে নাও। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে ডালাসে যাচ্ছে একটা প্লেন. ওখান

থেকে কানেকটিং ফ্লাইট ধরে মেক্সিকো সিটি চলে যাবে তুমি।'
আলবিনো কিছু বলতে যাচ্ছিল, হাত নেড়ে তাকে থামিয়ে দিলেন সিনেটর, 'কথা নয়, যা বলছি শোনো।'
আলবিনো কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে কায়েস চৌধুরীর দিকে ফিরলেন সিনেটর। 'আপনাদের কেউ ওকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারেন?'
মাথা নাড়ালেন কায়েস। 'সম্ভব নয়। মাহমুদ ঘুমাচ্ছে, আর রাশেদ আমার ব্যাক-আপ।'
'আর বাকি দু'জন?'
'ওরা বাইরে কোথাও আছে, ওখানেই থাকবে।'
আবার ফোনের রিসিভার তুললেন সিনেটর। 'হাই, গ্লেনডা। শোনো, একটা ইমার্জেন্সী দেখা দিয়েছে।' সংক্ষেপে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলেন তিনি, তারপর বললেন, 'তোমার একজন লোককে দিয়ে ওকে এয়ারপোর্টে পাঠানো যায়? আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আর ট্যাক্সি অনেক দেরি করে ফেলবে।...গুড, থ্যাঙ্কস। দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে ও। এয়ারপোর্টে ওর জন্যে অপেক্ষা করবে জনি।'
আলবিনো বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর কিচেনে ঢুকলেন সিনেটর, আরও কফি বানাবেন। তাঁর পিছু নিয়ে কায়েসও ঢুকলেন। সিনেটর বললেন, 'এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমরাই আলবিনোকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে পারতাম, তাই না?'
কথা না বলে মাথা নাড়লেন কায়েস, ঠোঁটে একটা আঙুল। ফ্রিজের পাশে একটা নোটপ্যাড আর পেন্সিল ঝুলছে, সেগুলো নামিয়ে লিখতে শুরু করলেন তিনি। তারপর ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে সিনেটরকে বসতে বললেন। বিস্মিত সিনেটর কথা না বলে চেয়ারটায় বসে পড়লেন। এগিয়ে এসে প্যাডটা তাঁর নাকের সামনে ধরলেন কায়েস। সিনেটর পড়লেন, 'এটা একটা সেট-আপ হতে পারে। ওরা হয়তো এখান থেকে এয়ারপোর্টের মাঝখানে কোথাও অপেক্ষা করছে।'
সবেগে মাথা নেড়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন সিনেটর, ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন কায়েস। তার হাত থেকে প্যাড আর পেন্সিল নিয়ে সিনেটর লিখলেন, 'আমাদের পরিবারে আজ আট বছর ধরে আছে আলবিনো। আমি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি।'
এরপর আবার কায়েস লিখলেন, 'আমি করি না। চলুন বাগানে গিয়ে কথা বলি।'
বাগানে ঢুকে পুলের পাশে দাঁড়ালেন ওরা। সিনেটরের গলায় বিদ্রূপ, 'এখন আমি কথা বলতে পারি?'
'পারেন, সিনেটর। তবে নিচু গলায়, প্লীজ।'
'এ-সব কি, আমাকে খুলে বলবেন?'
সরে এসে সিনেটরের আরও কাছে দাঁড়ালেন কায়েস। 'অপ্রত্যাশিত ঘটনা আমি পছন্দ করি না। ফসেলারা আপনার ওপর নজর রাখছে, কাজেই তারা জানে যে আপনার চাকর মাত্র একজন, এবং সন্ধের সময় কোন পার্মানেন্ট ড্রাইভার আপনি রাখেন না। তাদের এ-ও জানার কথা যে তিনজন বডিগার্ডের মধ্যে দু'জন সব সময় আপনাকে পাহারা দেয়, বাকি একজন বিশ্রাম নেয়। মেক্সিকো সিটির ফ্লাইট যে

ডেনভার থেকে ছাড়বে, এ খবরও জানবে তারা। কাজেই এমন এক সময়ে টেলিফোন করা হয়েছে, যাতে সিদ্ধান্ত নেন আপনি নিজেই আলবিনোকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবেন। সিনেটর, অ্যামবুশের প্রশ্নে টাইমিংই সব। ওদের টাইমিং নিখুঁত, পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে।'

'কিন্তু ফোন করেছিল আলবিনোর ভাই।'

'সে তাই বলছে বটে।'

'তারমানে আলবিনোর মায়ের হার্ট অ্যাটাকের খবর সত্যি নয়?'

'চেক করে দেখতে হবে,' বললেন কায়েস। 'ব্যাপারটা যদি সেট-আপ হয়, নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায় আলবিনো বাড়িতে ছারপোকা ছড়িয়ে রেখেছে। সেজন্যেই আমরা বাগানে কথা বলছি। বাড়ির ভেতর স্বাভাবিকভাবে কথা বলব আমরা। ছারপোকা পাওয়া গেলে ওগুলো আমরা সরাব না। সরালে ওরা সাবধান হয়ে যাবে।'

ছোট্ট একটা কালো মেটাল বক্স বের করে বোতামে চাপ দিলেন কায়েস। বাগানের কিনারায়, একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল রাশেদকে, পায়ের কাছে ডোবারম্যান। সেদিকে এগিয়ে গিয়ে নিচু গলায় কথা বললেন কায়েস। মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ। তারপর দু'জনই ফিরে এলেন সিনেটরের কাছে। 'আলবিনোর ঠিকানা কি, মেক্সিকো সিটির?'

ঠিকানাটা বললেন সিনেটর।

রাশেদের দিকে আঙুল তাক করলেন কায়েস। 'ওর বন্ধু আছে মেক্সিকো সিটিতে। কাল সন্ধের মধ্যে জানা যাবে আলবিনোর মা সত্যি অসুস্থ কিনা।'

রোপণ করা ছারপোকাগুলো খুঁজে বের করতে তিন ঘণ্টা লেগে গেল ওঁদের। মেইনলাইন টেলিফোনে পাওয়া গেল দুটো, ছ'টা পাওয়া গেল এক্সটেনশনে। সবচেয়ে ভোগাল ব্যাক-আপ ছারপোকা। প্রতিটি ফোনের তিন মিটারের মধ্যে লুকানো ছিল ওগুলো, যে-কোন কামরায় কথা বলা হোক, সব যান্ত্রিক কানে চলে যাবে।

মাঝরাতের পর আবার ওরা বাগানে বেরিয়ে এলেন। সিনেটর বললেন, 'এ-সব আলবিনোর কাজ, এ আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'ওর কাজ নয়,' কায়েস বললেন। 'একজন এক্সপার্টের কাজ। তবে সেই এক্সপার্টকে কেউ একজন বাড়িতে ঢোকার সুযোগ করে দেয়। আলবিনো ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'এখন তাহলে কি করা হবে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'কিছুই করা হবে না,' জবাব দিলেন কায়েস। 'বাড়িতে বা ফোনে কথা বলার সময় সাবধান থাকবেন শুধু। ছারপোকা থাকায় সুবিধে হবে আমাদের।'

'কিভাবে?'

ভেবেচিন্তে কথা বলছেন কায়েস, 'অ্যামবুশ বা "স্ন্যাচ" হলো ওয়ার সিচুয়েশন। অ্যাটাকার আছে, আছে ডিফেন্ডার। ডিফেন্ডারদের ক্রিটিকাল ফ্যাক্টর দুটো। ঘটনাটা কোথায় ঘটবে আর কখন ঘটবে জানা।'

'কিন্তু আমরা জানব কিভাবে?'

'জানব, কারণ স্থান ও সময় আমরাই নির্বাচন করব,' বললেন কায়েস।

'বুঝলাম না। কিভাবে?'

তিনজন বডিগার্ডই হাসতে শুরু করলেন। প্রশ্নের জবাব দিলেন রাশেদ, 'দু'তিনদিনের মধ্যে বাড়ি থেকে আপনি একটা ফোন করবেন। ফোন করবেন এক তরুণীকে। ফোনে তার সঙ্গে গোপনে দেখা করার আয়োজন করবেন আপনি। সেই জায়গায় বডিগার্ড গিজগিজ করবে।'

পালা করে ওঁদের দিকে তাকালেন সিনেটর। তারপর তিনিও হাসতে শুরু করলেন।

[আগামী খণ্ডে সমাপ্য]

সাউদিয়া ১০৩

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

এক

'তোমার গোঁফ থাকলে ভাল হয়।'

অবাক হয়ে মাসুদ রানার দিকে তাকাল পবন চৌধুরী। 'কেন?'

'সার্ব তরুণরা অনেকেই গোঁফ রাখে।' হাসল রানা। 'তাছাড়া, গোঁফ থাকলে তোমার বয়েস বেড়ে বিশ হয়ে যাবে।'

সুইমিং পুলের কিনারায় পাশাপাশি বসে আছে ওরা, দুই জোড়া পা পানিতে।

'আর কয়েক হপ্তার মধ্যে তোমার ট্রেনিং শেষ হবে,' বলল রানা, সিরিয়াস দেখাল ওকে। 'তারপর আমরা রওনা হব। তোমার ট্রেনিঙের শেষ পর্বটা এখানে, এই বাড়িতে সারতে হবে। কেভ-এ একটা পিস্তল রেঞ্জ সেট করব, আর মেনিনোর কাছ থেকে ধার করব একটা স্নাইপার রাইফেল, সাইলেন্সার লাগানো। কাছাকাছি পাহাড়ে প্র্যাকটিস করা যাবে।'

'মেনিনো বলছিলেন উইপনে আমার অনেক দুর্বলতা থেকে যাচ্ছে।'

'তার কারণ আছে,' বলল রানা।

'কি কারণ?'

'টেমপ্যারামেন্ট,' জবাব দিল রানা। 'এটাকে তুমি অসহিষ্ণুতাও বলতে পারো। হ্যান্ডগান বা এসএমজি-র জন্যে ব্যাপারটা ঠিক আছে। এসএমজি-র সঙ্গে সুন্দর মানিয়ে নিয়েছ তুমি। তোমার মধ্যে সহজাত একটা ছন্দ আছে। আর দু'হপ্তার মধ্যে দারুণ ভাল করবে তুমি।'

'আপনার মত ভাল করব?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, তবে তোমার ওই বয়েসে আমি যেমন করতাম তারচেয়ে ভাল। আর স্নাইপিং প্রসঙ্গে বলব, তোমাকে মানসিকতা বদলাতে হবে। চর্চা করে মনোযোগ আর ধৈর্য বাড়াতে হবে। আড়ালের ভেতর ঘণ্টার পর ঘণ্টা একচুলও না নড়ে কিভাবে পড়ে থাকতে হয় শিখতে হবে তোমাকে। গুর্খারা দুনিয়ার সেরা স্নাইপার।'

'গুর্খা?'

'হ্যাঁ, ওরা নেপালের লোক। আজও ওরা ব্রিটিশ আর ভারতীয় সেনাবাহিনীতে মার্সেনারি হিসেবে সার্ভিস দিচ্ছে। খুব ছোটখাট মানুষ, অথচ ওদের মত এত ভাল সৈনিক কোথাও আমি দেখিনি। তোমাকে ট্রেনিং দেয়ার জন্যে ওদের একজনকে আনা হচ্ছে। তাঁর বয়েস ষাট, অবসর নিয়েছেন, সম্ভবত এখনও তিনি দুনিয়ার সেরা স্নাইপার।'

'মাসুদ ভাই, আপনিও কি খুব ভাল স্নাইপার?'

'ভাল, তবে গণেশ থাপার কাছাকাছিও নই। তিনি তাঁর শরীর আটচল্লিশ ঘণ্টা পুরোপুরি স্থির রাখতে পারেন, তারপর চারশো মিটার দূর থেকে উড়িয়ে দিতে

পারেন বোতলের ছিপি।'

হাতে ট্রে নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল পাখি, গাছের ছায়ায় টেবিলের ওপর রাখল সেটা। 'লাঞ্চ।'

মাংস, সালাড আর পনির, সবশেষে ফল ও কফি। দুপুরে ভাত বা রুটি বাদ দিতে বলেছে রানা। খেতে বসে পবন জিজ্ঞেস করল, 'আজ সন্ধ্যায় আমি ডিসকোয় যেতে চাই, কারও কোন আপত্তি নেই তো?'

রানার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিল পাখি, 'যদি কথা দিস বিয়ার খাবি না।' বিয়ার খাক বা না খাক, ডিসকোয় গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে পবনের নাচানাচি করার ব্যাপারটা ইদানীং ভাল চোখে দেখছে না সে। রানার কাছে অভিযোগও করেছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার পায়নি।

'আমরা সবাই গেলে কেমন হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

ঝট করে রানার দিকে তাকাল পাখি। 'আমরা সবাই··· ডিসকোয়?'

'অসুবিধে কি? ওখানে দারুণ পিজা পাওয়া যায়, সময়টাও ভাল কাটবে।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাখি। 'মাসুদ ভাই, আমি আপনার সঙ্গে ডিসকোয় গেলে মানুষের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে না? এর আগে তো তাই বলেছিলেন।' তার বলার সুরে স্পষ্ট ব্যঙ্গ, একটু হয়তো অভিমানও লুকিয়ে আছে।

'আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, পাখি। আমি সামাজিক অনুষ্ঠানের কথা বলেছিলাম। এখানকার সমাজের রীতি হলো, কোন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে কারও বাড়িতে বেড়াতে বা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে অর্থ করা হয় মেয়েটার সঙ্গে তার অ্যাফেয়ার চলছে। তবে ক্লাব, রেস্তোরাঁ বা অন্য কোথাও বেড়াতে গেলে ব্যাপারটাকে হালকাভাবে দেখা হয়···'

'কে কি অর্থ করবে সে-কথা ভেবে চলতে হবে আমাকে? তারচেয়ে কোথাও গিয়ে দরকার নেই আমার, আমি একা ভালই থাকব বাড়িতে।' বলে আর দাঁড়াল না পাখি, পায়ের দুপদাপ শব্দ তুলে বাড়ির ভেতর চলে গেল।

নিস্তব্ধতা অস্বস্তিকর হয়ে উঠছে, এই সময় টেলিফোনের আওয়াজ ভেসে এল। চেয়ার ছেড়ে কিচেনে চলে গেল পবন, ফিরে এসে বলল, 'মাসুদ ভাই, আপনার ফোন। ওভারসীজ। ভদ্রলোক নাম বলছেন না, বলছেন চৌ বললেই চিনবেন আপনি।'

কিচেন থেকে দশ মিনিট পর ফিরল রানা। 'কাল সকালে চলে যাচ্ছি আমি। দিন সাতেক পর ফিরব।'

'বেলেন্ডা, ডার্লিং, তোমাকে দেখতে না পেয়ে মরে যাচ্ছি আমি!'

বিদেশী বাচন ভঙ্গিতে, মেয়েলি সুরে কায়েস চৌধুরী জবাব দিলেন, 'সুইটহার্ট, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমিও কি ভাল আছি!'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার। সুইমিং পুলের এক প্রান্তে একটা টেবিলে বসে আছেন ওঁরা। দু'জনের হাতেই এক শিট করে কাগজ। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলেন কায়েস চৌধুরী, বললেন, 'সিনেটর, কথাগুলো আপনাকে আরও সুন্দর করে বলতে হবে। ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিলে চলবে না। আজ

রাতে ওকে ফোন করবেন আপনি, শুনে যদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে মনে না হয় তাহলে সব ভেস্তে যাবে।'

নিঃশব্দে হাসলেন সিনেটর। 'বলতে চাইছেন শুনে যেন মনে হয় আমি আমার মিস্ট্রেসের সঙ্গ পাবার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছি?'

'ঠিক তাই। নিন, আবার প্রথম থেকে শুরু করুন।'

হুইস্কিতে একটা চুমুক দিয়ে কাগজটার ওপর চোখ রাখলেন সিনেটর, বললেন, 'বেলেন্ডা, ডার্লিং, তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি মরে যাচ্ছি!'

'সুইটহার্ট, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমিও কি ভাল আছি!'

আবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন সিনেটর। হতাশ কায়েস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সিনেটর বললেন, 'মি. চৌধুরী, আপনি মেয়েটা সম্পর্কে বলুন আমাকে। এই যেমন, কত বয়েস তার?'

'আমার ধারণা বাইশ কি তেইশ।'

'সে কি সুন্দরী?'

'সাঙ্ঘাতিক।'

'তাহলে, সে যদি টেবিলে আমার সামনে বসে থাকে, এই পরীক্ষায় আমার উতরে যাবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু তার বদলে লোমশ একটা পুরুষ থাকলে...,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালেন সিনেটর।

'তাহলে আমাকে কি করতে বলেন আপনি? পরচুলা পরি আর সিলিকন ইঞ্জেকশন নিই?'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন শেখ রাশেদ। বললেন, 'সিনেটর, আপনার জন্যে খারাপ কিছু খবর আছে। এই মাত্র মেক্সিকোতে ফোন করেছিলাম। আলবিনোর মা বহাল তবিয়তে আছেন। তিনি আজ তাঁর ছেলে আলবিনোকে নিয়ে জুয়েলারির দোকানে গিয়েছিলেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর ছেলে হঠাৎ বড়লোক বনে গেছে। জননীকে দামী একটা ব্রেসলেট কিনে দিয়েছে সে।'

হাসি-খুশি ভাবটা ধীরে ধীরে মুছে গেল, মাথাটা নিচু করে নিলেন সিনেটর। 'আলবিনো...ওকে আমরা এত বিশ্বাস করতাম!'

রাশেদ জানতে চাইলেন, 'আপনি চান এ-ব্যাপারে কিছু করি আমরা?' 'যেমন?'

কাঁধ ঝাঁকালেন রাশেদ। 'ওখানে আমার যে বন্ধু আছেন তিনি অবসর নিলেও, ন্যায্য ফি দেয়া হলে সানন্দে আলবিনোর খুলি উড়িয়ে দেবেন...কিংবা তার অ্যানাটমির অন্য যে-কোন অংশ। সব মিলিয়ে একটা ব্রেসলেটের চেয়ে বেশি খরচ পড়বে না।'

রানা এজেন্সির অপারেটররা দেখলেন সিনেটর চিন্তা করছেন। অবশেষে মাথা নাড়লেন ডেভিড ক্রিস্টোফার। 'ধন্যবাদ, মি. রাশেদ, তবে না। এ-ধরনের কাজ ফসেলারা করে করুক, আমরা করব না।'

আবার কাঁধ ঝাঁকালেন রাশেদ। 'আপনি যা বলেন।'

'একটা চেয়ার টেনে সিনেটরের পাশে বসো,' রাশেদকে বললেন কায়েস।

'উনি হাসতে শুরু করলেই কনুই দিয়ে পেটে গুঁতো মারবে—জোরে।' সিনেটরকে বললেন, 'নিন, আবার শুরু করুন।'

কাগজটা তুলে নিয়ে সিনেটর বললেন, 'ঠিক আছে, আমি তৈরি। বেলেন্ডা, ডার্লিং, তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি মরে যাচ্ছি!'

'ডেভিড, সুইটহার্ট, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমিও কি ভাল আছি!'

এবার সিনেটর নন, গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন রাশেদ।

খেঁকিয়ে উঠলেন কায়েস, 'যাও, ভাগো, তোমাকে এখানে দরকার নেই।'

হাসতে হাসতে চলে গেলেন রাশেদ।

'আপসেট হবেন না,' বললেন সিনেটর। 'ব্যাপারটা যে গুরুত্বপূর্ণ, আমি জানি। এখন থেকে সিরিয়াস হব আমি। চিন্তা করবেন না, মি. চৌধুরী—কলেজের থিয়েটার গ্রুপে ভালই নাম করেছিলাম। তাছাড়া, ভাল একজন রাজনীতিককে তুখোড় অভিনেতা হতেই হয়।'

কাজেই আবার ওঁরা শুরু করলেন। এবার সসম্মানে উতরে গেলেন সিনেটর।

'বেলেন্ডা, ডার্লিং, তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমি মরে যাচ্ছি!'

'ডেভিড, সুইটহার্ট, তোমাকে কাছে না পেয়ে আমিও কি ভাল আছি!'

'এভাবে আর চলতে পারে না। তোমার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই।'

'কিন্তু কিভাবে, সুইটহার্ট? ওরা যে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিয়ে রেখেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সিনেটর, হতাশ সুরে বললেন, 'হানি, ব্যাপারটা যদি দিন কয়েকের জন্যে হত, মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু এই পরিস্থিতি মাসের পর মাস…যেভাবে হোক আমাকে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে।'

'কি ব্যবস্থা করবে, ডেভিড?'

'হানি, আমি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেব। তারপর কোন ভাবে বডিগার্ডদের চোখে ধুলো দিয়ে ঘণ্টা দু'য়েকের জন্যে পালাব। প্রতিদিন না হলেও, হপ্তায় অন্তত একটা দিন…'

'কিন্তু কিভাবে, ডেভিড?'

'ব্যাপারটা তুমি আমার ওপর ছেড়ে দাও, ডার্লিং। অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করতে পারলেই ডাকযোগে চাবিটা আমি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। পরে এক সময় ফোন করে সময় ঠিক করব।'

'আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না, সুইটহার্ট…আমার বড় একা লাগে।'

'একই অবস্থা আমারও, হানি। এত কাজ, তার ওপর সারাক্ষণ ছায়ার মত গায়ে সেঁটে আছে বডিগার্ডরা, একদম অসহ্য হয়ে উঠেছে। আমিও তো একটা মানুষ, আমারও তো আনন্দ-ফুর্তির দরকার আছে!'

কায়েস চৌধুরী তাঁর গলায় চাপা মেয়েলি হাসি আনার চেষ্টা করে বললেন, 'তুমি শুধু আমার কাছে চলে এসো, সুইটহার্ট, বাকি সব আমি দেখব।'

নিঃশব্দে হাসছেন সিনেটর, তবে কথা বললেন দৃঢ় স্বরে, 'যাবই আমি, যেভাবে পারি। শোনো, এখন আমাকে ছাড়তে হচ্ছে। আবার যোগাযোগ করব, কেমন? গুডবাই।'

'গুডবাই, সুইটহার্ট।' কাগজ থেকে মুখ তুললেন কায়েস। 'দারুণ হয়েছে, সিনেটর। সত্যি ভাল করেছেন এবার। আরও দু'বার প্র্যাকটিস করব আমরা, তারপর রাতে আপনি ফোন করবেন।' পকেট থেকে কলম বের করে নিজের কাগজটা উল্টো করলেন তিনি। 'নিয়মিত যান এমন কয়েকটা রেস্তোরাঁর নাম-ঠিকানা বলুন।'

'তা বলছি। তার আগে প্ল্যানটা ব্যাখ্যা করুন।'

'খুব সহজ প্ল্যান,' বললেন কায়েস। 'সব ভাল প্ল্যানই তাই। আপনি যে রেস্তোরাঁর নাম বলবেন, সবগুলো আমরা চেক করে দেখব। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়, এরকম একটা বেছে নেব। ওটার কাছাকাছি একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করব, গাড়ি নিয়ে যাতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌছুনো যায়। এক রাতে আপনি আপনার দুই পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে ডিনার খাবার ব্যবস্থা করবেন। তার আগে অ্যাপার্টমেন্টের চাবিটা ডাকযোগে বেলেন্ডার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। ওই বিল্ডিঙে কয়েকটা খালি অ্যাপার্টমেন্ট থাকাটা জরুরী।

'ডিনারের আগে, বিকেলে, বেলেন্ডাকে আপনি ফোন করবেন। ফোনে আপনি তাকে বিল্ডিঙের নাম বলবেন, তবে কত নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট তা বলবেন না। বলবেন, আপনি তাকে ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করবেন, তখন জানাবেন কখন পৌছুতে পারবেন। এ-ও বলবেন যে রাত ঠিক এগারোটার সময় আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে তার। ডিনারে আপনার সঙ্গে থাকবে রাশেদ, একই টেবিলে বসবে। মাহমুদ বরাবরের মত রেস্তোরাঁর বাইরে থাকবে। আর আমি থাকব বেলেন্ডার সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর। ফার্স্ট কোর্স শেষ হবার পর আপনি টয়লেটে যাবার নাম করে টেবিল ছাড়বেন, তারপর পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসবেন। ওখানে আপনার জন্যে একটা গাড়ি অপেক্ষা করবে। গাড়ি চালিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে পৌছুবেন আপনি। দু'বার অরক্ষিত অবস্থায় থাকতে হবে আপনাকে, এটা একটা। এ-প্রসঙ্গে পরে আসছি।'

মিনারেল ওয়াটারে চুমুক দিলেন কায়েস, তারপর আবার শুরু করলেন, 'এ-সব তথ্য ছারপোকার মাধ্যমে ফসেলাদের জানা হয়ে যাবে। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংটা চিনবে তারা, তবে নম্বরটা জানবে না। বিল্ডিং থেকে কখন আপনি বেরিয়ে আসবেন তা ওরা জানবে, তবে জানবে না কখন আপনি ওখানে পৌছুবেন। ওদের যদি বুদ্ধি বলে কিছু থাকে, আছে বলেই ধরে নিচ্ছি, আপনাকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করবে বিল্ডিঙের প্রবেশমুখে, আপনি বেরিয়ে আসার সময়।'

'ভেতরে নয় কেন?'

'কারণ আগামী দু'তিন দিনে ওই বিল্ডিঙের কয়েকটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করতে যাচ্ছি আমরা, ভুয়া নামে, যাতে ওরা লেটিং রেকর্ড যোগাড় করতে পারলেও বুঝতে না পারে ঠিক কোনটাতে বেলেন্ডা আছে।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর, তারপর বললেন, 'কিন্তু বেলেন্ডাকে আমি বিল্ডিঙের নাম বলার পর সেটার ওপর নজর রাখবে ওরা।'

'হ্যাঁ, রাখবে। তবে সেদিন বিকেল থেকে ওরা দেখতে পাবে একের পর এক বেশ কয়েকটা সুন্দরী মেয়ে ওই বিল্ডিঙে ঢুকছে, তারা সবাই একজন সিনেটরের

মিসট্রেস হবার যোগ্য। বেলেন্ডা আরও আগে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে বসে থাকবে। সে কেমন দেখতে, ওরা তা জানে না।'

'আমি আর কখন অরক্ষিত অবস্থায় থাকব?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'এগারোটায় আপনি যখন বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে আসবেন। আমি ঠিক আপনার পিছনেই থাকব, তবে কয়েক সেকেন্ডের জন্যে একজন স্নাইপারের রাইফেল আপনাকে টার্গেট হিসেবে পেয়ে যাবে। ওই অল্প কয়েক সেকেন্ডের পর, ব্যাপারটা মিটে না যাওয়া পর্যন্ত বিল্ডিঙের ভেতর থাকবেন আপনি। অল্প কয়েক সেকেন্ড মানে আধ মিনিট, তার বেশি নয়।' সিনেটরের চোখে চোখ রাখলেন কায়েস। 'ওই সময়টুকু আপনাকে আমি অরক্ষিত অবস্থায় ছাড়ছি, কারণ শতকরা পঁচানব্বুই ভাগ নিশ্চিতভাবে জানি যে ওরা আপনাকে কিডন্যাপ করতে চায়—সঙ্গে সঙ্গে খুন করতে চায় না।'

'তবে ঝুঁকি আছে?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'আছে,' জবাব দিলেন কায়েস। 'এ-সব ব্যাপারে ঝুঁকি থাকবেই। আগে আপনি কখনও গুলির মুখে পড়েছেন?'

'পড়েছি। কোরিয়ায় ছিলাম আমি, আহত হয়েছিলাম।'

'এ-ও আরেক ধরনের যুদ্ধ, সিনেটর। তবে আলবিনোকে ধন্যবাদ, আমরা সুবিধেজনক অবস্থায় আছি। সময় ও স্থান নির্বাচন করছি আমরা।' হাতঘড়ি দেখলেন কায়েস। 'এবার আপনাকে প্রতিবেশী কারও বাড়িতে একবার যেতে হবে।'

'মানে? কেন?'

'ওখান থেকে আপনার বন্ধু এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর লী আলেকজান্ডারকে ফোন করবেন। তাঁর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'কি বিষয়ে?'

'মনে আছে, আপনি তাঁকে ফসেলা "সৈনিকদের" ওপর নজর রাখতে অনুরোধ করেছিলেন? বেলেন্ডাকে আপনি প্রথমবার ফোন করার পর ওরা যদি বেশ কয়েকজন ডেট্রয়েট ত্যাগ করে, বুঝতে হবে টোপটা গিলেছে। আমি তাঁকে কয়েকটা কোড সেনটেন্স জানিয়ে দেব, উনি যাতে এখানে ফোন করতে পারেন। উনি ফোন করলে এক্সটেনশনে শুনব আমি।'

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন সিনেটর, আড়মোড়া ভাঙলেন। 'ঠিক আছে,' বললেন তিনি। 'ভাল কথা, এই বেলেন্ডা মেয়েটাকে পেলেন কোথায় আপনারা?'

'আমি পাইনি,' জবাব দিলেন কায়েস। 'উনি মি. রানার মাধ্যমে এসেছেন।'

'মেয়েটা কি মি. রানার গার্লফ্রেন্ড?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি।'

দুই

পরদিন রাত আটটায় একটা ফোন এল। কায়েস চৌধুরীকে নিয়ে বার-এ বসে আছেন ডেভিড ক্রিস্টোফার, হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুললেন।

'ডেভিড,' অপরপ্রান্ত থেকে লী আলেকজান্ডারের স্ত্রী মার্থা আলেকজান্ডার বললেন, 'আমি মার্থা। কেমন আছ তুমি?'

'ফাইন, হানি।' কায়েসকে ইঙ্গিত দিলেন তিনি, কায়েস টুল ছেড়ে তাড়াতাড়ি কিচেনে গিয়ে ঢুকলেন, ক্রেডল থেকে তুলে কানে ঠেকালেন এক্সটেনশন।

'ডেভিড,' মার্থা বললেন, 'আগামী মাসের পাঁচ তারিখে তুমি কি ওয়াশিংটন থাকছ?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। মাসের শেষ দিকে পৌঁছে হপ্তা দেড় দুই থাকার ইচ্ছে আছে। ওখানে আমি ছোট একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনতে চাইছি। ফার্নিচার আর ডেকোরেটিং-এ তুমি হয়তো আমাকে সাহায্য করতে পারবে···জানোই তো, এ-সব ব্যাপারে আমি একেবারে আনাড়ী।'

'আমি রাজি, তবে আগেই বলে রাখছি জুডি আর আমার রুচির মধ্যে পার্থক্য আছে।'

'তোমার রুচির প্রতি আমার ভক্তি আছে, মার্থা। পাঁচ তারিখের ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'সেদিন রোববার, বাড়িতে আমরা ছোট্ট একটা পার্টির আয়োজন করছি। খুব বেশি হলে দশ-বারোজন মানুষ, তবে তারা সবাই মজার মানুষ। তুমি আসবে?'

'কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না,' সিনেটর বললেন, 'ওই সুযোগে অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে কথা বলাও যাবে, কি বলো? ক'টার সময়?'

'শুরু তো হবে একটার দিকে, তবে কখন যে শেষ হবে তা বলা মুশকিল। লীকে তো তুমি চেনোই। ছ'টা পর্যন্ত হাতে কোন কাজ রেখো না। কথা দিচ্ছি, সময়টা তুমি উপভোগ করবে। শুধু মজার নয়, বিচিত্র চরিত্রের মানুষ ওরা।'

সিনেটর হেসে উঠলেন। 'হ্যাঁ, অদ্ভুত সব বন্ধু আছে তোমাদের। দারুণ আগ্রহ বোধ করছি, বুঝলে! বাই, হানি।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এলেন কায়েস, হাতে এক টুকরো কাগজ, ওঁদের আলাপ লিখে নিয়েছেন। বার কাউন্টারে কাগজটা রাখলেন তিনি, সিনেটর সেটার ওপর ঝুঁকলেন। পেন্সিল দিয়ে কয়েকটা বাক্যের নিচে দাগ দিলেন কায়েস। কাগজটা নিয়ে বার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তাঁর পিছু নিলেন সিনেটর।

বাগানে বেরিয়ে এসে কায়েস সন্তুষ্টচিত্তে বললেন, 'ওরা তাহলে টোপ গিলেছে। আজ একটা থেকে ছ'টার মধ্যে ফসেলা পরিবারের ছ'জন ''সৈনিক'' ডেট্রয়ট এয়ারপোর্ট থেকে রওনা হয়েছে, বিভিন্ন গন্তব্যে।' হাসলেন তিনি।

'বিভিন্ন গন্তব্যে কেন?'

'সবাই একটা প্লেনে উঠে ডেনভারে আসবে না, জানা কথা,' বললেন কায়েস। 'সিনেটর, চার রাত পর বেলেন্ডার সঙ্গে আপনার দেখা হতে যাচ্ছে।'

'এত দেরি করার কি কারণ?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর। 'ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি চুকে যায় ততই ভাল, আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারি।'

'দেরি করার কারণ, আমি রিইনফোর্সমেন্টের অপেক্ষায় আছি,' জবাব দিলেন কায়েস। 'এখানে ওদের দু'তিনজন লোক আগে থেকেই আছে, না থেকে পারে না। সব মিলিয়ে দাঁড়াবে নয় কি দশজন।'

'আর আমাদের রিইনফোর্সমেন্ট?'

'মাত্র একজন।'

গম্ভীর হলেন সিনেটর। 'তারমানে নয় বা দশজনের বিরুদ্ধে ছ'জন? শক্তির ভারসাম্য থাকছে কি?'

'থাকছে,' এখনও হাসছেন কায়েস। 'সময় হলে বুঝতে পারবেন।'

ডেভিড ক্রিস্টোফার উত্তেজিত হয়ে আছেন, তবে ভয় পাননি। অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছেন তিনি, প্রথমবার। দু'মিনিট আগে পিছনের দরজা দিয়ে চুপিসারে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসেছেন তিনি, বিস্মিত শেফের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি উপহার দিয়েছেন। রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে চওড়া একটা গলিতে পড়েছেন। নীল ফোর্ড গাড়িটা যেখানে থাকার কথা সেখানেই রয়েছে। কায়েস অবশ্য বলে দিয়েছেন, গাড়ি নিয়ে মেইন রোডে না বেরুনো পর্যন্ত ভয় পাবার কোন কারণ নেই, কারণ তার আগে পর্যন্ত তাঁকে কাভার দেয়া হবে। পকেট থেকে সাদা সুতীর দস্তানাটা বের করলেন তিনি। এটা তাঁকে কায়েস দিয়েছেন।

এই মুহূর্তে প্রবল উত্তেজনা বোধ করছেন তিনি। মেইন রোডে সচল ট্রাফিকের মধ্যে রয়েছেন। সামনে পিছনে অনেক গাড়ি, সবগুলোর ওপর চোখ বুলাচ্ছেন। সিগন্যালে থামার পর নজর রাখছেন ফুটপাথের পথিকদের ওপর।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে পৌঁছুতে মাত্র তিন মিনিট লাগল তাঁর। এভিনিউটা নির্জন, সারি সারি গাছ দিয়ে ঘেরা। যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, বিল্ডিঙটা ছাড়িয়ে পঞ্চাশ গজ এগিয়ে গাড়ি থামালেন। অনুভব করলেন শরীরের সমস্ত পেশী টান টান হয়ে আছে। চারদিকে চোখ বুলালেন একবার। এভিনিউয়ের ওপারে এক বৃদ্ধা ক্যাপ পরানো পোষা কুকুরছানাকে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আরও খানিক সামনে থেকে তাঁর দিকে হেঁটে আসছে একজোড়া তরুণ-তরুণী, পরস্পরের হাত ধরে। ওরা গাড়ির পাশে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর দ্রুত বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করলেন, অনুসরণ করলেন ওদের। বিল্ডিঙটাকে পাশ কাটিয়ে গেল ওরা, ঘুরে গিয়ে দরজার দিকে এগোলেন সিনেটর।

অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে এন্ট্রি ফোন সিস্টেম আছে। সেটাকে আড়াল করে দাঁড়ালেন তিনি, দু'শো চার নম্বরের বোতামে চাপ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল বেলেন্ডা। যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে, স্পীকারে তিনি বললেন, 'আমি ডেভিড। পাঁচশো পাঁচ।' ক্লিক করে খুলে গেল দরজা।

পরম স্বস্তি বোধ করলেন সিনেটর, ভেতরে ঢুকে বন্ধ করলেন দরজা। তাঁর সামনে এলিভেটর। ডান দিকে সিঁড়ি। যেমন বলা হয়েছে, সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে এলেন। দু'শো চার নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন কায়েস, ডানহাতে ধরা পিস্তলটা সিলিঙের দিকে তাক করা। এক পাশে সরে গিয়ে সিনেটরকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিলেন তিনি, নিজে আরও দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলেন ওখানেই, কান পেতে আছেন।

মেয়েটা সেটীতে বসে আছে। সত্যি সুন্দরী সে। লম্বা, কালো চুল; চওড়া, গোলাপী মুখ; গাঢ় কফি রঙের চোখ। তবে তার পোশাক সম্মানী বা গুরুত্বপূর্ণ কোন ব্যক্তির মিসট্রেস হবার উপযুক্ত নয়। ডেনিম জিনস পরেছে সে, ডেনিম শার্টটা তাতে গোঁজা।

সোফা ছেড়ে উঠল না সে। এগিয়ে এসে কিছু বলতে যাবেন সিনেটর, লাল ঠোঁটে একটা আঙুল রাখল মেয়েটা। ঘাড় ফেরালেন সিনেটর, দেখলেন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে কান পেতে আছেন কায়েস। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা রেইনকোট পরে আছেন তিনি, সেটার সামনেটা ও দু'পাশ ফুলে আছে। অবশেষে সন্তুষ্ট হয়ে দরজা বন্ধ করলেন তিনি, হেঁটে ডাইনিং টেবিলের সামনে চলে এলেন। টেবিলের ওপর পিস্তলটা রেখে গা থেকে রেইনকোট খুলে ফেললেন। দেখা গেল একটা হারনেস তাঁর বুকটা ঢেকে রেখেছে। হারনেসে ক্লিপ দিয়ে আটকানো রয়েছে একটা শটগান। শটগানটা অদ্ভুত। এক জোড়া ব্যারেল ওপর দিকে, আরেক জোড়া নিচের দিকে। হারনেসের ডান দিকে রয়েছে অত্যন্ত ছোট একটা সাবমেশিন গান, বাঁটটা ভাঁজ করা। ওটার পাশে তিনটে স্পেয়ার ম্যাগাজিন, পাউচ থেকে উঁকি দিচ্ছে। অস্ত্রগুলো ক্লিপ মুক্ত করে টেবিলের ওপর রাখলেন তিনি। তারপর পিস্তলটা তুলে নিয়ে বাম বগলের নিচে শোল্ডার হোলস্টারে ভরলেন। সিনেটরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন মৃদু, বললেন, 'সো ফার, সো গুড।'

এতক্ষণে উঠে দাঁড়াল মেয়েটা।

কায়েস বললেন, 'মি. ডেভিড, ও বেলেন্ডা। বেলেন্ডা, উনি মি. ডেভিড।'

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে দিল বেলেন্ডা। করমর্দন করলেন সিনেটর। কি বলবেন বুঝতে পারছেন না, একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিকের জন্যে ব্যাপারটা অস্বাভাবিকই বলতে হবে। মৃদু হেসে হাতটা ছাড়িয়ে নিল বেলেন্ডা, এক কোণে দাঁড়ানো কেবিনেটের সামনে গিয়ে বলল, 'শুনেছি আপনি হুইস্কি আর সোডা পছন্দ করেন, মি. ডেভিড।'

কায়েসের দিকে তাকাল বেলেন্ডা, তিনি বললেন, 'না, আমার কিছু লাগবে না।'

বেলেন্ডার হাত থেকে গ্লাসটা নিচ্ছেন সিনেটর, কায়েস আবার মুখ খুললেন, 'ধীরে ধীরে চুমুক দিন, মি. ডেভিড। আগামী দু'ঘণ্টায় মাত্র তিন বার পাবেন।'

ফিরে এসে সেটীতে বসল বেলেন্ডা, কফি টেবিল থেকে মেয়েদের একটা ম্যাগাজিন নিয়ে পাতা ওল্টাতে শুরু করল। হাতে গ্লাস নিয়ে কায়েসের কাছে এসে দাঁড়ালেন সিনেটর। 'এরপর কি ঘটবে?'

'আমরা অপেক্ষা করব,' জবাব দিলেন কায়েস। 'জানতে হবে বড়শিটা গভীরে

গেঁথেছে কিনা।'

'কিভাবে জানব?'

টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করলেন কায়েস। অস্ত্রগুলোর পাশে কালো একটা মেটাল বক্স রয়েছে। এগুলো তিনি আর তাঁর দুই সহকারী সব সময় সঙ্গে রাখেন। বাক্সটার পাশে রয়েছে নোটপ্যাড ও পেন্সিল। 'ওটা সঙ্কেত দিলেই বুঝতে পারব আমরা।'

ওদিকে রেস্তোরাঁর ভেতর অস্থির শেখ রাশেদ প্রথমে মেন'স রুম চেক করলেন, তারপর এমনকি লেডিস রুমেও একবার উঁকি দিলেন। শেফের সঙ্গে কথা বললেন তিনি, ছুটে বেরিয়ে এলেন পিছনের দরজা দিয়ে। ওখানে তাঁর জন্যে ভাড়া করা একটা গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন আবীর মাহমুদ।

সিনেটর লক্ষ করলেন, তাঁর মতই বেলেন্ডা ও কায়েস চৌধুরীও একই ধরনের সাদা দস্তানা পরে আছেন। দ্বিতীয় বার গ্লাসটা শেষ করছেন তিনি, এই সময় কালো বক্স থেকে পিপ্ পিপ্ আওয়াজ বেরিয়ে এল। বিরতি ছাড়া কয়েক মিনিট বাজল ওটা, প্যাডে নোট নিচ্ছেন কায়েস। শব্দটা থামতে বোতামে চাপ দিলেন পাঁচবার, প্রতিবার বিরতি নিয়ে, প্রতিটি বিরতির মেয়াদ আলাদা। তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাসলেন তিনি। 'বড়শি খুব গভীরেই গেঁথেছে।'

এগিয়ে এসে প্যাডের দিকে তাকালেন সিনেটর। সারি সারি শুধু হরফ দেখা যাচ্ছে, এলোমেলোভাবে সাজানো। 'মোর্স কোড?' জানতে চাইলেন তিনি।

'না,' জবাব দিলেন কায়েস। 'এটা আমাদের নিজস্ব কোড।'

'এ-সবের অর্থ?'

দাঁড়ালেন কায়েস, আড়মোড়া ভাঙলেন, শোল্ডার হোলস্টার ঠিকঠাক করে নিলেন। 'অর্থ হলো,' বললেন তিনি, 'ফসেলা পরিবারের দুটো গাড়ি পজিশন নিয়েছে। একটা এভিনিউয়ে, ভেতরে তিনজন লোক, ফসেলাদের এক ভাই সহ। মি. আলেকজান্ডারের দেয়া ফটোর সাহায্যে তাকে চেনা গেছে। কোন সন্দেহ নেই, মোটা টাকা পাচ্ছে ওরা, তা না হলে পরিবারের লোক এভাবে ঝুঁকি নিতে রাজি হত না।' জানালার দিকে হেঁটে এলেন তিনি, সামান্য একটু পর্দা সরিয়ে এভিনিউয়ের দিকে তাকালেন। নিচু গলায় বললেন, 'এখান থেকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তবে জানি এখান থেকে চল্লিশ গজ বাঁয়ে আছে গাড়িটা। কালো একটা পন্টিয়াক। দেখতে পাচ্ছি না গাছের আড়ালে থাকায়। ব্যাক-আপ কার রাখা হয়েছে মোড়ে, ভেতরে একজন মাত্র লোক। ওটা অতিরিক্ত গাড়ি, প্রথমটায় যদি গোলযোগ দেখা দেয়। আয়োজনে কোন খুঁত নেই।'

'ওদের প্ল্যানটা কি হতে পারে?'

জানালার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের কাছে ফিরে এলেন কায়েস। 'তিনটে প্ল্যানের কথা ভেবেছি আমি, যে-কোন একটা হতে পারে,' বললেন তিনি। 'এভিনিউয়ের গাড়িটা আপনার গাড়ির কাছাকাছি রাখা হয়েছে। ওরা অপেক্ষা করতে পারে, গাড়িতে ওঠার সময় কিডন্যাপ করবে আপনাকে। কিংবা আপনি

যখন প্রবেশপথ থেকে বেরুবেন, গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসবে ওরা, ফুটপাথ ঘেঁষে থেমে লোকগুলোকে নামিয়ে দেবে।' হাসলেন তিনি। সিনেটরের মনে হলো, গোটা ব্যাপারটা দারুণ উপভোগ করছেন ভদ্রলোক। 'তবে আমাদের ধারণা, তৃতীয় প্ল্যানটাই কাজে লাগাবে ওরা।'

'কি সেটা?'

'এগারোটা বাজার দশ কি পনেরো মিনিট আগে, যখন আপনার বিল্ডিঙ থেকে বেরিয়ে যাবার কথা, সদর দরজা থেকে কয়েক গজ দূরে ঘুর ঘুর করবে এক লোক। সে একজন মাতাল হতে পারে, কিংবা ধোপ-দুরস্ত কাপড় পরা ব্যবসায়ীও হতে পারে, কারও ঠিকানা খুঁজছে। যে-ই হোক, তার বয়েস বেশি হবে না, সুস্থ-সবল তরুণ হতে বাধ্য। আপনার খুব কাছাকাছি চলে আসার চেষ্টা করবে সে। তারপর আপনাকে হয় জড়িয়ে ধরে রাখবে, নয়তো পিস্তল দেখিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখবে, যতক্ষণ না গাড়িটা পৌঁছায়।'

'তাহলে আমি কি করব?'

'আপনার করার কাজ একটাই,' জবাব দিলেন কায়েস। 'লোকটাকে কোন ভাবেই নিজের চার গজের মধ্যে আসতে দেবেন না। যে-ই দেখবেন অতটা কাছাকাছি চলে এসেছে, ঘুরে যাবেন আপনি, সোজা হাঁটা দেবেন দরজার দিকে। দরজা সামান্য খোলা থাকবে।'

'কিন্তু তার কাছে যদি অস্ত্র থাকে, যদি আমার পিঠে গুলি করে?'

মাথা নাড়লেন কায়েস। 'করবে না। আপনি ঘোরার এক সেকেন্ড পর মারা যাবে সে। আর তারপর ছোট্ট একটা যুদ্ধ হবে ওখানে। আপনি হলের ভেতর থাকবেন, যতক্ষণ না দরজায় সঙ্কেত পান।' ঝুঁকে টেবিলের ওপর আঙুলের গিঁট দিয়ে তিনবার টোকা দিলেন তিনি, বিরতি নিলেন, তারপর আবার তিন বার টোকা দিলেন। 'সঙ্কেত পেয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসবেন আবার।'

পায়চারি শুরু করলেন কায়েস, যদিও সারাক্ষণ টেবিল আর অস্ত্রগুলোর কাছাকাছি থাকছেন। আবার মুখ খুললেন তিনি, 'তবে দুই বা তিনজন লোকের হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাই নাকি? বলেন কি! আমাদের লোকই তো মাত্র ছ'জন, আবার বলছেন...'

'না,' বলে মাথা নাড়লেন কায়েস। 'আমাদের নয়, ওদের। দুটো গাড়িতে রয়েছে চারজন, একজন প্রবেশপথের মুখে ঘুর ঘুর করবে। হলো পাঁচজন। আমরা জানি আরও তিন কি চারজন আছে। তাদের মধ্যে একজন, নির্ঘাত বেস-এ আছে, সেটা যেখানেই হোক। কিন্তু বাকি দুই বা তিনজন কোথায়?'

'কোথায়?' সিনেটরের গলা থেকে প্রতিধ্বনি বেরিয়ে এল।

পায়চারি থামিয়ে কায়েস বললেন, 'ওরা যেহেতু অভিজ্ঞ, ব্যাক-আপ টীম রাখবেই। প্রশ্ন হলো, কোথায় হতে পারে সেটা? যুক্তি বলে, আপনার বাড়ির কাছাকাছি রাস্তায় হবারই বেশি সম্ভাবনা।' হাতঘড়ি দেখলেন। 'এগারোটা বাজার বিশ-পঁচিশ মিনিট আগে ওরা ওখানে পজিশন নেবে বলে মনে হয় না। জায়গাটা নির্জন, ঘুর ঘুর করতে গিয়ে কারও চোখে ধরা পড়তে চাইবে না। আপনার পাড়ার

প্রাইভেট কারগুলো সবই গ্যারেজে থাকে, রাস্তায় পার্ক করা হয় না। আমাদেরকে দেখতে হবে রাস্তার ধারে কোন্স গাড়ি পার্ক করা আছে কি না। সে যাই হোক, এখন আমরা একশো ভাগ নিশ্চিত যে এটা একটা "কিডন্যাপ" প্ল্যান, "কিল" প্ল্যান নয়।' বেলেন্ডার দিকে ফিরলেন তিনি। 'কফি খেতে চাইলে কিছু মনে করবে? আপনিও কি কফি খাবেন, সিনেটর?'

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ।'

কফি টেবিলে ম্যাগাজিন রেখে কিচেনে গিয়ে ঢুকল বেলেন্ডা।

'একশো ভাগ নিশ্চিত হন কিভাবে?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

ইঙ্গিতে জানালার বাইরেটা দেখালেন কায়েস। 'ওদের সেট-আপ দেখে। প্ল্যানটা যদি "কিল" হত, খুব বেশি হলে তিনজন লোক ব্যবহার করত ওরা। আসল কাজ অর্থাৎ গুলি করার জন্যে একজন, ব্যাক-আপ হিসেবে একজন, আরেকজন গাড়ি চালাবার জন্যে। এটা যে কিডন্যাপ কেস, কোন সন্দেহ নেই তাতে।' আবার হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'সোয়া দশটা বাজে, কাজেই পেশীতে একটু ঢিল দিন। শেষ হুইস্কিটুকু খেয়ে নিতে পারেন।'

'কফির সঙ্গে মিশিয়ে খাব,' বললেন সিনেটর।

হঠাৎ করে কালো বাক্সটা থেকে পিপ পিপ আওয়াজ বেরুতে শুরু করল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্যাডে নোট নিলেন কায়েস। তারপর বোতামে চাপ দিলেন দু'বার। সিধে হয়ে বললেন, 'জাস্ট রুটিন। কোন কিছুই বদলায়নি। কিছু যদি না ঘটে, দশ মিনিট পর পর রিপোর্ট করবে ওরা।'

হাতে ট্রে নিয়ে ফিরে এল বেলেন্ডা, ওঁদেরকে কফি পরিবেশন করল। নিজের কাপটা নিয়ে কেবিনেটের সামনে চলে এলেন সিনেটর, খানিকটা স্কচ ঢাললেন তাতে। কাপটা নিয়ে আবার ফিরে এলেন, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে তাকালেন অস্ত্রগুলোর দিকে। 'এখানে যথেষ্ট ফায়ার পাওয়ার দেখা যাচ্ছে,' মন্তব্য করলেন তিনি।

'হ্যাঁ,' সায় দিলেন কায়েস, কাটা শটগানে হাত বুলালেন। 'ক্লোজ রেঞ্জের জন্যে এত ভাল অস্ত্র সম্ভবত আর নেই।'

'সাবমেশিন-গানটা কি?' প্রশ্ন করলেন সিনেটর।

'ইনগ্রাম মডেল টেন। এটার সবচেয়ে ভাল দিক হলো সাইজ। লুকানো সহজ, অথচ রেট অভ ফায়ার খুব হাই। উজিই আমার পছন্দ, তবে এই কাজের জন্যে সেটা খুব বড় হয়ে যায়।'

অস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছেন ওঁরা, ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছে সময়। দশ মিনিট পর আবার কালো বাক্স থেকে সঙ্কেত বেরিয়ে এল। নোট না নিয়ে শুধু শুনলেন কায়েস, বোতামে দু'বার চাপ দিয়ে জবাব দিলেন। 'এবারও রুটিন,' বললেন তিনি, হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালেন। 'আরও আধ ঘণ্টা বাকি আছে।' আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

তিন

দশ মিনিট পর আবার সঙ্কেত এল, তবে সেটাও রুটিন। পাঁচ মিনিট পর আবার, এবার দু'মিনিট ধরে বাজতে থাকল, দ্রুত হাতে নোট নিচ্ছেন কায়েস। বোতাম টিপে পাল্টা জবাব দিলেন তিনি, সিনেটরের দিকে মুখ তুলে হাসলেন। 'ওদের ব্যাক-আপ টীমের সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'আপনার বাড়ি থেকে আধ মাইলটাক দূরে। ছোট একটা সাদা ট্রাকে রয়েছে ওরা। দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত আরও দু'জন পিছনে আছে।'

'কি করে বুঝলেন ওরাই?'

'কারণ দু'জন নিচে নেমে হুড খোলে, এঞ্জিন হাতড়াতে শুরু করে। দু'জনের মধ্যে একজন ফসেলা পরিবারের ছোট ছেলে।'

'এখন কি করবেন আপনারা?'

'ওদের ব্যবস্থা করা হবে,' নরম সুরে বললেন কায়েস। হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে বেলেন্ডার দিকে তাকালেন। 'আর পনেরো মিনিট বাকি।' শুনে মাথা ঝাঁকাল বেলেন্ডা, সেটী ছেড়ে বেডরূমে চলে গেল। দু'মিনিট পর নেভী ব্লু কোট পরে বেরিয়ে এল সে, হাতে একটা ছোট ব্যাগ। ব্যাগটা দরজার পাশে রেখে আবার ফিরে এসে সেটীতে বসল। এক মিনিট পর আবার কালো বাক্সটা পিপ পিপ করে উঠল। বেশ কিছুক্ষণ পর থামল সেটা, বোতামে পাঁচবার চাপ দিলেন কায়েস, তারপর সিনেটরের দিকে ফিরলেন। 'ও একজন পুলিস।'

'কে?'

'বিল্ডিঙের সামনে যাকে আমরা আশা করছি।'

'পুলিস!' সিনেটরের গলায় অবিশ্বাস।

'ফসেলা সৈনিকদের একজন, পুলিসের ছদ্মবেশ নিয়েছে।'

'কিভাবে জানছেন আপনারা?'

'এটা পুরানো একটা কৌশল,' বললেন কায়েস। 'ইটালিতে রেড ব্রিগেড ব্যবহার করত, গোটা সেন্ট্রাল আর দক্ষিণ আমেরিকার রাইট-উইং হিট স্কোয়াডও ব্যবহার করত। মানুষ পুলিসকে সন্দেহ করে না।'

'কিন্তু আপনারা পুরোপুরি নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে?'

কাঁধ ঝাঁকালেন কায়েস। 'ও একটা গাছের পাশে ঘুর ঘুর করছে, প্রবেশপথ থেকে দশ গজ দূরে ছায়ার ভেতর। ওখানে আড়াল নেয়ার কারণ, সত্যিকার কোন পুলিস এ-পথে যাবার সময় তাকে যাতে দেখে না ফেলে। গাছটার কাছাকাছি থাকছে, প্রয়োজনে যাতে ওটার পিছনে লুকাতে পারে। চিন্তা করবেন না, লোকটা ফসেলাদের একজন সৈনিক।' কাটা শটগানটা তুলে নিলেন তিনি, নিজের হারনেসে ক্লিপ দিয়ে আটকালেন, চারটে ভোঁতা ব্যারেল নিচের দিকে মুখ করা। একই ভাবে

আটকালেন এসএমজি। গায়ে রেইনকোট চড়ালেন, তবে বোতাম লাগালেন না। অস্ত্রগুলোর গায়ে ঝুলে থাকল ওটা, আড়াল করে রেখেছে।

'এখন কি হবে?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'চলুন, ঝামেলাটা সেরে ফেলা যাক,' বললেন কায়েস। 'দরজা দিয়ে হেঁটে বেরিয়ে যাবেন আপনি। চৌকাঠ থেকে তিন কদম এগোবেন, তারপর থেমে রাতের ঠাণ্ডা বাতাস ভরবেন ফুসফুসে। পুলিস লোকটা আপনার দিকে এগিয়ে আসবে, এগিয়ে আসার সময় কিছু বলবে। কি বলছে শোনার ভঙ্গি করবেন। যখন দেখবেন আপনার চার গজের মধ্যে চলে এসেছে, জোর গলায় বলবেন, "ধুত্তোরি, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি"। ঘুরবেন, দ্রুত পায়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন হলে। ওখানে আপনি সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত বেলেন্ডার সঙ্গে থাকবেন।' আরেকবার টেবিলে টোকা দিলেন—তিনবার, বিরতি, তারপর আরও তিনবার।

'বেলেন্ডা আমাদের সঙ্গে থাকছে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'কিছু দূর। আপনি ওকে বিদায় জানাবেন হলে।' কামরার চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন কায়েস, দেখে নিচ্ছেন কিছু ফেলে যাচ্ছেন কিনা। হাতঘড়ির ওপর চোখ রেখে কালো বাক্সটার বোতামে আঙুল রাখলেন। আঙুলটা পাঁচ সেকেন্ড থাকল ওখানে। তারপর বাক্সটা তুলে রেইনকোটের পকেটে ভরলেন। সিনেটরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চলুন।'

হলে নেমে এসে বেলেন্ডাকে ইশারা করলেন কায়েস। এক ধারে সরে গিয়ে ব্যাগটা পায়ের কাছে নামিয়ে রাখল সে। তাকে নার্ভাস দেখাচ্ছে। সিনেটরও উত্তেজিত।

রেইনকোট ফাঁক করলেন কায়েস, ক্লিপ খুলে কাটা শটগানটা বাঁ হাতে নিলেন। এগিয়ে এসে দরজার পাশে দাঁড়ালেন তিনি, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে সিনেটরের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন,'আপনি রেডি?'

বড় করে শ্বাস টানলেন সিনেটর, কথা না বলে মাথা ঝাঁকালেন।

'দরজা খুলে বেরিয়ে যান তাহলে।' শটগানের ব্যারেল নেড়ে দরজাটা দেখিয়ে দিলেন কায়েস। হালকা, শান্ত সুরে কথা বলছেন তিনি, 'তাড়াহুড়ো করবেন না। দেখে যেন স্বাভাবিক মনে হয়।'

আরও একবার বড় করে শ্বাস নিলেন সিনেটর, তারপর দরজার দিকে এগোলেন। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন তিনি। দ্রুত বাঁ দিকে তাকালেন একবার, দেখলেন প্রায় চল্লিশ গজ দূরে একটা গাড়ি পার্ক করা রয়েছে। তাঁর নিজের গাড়িটা ঠিক ওটার সামনে। ওদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, শুনতে পেলেন একটা এঞ্জিন স্টার্ট নিল। তাঁর ডান দিকের ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লোকটা, পরনে পুলিসের ইউনিফর্ম। তরুণ সে, বেশ লম্বা, গায়ের রঙ তামাটে।

'ইভনিং,' চড়া গলায় বলল সে। 'আপনি কি এই বিল্ডিঙের বাসিন্দা?' ধীর পায়ে হেঁটে আসছে সে, মুখে অমায়িক হাসি। কথা বললেন না সিনেটর, শুধু তাকিয়ে আছেন আর দূরত্বটা আন্দাজ করছেন। আট গজ।

'এখানে সামান্য একটু ঝামেলা হয়েছে,' পুলিস বলল।

ছয় গজ।

'সেজন্যেই ওখানে আমি গা-ঢাকা দিয়ে ছিলাম।'

চার গজ।

'ধুত্তোরি, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি,' বলেই ঘুরে গেলেন সিনেটর। দরজার দিকে মাত্র এক পা ফেলেছেন, ভোঁতা একটা আওয়াজ পেলেন পিছন থেকে। কংক্রিটের সঙ্গে চাকার তীব্র ঘষা লাগার আওয়াজও ঢুকল কানে, ইতিমধ্যে দরজার গায়ে হাত দিয়ে কবাট খুলে ফেলেছেন তিনি। ঘুরলেন না, কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে ঝট করে একবার তাকালেন। দেখলেন পুলিস লোকটা ফুটপাথের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, পা দুটো নড়ছে, মোচড় খাচ্ছে শরীর।

হলে ঢুকে পড়লেন সিনেটর। মাথা নিচু করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন কায়েস, মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'দরজা বন্ধ করুন।'

প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল কালো গাড়িটা, ছিটকে বেরিয়ে আসছে দু'জন লোক। একজন সামনে থেকে, আরেকজন পিছন থেকে।

চারটে ব্যারেল থেকেই গুলি করলেন কায়েস। পিছনের লোকটা গাড়ির গায়ে আছাড় খেলো। সামনের লোকটাকে এক ঝাঁক বুলেট তুলে নিয়ে গেল হুডের মাথায়। শটগান ছেড়ে দিলেন কায়েস, হারনেসের সঙ্গে ঝুলে পড়ল সেটা। আধ সেকেন্ডের মধ্যে তাঁর হাতে সাবমেশিন-গানটা চলে এসেছে। গাড়ির এঞ্জিন খকখক করছে, দু'পশলা গুলি করলেন তিনি। দুই পশলা গুলিই টায়ার লক্ষ্য করে করা হয়েছিল, দুটোই লক্ষ্যভেদ করল। লাফ দিয়ে নেমেই ছুটল ড্রাইভার। ঘাড় ফিরিয়ে আরেক দিকে তাকালেন কায়েস। ডান দিকের মোড় থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে।

মাত্র পনেরো গজ এগোতে পারল ড্রাইভার, এক পশলা বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তার পিঠ, ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে গেল সে।

সামনের একটা বিল্ডিঙ থেকে নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল। তারপর কোথাও আর কোন শব্দ নেই। রেইনকোটের পকেটে হাত ভরে কালো বাক্সের বোতামে দ্রুত পরপর তিনবার চাপ দিলেন কায়েস।

একবার মাত্র পিপ করে উঠল বাক্সটা। চার সেকেন্ড পর সাদা একটা লিংকন কন্টিনেন্টাল মোড় ঘুরে এগিয়ে এল বিল্ডিঙটার দিকে। দরজার দিকে ফিরলেন কায়েস।

হলের ভেতর থেকে কবাটে টোকা মারার আওয়াজ শুনলেন সিনেটর। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুললেন তিনি। ফুটপাথে পুলিসের লাশ দেখলেন সিনেটর। সামনের রাস্তায় আরও দু'জন লোক পড়ে আছে। একটু দূরে অচল একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, খানিক সামনে আরও একটা লাশ। সাদা লিংকন দাঁড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভিং সীটে বসে আছেন শেখ রাশেদ। পিছন দিকে হাত লম্বা করে ব্যাক ডোরটা খুলে দিলেন তিনি। এই মুহূর্তে কায়েসের ডান হাতে রয়েছে এসএমজি, অ্যাভিনিউয়ের ওপর দ্রুত চোখ বুলাচ্ছেন তিনি। বললেন, 'আপনারা দু'জন পিছনের সীটে বসুন।'

ছুটে ফুটপাথ পেরুলেন সিনেটর, তাঁকে অনুসরণ করল বেলেন্ডা। এক পাশে সরে গিয়ে বেলেন্ডাকে আগে উঠতে দিলেন সিনেটর। বেলেন্ডা প্রথমে হাতের ব্যাগটা গাড়ির ভেতর ছুঁড়ে দিল, তারপর সেটার পিছনে ডাইভ দিল। গাড়িতে উঠে

দরজা বন্ধ করলেন সিনেটর।

তিন সেকেন্ড পর ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসলেন কায়েস, গাড়ি ছেড়ে দিলেন রাশেদ।

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললেন না। মাইলখানেক আসার পর সিনেটর জিজ্ঞেস করলেন, 'মোড়ে ব্যাক-আপ কারের কি হবে?'

জবাব দিলেন রাশেদ, 'মাহমুদ সেটার ব্যবস্থা করেছে।'

ওদের পিছন থেকে সাইরেনের আওয়াজ ভেসে এল। কায়েস তাঁর কালো বাক্সের বোতামে বার কয়েক চাপ দিলেন, জবাবও পেলেন। আরও মাইল খানেক এগিয়ে খোলা একটা পার্কিং লটে থামল গাড়ি। খালিই বলা যায়, মাত্র দুটো গাড়ি রয়েছে, পাশাপাশি পার্ক করা। একটা সবুজ ডাটসান, অপরটা কালো ফোর্ড। ডাটসানের ড্রাইভিং সীটে একজন লোককে দেখা গেল।

'এখানে আমরা গাড়ি বদল করব,' বললেন কায়েস। 'এবং বেলেন্ডাকে গুডবাই বলব।'

সবাই ওঁরা লিংকন থেকে নেমে পড়লেন। তাড়াহুড়ো করে তিনজনের গালেই চুমো খেলো বেলেন্ডা, তারপর ডাটসানের ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জার সীটে উঠে বসল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিল ড্রাইভার।

গাড়িটার দিকে তাকিয়ে সিনেটর সকৌতুকে বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

কায়েস বললেন, 'ফোর্ডের ব্যাক সীটে উঠুন, সিনেটর। ব্যাপারটা এখনও শেষ হয়নি।'

সিনেটর গাড়িতে ওঠার পর হুইলের পিছনে বসলেন রাশেদ, তাঁর পাশে বসলেন কায়েস। সিনেটরের বাড়ির দিকে রওনা হলো গাড়ি।

প্রায় এক মাইল এগিয়ে ফুটপাথের কিনারায় দাঁড়িয়ে পড়ল ফোর্ড। আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘড়িতে সময় দেখলেন রাশেদ। এগারোটা বেজে বারো মিনিট। চুপচাপ বসে থাকলেন ওঁরা। নিস্তব্ধতা ভাঙলেন সিনেটর। 'কি হলো? গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কেন?'

রাশেদ একটা হাত তুললেন। 'স্রেফ অপেক্ষা করুন, সিনেটর। দু'মিনিট।'

সিনেটর আর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর একটা গাড়ি এসে থামল ফোর্ডের পিছনে। দেখার জন্যে ঘাড় ফেরালেন সিনেটর। খোলা, তোবড়ানো একটা জীপ। একজনই লোক রয়েছে, আগে কখনও তাকে তিনি দেখেননি। জীপের আলো দু'বার জ্বলল আর নিভল। এবার রাশেদ ফোর্ডের আলো জ্বাললেন, ছেড়ে দিলেন গাড়ি। জীপটা অনুসরণ করল।

গত কয়েক মিনিট যা ঘটেছে চিরকাল তা মনে থাকবে সিনেটরের। তবে এরপর এখন যা ঘটতে যাচ্ছে তা তাঁর মনের গভীরে গাঁথা হয়ে যাবে।

বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে তীক্ষ্ণ একটা বাঁক আছে রাস্তায়। বাঁকটা যখন দু'শো গজ দূরে, কায়েসের পকেটের ভেতর কালো বাক্সটা বেজে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির স্পীড কমিয়ে একপাশে সরে এলেন রাশেদ। সগর্জনে ওদেরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল জীপ। আবার স্পীড বাড়ালেন রাশেদ, সত্তর গজ পিছনে থেকে

জীপটাকে অনুসরণ করছেন। 'কি ঘটে দেখুন,' কাঁধের ওপর দিয়ে সিনেটরকে বললেন তিনি।

কায়েস আর রাশেদের মাঝখানে মাথা গলালেন সিনেটর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে বাইরে তাকালেন। গাড়ি বাঁক ঘুরছে, রাস্তার একধারে সাদা ট্রাকটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন তিনি। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক, রাস্তা বরাবর তাকিয়ে গাড়ি দুটোকে আসতে দেখছে। ট্রাকটা যখন পঞ্চাশ গজ দূরে, স্পীড কমে গিয়ে রাস্তার পাশে সরে যেতে শুরু করল জীপ। ব্যাক সীট থেকে খাড়া হলো একটা মূর্তি, কালো কাপড় পরা। মূর্তির হাত দুটো কাঁধে ধরে আছে মোটা একটা টিউব—প্রায় সাড়ে চার ফুট লম্বা। টিউবের সামনেটা ব্যাঙের ছাতার মত দেখতে। টিউবের পিছন থেকে হলুদ-সাদা শিখা বিস্ফোরিত হলো। সিনেটর দেখলেন ছাতা আকৃতির সামনের অংশটা যেন স্লো-মোশনে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে টিউব থেকে, তারপর হঠাৎ প্রবল গতিতে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটল। সোজা গিয়ে ট্রাকে আঘাত করল, দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার কাঁধ থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূরে।

ট্রাকের একটা পাশ খাড়া হয়ে যাচ্ছে, এই সময় বিস্ফোরণের ধাক্কাটা অনুভব করলেন সিনেটর। ফোর্ডের স্পীড একদম কমিয়ে ফেলেছেন রাশেদ। ওঁদের চোখের সামনে অগ্নিকুণ্ড হয়ে উঠল ট্রাক, একটা কি দুটো গড়ান দিয়ে স্থির হলো, চিত হয়ে আছে। যে লোকটা পাশে দাঁড়িয়ে ছিল সে এখন ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। নড়ছিল না, তবে হঠাৎ ঝাঁকি খেতে শুরু করল। চোখ ফিরিয়ে রাস্তার ওপর তাকালেন সিনেটর। জীপটা দাঁড়িয়ে পড়েছে আগেই, পিছনের লোকটার হাতে এখন একটা সাব-মেশিনগান দেখা যাচ্ছে। পুরো একটা ম্যাগাজিন খালি করল সে, মাজল ফ্ল্যাশ দেখতে পেলেন সিনেটর। ঘাসের ওপর পড়ে থাকা লোকটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। জীপের পিছনে লোকটা মাথা নামিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সচল হলো জীপ, দ্রুত চলে গেল।

ধপাস করে সীটে হেলান দিলেন সিনেটর, বিড়বিড় করে বললেন, 'আই নিড আ স্কচ।'

হেসে উঠে রাশেদ বললেন, 'আপনার তা পাওনা হয়েছে, মি. ডেভিড।'

জ্বলন্ত আবর্জনাকে পাশ কাটিয়ে এলেন ওঁরা, স্বাভাবিক গতিতে সিনেটরের বাড়ির দিকে যাচ্ছেন।

কায়েস বললেন, 'আপনি খুব ভাল করেছেন, মি. ডেভিড। শুনুন, বাড়িতে পৌঁছেই আপনার বন্ধু মি. আলেকজান্ডারকে ফোন করে বলবেন তিনি যেন আপনার জন্যে নরমাল সিকিউরিটি কাভার-এর ব্যবস্থা করেন—জাস্ট নরমাল। ফসেলা পরিবার শেষ হয়ে গেছে। যা ঘটে গেল, এরপর আর কেউ আপনাকে নিয়ে কোন চুক্তি করবে না।'

'ডেট্রয়েটে ওদের আরেক ভাই আছে না?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর। 'সে প্রতিশোধ নিতে পারে।'

সামনে বসা দুই ভদ্রলোকই হেসে উঠলেন। রাশেদ বললেন, 'সেই বড় ভাই, মোরো ফসেলা। মোরো ফসেলা মরা মানুষ, সিনেটর, আপাতত চলাফেরা করছে। পরিবারের ব্যবসায়িক নীতি সেই নির্ধারণ করে। আজ থেকে দুই কি তিন দিন পর

সে-ও লাশ হয়ে যাবে, বাকি দুই ভাইয়ের মত।'

'আপনারা তাকে…'

'না, আমরা নই, মি. রানা।'

'মি. রানা!'

'হ্যাঁ। তিনি সম্ভবত ইতিমধ্যেই এখান থেকে রওনা হয়ে গেছেন।'

'এখান থেকে? মি. রানা আমেরিকায়?'

কায়েস বললেন, 'অবশ্যই। জীপের পিছনে ওঁকে আপনি দেখেছেন। আরপিজিসেভেন ওর হাতে খুব মানিয়ে যায়। রাশেদ ঠিকই বলছে, মোরো ফসেলা একটা জ্যান্ত লাশ।'

বাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন আবীর মাহমুদ। সদর দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর পাশে এক লাইনে তিনটে ব্যাগ। গাড়ি থেকে নামছেন ওঁরা, কায়েসকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাক-আপ টীম?'

'খতম,' নিঃশব্দে হেসে জবাব দিলেন কায়েস। 'তুমি সবগুলো ছারপোকা সরিয়ে নিয়েছ তো?'

'হ্যাঁ।'

সিনেটরের দিকে ফিরলেন কায়েস। 'আমরা আর ঝামেলা করব না। আপনার সঙ্গে ও আপনার হয়ে কাজ করে বড় আনন্দ পেলাম।'

'আমারও অভিজ্ঞতার ঝুলি ভারি হলো,' উত্তর দিলেন সিনেটর। 'কিন্তু মি. লীকে কি বলব আমি? উনি তো এক লাখ প্রশ্ন করবেন আমাকে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন কায়েস। 'সত্যি কথাই বলুন। কাভারকে ফাঁকি দিয়ে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তারপর একটা মব ওঅর-এর মাঝখানে পড়ে যান।'

'উনি বিশ্বাস করবেন না।'

ব্যাগ তিনটে ফোর্ডের ট্রাংকে ভরে নিয়েছেন রাশেদ। ফিরে এসে সহাস্যে বললেন, 'কিন্তু ঘটেছে তো ঠিক তাই। কাল সকালের কাগজে সব লেখা হবে—ডেনভার সিটিতে দাঙ্গাবাজদের যুদ্ধ।'

'রিপোর্টে আমার নামটা না থাকলেই হয়,' বিড়বিড় করলেন সিনেটর।

তাঁর সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রয়েছেন রানা এজেন্সির এজেন্টরা। 'থাকবে না,' মাহমুদ বললেন। 'যারা জানত আপনি ওখানে ছিলেন তারা হয় মারা গেছে, নয়তো আমেরিকা ছেড়ে পালাতে চেষ্টা করছে। আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, মি. ডেভিড।'

'ব্যাপারটা তাহলে মিটে গেছে?'

'হ্যাঁ,' বললেন কায়েস। 'এখন আপনি এক ঢোক স্কচ খেয়ে মি. আলেকজান্ডারকে ফোন করুন।'

এরপর একে একে তিনজনই এগিয়ে এসে সিনেটরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ওঁরা। আর কোন কথা হলো না, নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে উঠে পড়লেন ফোর্ডে।

*

পরদিন কাগজে খবরটা ছাপা হলো। খবরের সঙ্গে লাশ ও বুলেটে ঝাঁঝরা গাড়িগুলোরও ছবি থাকল। তবে সিনেটরের নাম কোথাও উল্লেখ করা হয়নি।

চারদিন পর ফসেলা পরিবারকে নিয়ে রিপোর্ট ছাপা হলো। মোরো ফসেলা তার দুই ভাইকে কবর দিচ্ছিল। অন্ধকার জগতের রাজা-মহারাজারা ভিড় করেছিল অনুষ্ঠানটায়—লম্বা কালো মার্সিডিজ সংখ্যায় এত বেশি যে গুণে শেষ করা যায় না। প্রত্যেকে দামী পুষ্পস্তবক নিয়ে এসেছে। দুটো পাশাপাশি কবরে লাশগুলো সবে নামানো হয়েছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল মোরো ফসেলা, হাতে বড়সড় একটা পুষ্পস্তবক। কবরের ভেতর ঝুঁকে কফিন দেখছিল সে, এই সময় একটা মার্কারি-টিপড এইটএমএম বুলেট তার শিরদাঁড়ার মাঝ বরাবর আঘাত করল। বুলেটটা তার শরীরের ভেতর বিস্ফোরিত হয়, চওড়া কবরের ভেতর পড়ে যাবার আগেই মারা যায় সে।

পুলিস ধারণা করছে কাছাকাছি একটা উঁচু বিল্ডিঙের ছাদ থেকে ছোঁড়া হয়েছে গুলিটা, কবর থেকে সেটার দূরত্ব তিনশো পঞ্চাশ গজের কম নয়। এত দূর থেকে এভাবে লক্ষ্যভেদ করা শুধু একজন দক্ষ স্নাইপারের পক্ষেই সম্ভব।

চার

দু'দিন ব্রাসেলসে থাকল রানা, বটলনেক টু-র সঙ্গে আলোচনা করল। ওর বিশ্বাস জন্মাল, লোকটা বাপের মতই দক্ষ হতে যাচ্ছে। ভেনিস ও বেলগ্রেড, দু'জায়গার সেফ হাউসেই মেশিনারি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। রানা প্রথমে তাকে তিনটে গর্তের কথা বলেছিল, পরে জাগরেবকে বাদ দেয়া হয়। তার বদলে এখন স্প্লিটে একটা সেফ হাউস চাইছে ও। বসনিয়ায় যেহেতু যুদ্ধ বিরতি চলছে, সারায়েভো থেকে বেলগ্রেড যাওয়া কঠিন হবে না। বটলনেক টু বলল, স্প্লিটে সেফ হাউস পেতে হলে তিন হপ্তা অপেক্ষা করতে হবে রানাকে। রানা জানাল, খুব বেশি হলে দু'হপ্তার ভেতর কাজটা সারতে হবে তাকে। খানিক চিন্তা করে রাজি হয়ে গেল লোকটা।

এখন মাঝরাত, ন্যানির আস্তানায় ওর জন্যে বরাদ্দ কামরাটায় শুয়ে রয়েছে রানা, সিএনএন-এর খবর পড়া দেখছে। কাল সকালে গোজোয় ফিরে যাবে ও।

টিভি বন্ধ করার জন্যে রিমোট কন্ট্রোলের দিকে হাত বাড়াতে যাবে, দরজায় নক হলো। টিভি বন্ধ করল রানা, বেডসাইড টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিল, গলা চড়িয়ে বলল, 'কে?'

দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল বেলেন্ডা। কাপড়চোপড় দেখে বোঝা গেল এইমাত্র বাইরে থেকে ফিরেছে সে। মৃদু হেসে পিস্তলটা আগের জায়গায় রেখে দিল রানা। দরজা বন্ধ করল বেলেন্ডা, হেঁটে এসে বিছানার কিনারায় বসে পড়ল, কোন রকম সঙ্কোচ করল না। হাসছে।

'কখন ফিরলে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঘণ্টা দুই আগে।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে একটু উঁচু হলো রানা। 'তুমি কিছু বলতে চাও আমাকে?'

'আপনার পরামর্শ মত ছুটি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম,' বলল বেলেন্ডা। 'বেড়াতে গিয়ে একটা সমস্যা হয়েছে।'

'সমস্যা হয়েছে? কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে?'

'ফ্লোরিডায়···চারদিন ছিলাম। আপনি আমাকে বিশ হাজার করে দু'বারে চল্লিশ হাজার ডলার দিয়েছেন, এই চারদিনে খরচ করতে পেরেছি মাত্র দেড় হাজার ডলার।'

'এটাই তোমার সমস্যা?' হেসে ফেলল রানা।

'আংশিক,' বলল বেলেন্ডা। 'আমার নয়, আমাদের।'

'আমাদের?'

'হ্যাঁ, আমাদের। ম্যাককে তো আপনি চেনেনই, এক সময় মার্সেনারি ছিল। শুনেছি আপনার মাধ্যমে অনেক ন্যায়-যুদ্ধে লড়েছে ও। সেজন্যেই বোধহয় আপনার খুব ভক্ত। এখন সে বার-এর ওয়েটার। ফ্লোরিডায় যাবার সময় সে-ই আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিতে নিয়ে যায়। হঠাৎ কি হলো, ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, সে-ও আমার সঙ্গে যাবে। ম্যাক অনেক দিন থেকে আমার পিছনে লেগে আছে। যদিও···যদিও···'

'দ্বিধা করছ কেন, বলে ফেলো।'

'কিন্তু সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোনদিন আমার সঙ্গে শুতে চায়নি সে।'

'ঠিক কি বলতে চাইছ?'

'ম্যাক সত্যি আমাকে ভালবাসে,' বলল বেলেন্ডা। 'আগেই সেটা আমি উপলব্ধি করেছিলাম। গত চারদিনে নতুন একটা জিনিস বুঝেছি—আমিও তাকে ভালবাসি।'

নিঃশব্দে হাসছে রানা। 'সে এখন কোথায়?'

'বার-এ কাল থেকে কাজ শুরু করবে আবার।'

'তারপর?'

গম্ভীর হয়ে গেল বেলেন্ডা। 'এ বিষয়েই আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইছি আমি। এয়ারপোর্ট থেকে ন্যানিকে আমি ফোন করেছিলাম, উনি বললেন কাল সকালে আপনি চলে যাবেন, তাই এত রাতে দেখা করতে এসেছি।'

বিছানার ওপর উঠে বসল রানা, হাসি চেপে বলল, 'ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস মনে হচ্ছে। তুমি আমাকে অনায়াসে সব কথা বলতে পারো, বেলেন্ডা।'

খানিক ইতস্তত করে বেলেন্ডা বলল, 'ব্যাপারটা ম্যাক আর আমাকে নিয়ে।'

'সে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

কাঁপা কাঁপা হাসি ফুটল বেলেন্ডার ঠোঁটে। 'হ্যাঁ···দেখুন, ফ্লোরিডায় যাবার পর আমরা অনেক কথা বললাম।'

'শুধুই কথা বললে?'

বেলেন্ডার মুখে চওড়া হলো হাসিটা। 'মানে, বেশিরভাগ সময় আর কি। ম্যাক

সিদ্ধান্ত নিল চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে কিছু একটা করবে। আমি তাকে বললাম, আমিও নিজে কিছু করতে চাই। বহুদিন ধরে টাকা জমাচ্ছে সে, এখন তার একটা পুঁজি হয়েছে। আমারও টাকা আছে, আপনি আমাকে দান করেছেন··· ।'

বাধা দিল রানা, 'আমি তোমাকে একটা পয়সাও দান করিনি। প্রতিটি পয়সা তুমি রোজগার করেছ। এবার বলো, তোমাদের প্ল্যানটা কি?'

মন ভাল হয়ে গেছে বেলেন্ডার, মৃদু স্বরে বলল, 'আমরা ভাবছি ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁ ও বার খুলব। বার চালাবে ম্যাক, আর আমি রেস্তোরাঁটা দেখব···মানে রাঁধব, পরিবেশন করব··· ।'

'তুমি রাঁধবে?' রানার চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল।

'কি ভেবেছেন, আমি রাঁধতে জানি না? একদিন আপনাকে রেঁধে খাওয়াব, দেখবেন ভুলতে পারবেন না। আমি আমার দাদী-মার কাছে রান্না শিখেছি।'

একটা হাত তুলল রানা। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কোথায়?'

'এখানে, ব্রাসেলসেই। বাজারের কাছাকাছি একটা দোকান বিক্রি হবে, জানি আমি। খুব ভাল জায়গা। এক বৃদ্ধ দম্পতি চালায়, অবসর নিতে যাচ্ছে···'

'সমস্যাটা কি?'

'সমস্যা একটা নয়, দুটো।'

'কি রকম?'

'ন্যানির কাছে অনেক বছর চাকরি করছে ম্যাক,' বলল বেলেন্ডা। 'ম্যাককে সাঙ্ঘাতিক বিশ্বাস করেন ন্যানি। সে চাকরি ছেড়ে দেবে শুনলে আমাকে তিনি দায়ী করবেন, বলবেন আমি তাকে ভাগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

'দ্বিতীয় সমস্যাটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সেটাও ন্যানিকে নিয়ে। ন্যানি যখন কোন মেয়েকে কাজ দেন, শর্ত থাকে অন্তত একবছর তাঁর কাছে থাকতে হবে। অথচ এখানে আমি মাত্র পাঁচ মাস হলো এসেছি। এই শহরে অত্যন্ত প্রভাব রাখেন ন্যানি, তাঁকে অসন্তুষ্ট করে ব্যবসা করা তো দূরের কথা, এখানে আমি টিকতেই পারব না।'

'তুমি চাও বিষয়টা নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলি আমি?'

ম্লান মুখে মাথা ঝাঁকাল বেলেন্ডা।

'ঠিক আছে, বলব।'

'শুধু কথা বললে হবে না, সমস্যাগুলো আপনি সমাধান করে দেবেন,' বেলেন্ডার গলায় জেদ ও আবদার, দুটোই প্রকাশ পেল। 'কারণ এই যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, এর জন্যে আপনিও আংশিক দায়ী।'

'আমি দায়ী? কিভাবে?'

'ব্যবসা করতে যে টাকা লাগে তা জমাতে হলে এখানে বা অন্য কোথাও বিশ-পঁচিশ বছর কাজ করতে হত আমাকে,' বলল বেলেন্ডা। 'ততদিনে আমি বুড়ি হয়ে যেতাম, সুন্দর জীবনে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষাটাও বোধহয় ততদিনে মরে যেত। আমি বলতে চাইছি আপনি টাকাটা দেয়ায় অসম্ভবকে সম্ভব করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সেজন্যে আপনিই দায়ী।'

'বারবার এক কথা বোলো না তো,' প্রতিবাদ করল রানা। 'টাকাটা সত্যি তুমি

রোজগার করেছ। শোনো, কাল সকালে যাবার আগে ন্যানির সঙ্গে আমি কথা বলব। কথা দিচ্ছি, কোন সমস্যা হবে না। খুশি? এবার যাও, আমাকে ঘুমাতে দাও।'

রানার হাতটা ধরতে সাহসের প্রয়োজন হলো বেলেন্ডার। একবার মাত্র মৃদু চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল সেটা। 'আপনাকে আমি কতটুকু শ্রদ্ধা করি, বলে বোঝানো যাবে না। আপনি দোয়া করবেন, আমরা যেন সুখী হই।' বিছানার কিনারা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে, ধীর পায়ে বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে।

কর্নেল পেত্রোভিচের ফোন পাবার দশ মিনিট পরই অফিস ত্যাগ করলেন মেলানজিক বেলোভিচ। ব্যস্ততার সঙ্গে আয়োজন করা হলো সশস্ত্র গার্ড বোঝাই কয়েকটা জীপের একটা কনভয়। নির্দেশ দেয়া হলো কাপড়চোপড়, নির্দিষ্ট কয়েকটা ফাইল আর তাঁর ম্যাকিনটশ কম্পিউটর নিয়ে আসার। কনভয়ে তাঁর বুলেট-প্রুফ মার্সিডিজের সামনে থাকবে দুটো জীপ, পিছনেও তাই।

বেলগ্রেড থেকে শহরতলিতে বেরিয়ে আসার পর শান্ত মনে পরিস্থিতিটা বুঝতে চেষ্টা করলেন মেলানজিক। সন্ত্রাস সৃষ্টিতে পৃথিবীর অন্যতম সেরা একজন এক্সপার্ট তিনি, সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে জানেন বৈকি। পরিণত বয়েস থেকে সারাটা জীবন চরম সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে তাঁকে। যে-কোন মুহূর্তে একটা বুলেট বা একটা বোমা ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে, এই ভয় নিয়ে বেঁচে থাকতে শিখেছেন তিনি।

তবে এখনকার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। কি রকম আলাদা তা তিনি ব্যাখ্যা করতে পারবেন না, তবে ফোনে কর্নেল পেত্রোভিচ সংক্ষেপে ব্রিফ করার সময় অনুভব করছিলেন তাঁর সারা শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেছে। তাঁর অনুভূতি অনেকটা অন্ধকার ও বন্ধ ঘরে আটকা পড়া সেই লোকটার মত, যে জানে বিষাক্ত একটা সাপ তার খুব কাছাকাছি ফণা তুলে আছে। কাজেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জেনারেল কমান্ডের ট্রেনিং ক্যাম্পে যাবেন। ওখানকার সিকিউরিটি বেলগ্রেডে তাঁর হেডকোয়ার্টারের চেয়ে অনেক ভাল।

কনভয় ছুটছে, ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা করছেন মেলানজিক। আত্মরক্ষার কৌশল হিসেবে যে আক্রমণ করা সবচেয়ে ভাল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কাকে বা কোথায় আক্রমণ করবেন তিনি? প্রথমে বলা হলো ইমরুল হাসান মারা গেছে। তারপর জানা গেল, তার আসল নাম মাসুদ রানা, এবং সে বেঁচে আছে। এখন জানা যাচ্ছে, সে একা নয়, তাকে সাহায্য করার বহু লোক আছে, সবাই তারা দক্ষ ও বিপজ্জনক।

সন্ধের খানিক আগে ক্যাম্পে পৌঁছুল কনভয়। ক্যাম্প কমান্ডার, মেলানজিকের ছেলে সের্গেই গোরাজদিক বেলোভিচ, গেটের ভেতর অপেক্ষা করছিল। বাপকে আলিঙ্গন করল সে, জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, বাবা?'

হাসিমুখে কাঁধ ঝাঁকালেন মেলানজিক, ছেলের গালে হাত বুলালেন, বললেন, 'কিছু না, ফাইটারদের সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একটানা অনেক দিন অফিসে বসে থাকার পর ভাবলাম আমাকে দেখলে ওরাও অনুপ্রাণিত

হবে, আমারও একঘেয়েমি কাটবে।'

'খুবই ভাল কথা, আপনিই তো ওদের আদর্শ। কতদিন আপনার থাকার ইচ্ছে?'

'ঠিক বলতে পারছি না,' জবাব দিলেন মেলানজিক। 'অন্তত দু'তিন হপ্তা। ভাবছি ট্রেনিঙের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব···এই সুযোগে নিজের দক্ষতাও ঝালাই হয়ে যাবে।' হাসলেন তিনি। ছেলের হাত ধরে এগোলেন বড় আকৃতির রিইনফোর্সড ব্লকহাউসের দিকে। ওটাই ক্যাম্পের নার্ভ সেন্টার।

কর্নেল পেত্রোভিচ পৌঁছুলেন পরদিন দুপুরে। পথ দেখিয়ে গোরাজদিকের অফিসে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। তার জন্যে একা শুধু মেলানজিক অপেক্ষা করছেন। তাঁর হাতে মোটা একটা ফোল্ডার ধরিয়ে দিলেন কর্নেল।

ফোল্ডারটা টেবিলে রেখে প্রথমে কফি পরিবেশন করলেন মেলানজিক, তারপর খুললেন সেটা। ভেতর থেকে নিউজপেপার-এর কাটিং আর ফটো বেরুল। সাবধানে, মনোযোগ দিয়ে দেখলেন সব। ফটোতে একটা ট্রাক দেখা যাচ্ছে, সাদা রঙ কালো হয়ে গেছে, ভাঙাচোরা অবস্থায় উল্টে পড়ে আছে রাস্তার ওপর।

কর্নেল বিড়বিড় করে বললেন, 'আরপিজিসেভেনের কীর্তি।'

মুখ তুলে শান্ত সুরে কথা বললেন মেলানজিক, 'মাসুদ রানা সম্পর্কে কিছু জানা গেল? কোথায় আছে সে?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন কর্নেল। 'কিছুই জানা যায়নি। আগের দিন হলে কেজিবিকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, কিন্তু এখন ওরা কোন কাজেরই নয়।' হাতে ক্যাপ নিয়ে চেয়ার ছাড়লেন তিনি। 'আপনি কি এখানে অনেকদিন থাকার কথা ভাবছেন, মি. মেলানজিক?'

'যতদিন প্রয়োজন হয়।'

ক্ষীণ হেসে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল পেত্রোভিচ। 'সেটাই ভাল।'

'ডাংগা জাসতো বসনে।'

সুইমিংপুলের ধারে ডানা মেলে দেয়া চিলের মত উপুড় হয়ে রয়েছে পবন। মাথা ঘুরিয়ে খয়েরি রঙের ছোট্ট মানুষটার দিকে তাকাল একবার, কয়েক ফুট দূরে একটা বেতের চেয়ারে বসে রয়েছেন। নিখুঁত ভাঁজ করা ফ্ল্যানেল ট্রাউজার পরনে, কড়া মাড় দেয়া সাদা শার্ট, চকচকে কালো জুতো। বৃদ্ধের মুখটা গোলাকার, কোথাও কোন রেখা নেই। চোখ দুটো ছোট, কালো রঙ। মাথার চুল ছোট হলেও, পরিপাটিভাবে আঁচড়ানো।

'ডাংগা জাসতো বসনে,' আবার বললেন তিনি। 'এই তিনটে শব্দ গুর্খা স্নাইপারদের বাইবেল। অর্থ হলো "পাথরের মত স্থির"। এবার বলি কিভাবে তোমার ট্রেনিং শুরু হবে। ওখানে তুমি পরবর্তী আধ ঘণ্টা শুয়ে থাকবে, নড়বে না ঠিক যেমন একটা পাথর নড়ে না। মগজ থেকে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মেসেজ পাঠিয়ে দাও, এমনকি প্রতিটি চুলের ডগাতেও।'

কঠিন লাইমস্টোনে মুখের একটা পাশ নামাল পবন, চোখ সরু করল, পড়ে

থাকল স্থিরভাবে। ছোটখাট মানুষটা দেখছেন ওকে। দশ সেকেন্ড পর বললেন, 'তুমি নড়লে।'

'কই, না!'

'তোমার বাঁ হাতের কড়ে আঙুল আর ডান পা নড়েছে। এমনকি এ-ধরনের সামান্য নড়াচড়াও একজন স্নাইপারের মৃত্যু ডেকে আনতে পারে। একবার দাঁড়াও দেখি।'

দাঁড়াল পবন, তার সঙ্গে নেপালি ভদ্রলোকও। পবনের হাত ধরে পুল ডেক-এর কিনারায় চলে এলেন তিনি। সবুজ মাঠের দিকে তাকাল ওরা, আকাশের দিকে আঙুল তুলে তিনি বললেন, 'একটা চিল বা শকুন হয়তো এক হাজার ফুট ওপরে আছে, তারপরও একটা ইঁদুর যদি আধ ইঞ্চি লেজ নাড়ে, ওরা দেখতে পায়। একজন স্নাইপারকে সব সময় মনে রাখতে হবে একটা শকুন তার ওপর কড়া নজর রাখছে। এর ওপরই নির্ভর করবে তোমার জীবন। আজ তুমি পাথরের মত স্থির শুয়ে থাকবে আধ ঘণ্টা। কাল এক ঘণ্টা। পরদিন দু'ঘণ্টা। তুমি পাথর, কাঠের টুকরো, এ-সবের ওপর শোবে, যেখানে শুয়ে থাকতে কষ্ট হয়। এখানে আমি খুব বেশি হলে বিশ-পঁচিশ দিন থাকব। যে দিন আমি বিদায় নেব তার আগের দিন তুমি সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ডাংগা জাসতো বসনে হয়ে থাকবে। তা যদি না পারো, আমি ব্যর্থ হব—তুমিও ব্যর্থ হবে।'

'আমাকে আপনি রাইফেল চালানোও শেখাবেন?' জিজ্ঞেস করল পবন।

'শেখাব। চার ঘণ্টা স্থির থাকা শেখো, তারপর।'

ছোট্ট মানুষটা কাল রাতে পৌঁচেছেন। ফেরি থেকে নামার পর গাড়িতে তুলে নিয়ে আসে রানা। বাড়িতে পৌঁছে পরিচয় করিয়ে দেয় পবন আর পাখির সঙ্গে। 'ওর নাম পবন চৌধুরী, আমার তরুণ বন্ধু। আর উনি আমার পুরানো বন্ধু, গণেশ থাপা—ব্রিটিশ রাজকীয় বাহিনীর গুর্খা ইউনিটে ছিলেন, অবসর নিয়েছেন।' তারপর পাখির দিকে তাকাল রানা, বলল, 'উনি পবনের বোন, পাখি চৌধুরী, আমাদের মেহমান। পবন, গণেশ থাপা আজ থেকে তোমার টিচার।'

হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন গণেশ থাপা। সালাম করার ভঙ্গিতে ওরাও একবার করে হাত তুলল। এরপর হঠাৎ করে কামরা থেকে চলে গেল পাখি। তার গমনপথের দিকে চিন্তিতভাবে একবার তাকাল রানা। ক'দিন থেকেই লক্ষ করছে ও, কি যেন হয়েছে পাখির। সব সময় অন্যমনস্ক থাকে। মাঝে মধ্যেই কথাবার্তায় খানিকটা ঝাঁঝ প্রকাশ পায়। অথচ কারণটা বোঝা যাচ্ছে না। কিছু হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিল রানা। 'কি আবার হবে,' বলে ওর কাছ থেকে সরে গেছে সে। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করায় পাখি পাল্টা প্রশ্ন করেছে, 'এখানে কি সত্যি আমার না থাকলেই নয়? আমি তো আপনাদের কোন কাজেই আসছি না।'

রানা বলেছে, 'অপেক্ষা করুন, আপনাকেও কঠিন একটা কাজ দেয়া হবে। আপনার পেশার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, অভিনয় করতে হবে।'

'আপনার বাড়িতে আমাকে তো স্রেফ একটা ফার্নিচার হিসেবে সাজিয়ে রেখেছেন,' ঝাঁঝের সঙ্গে জবাব দিয়েছে পাখি। 'আমারও যে প্রাণ আছে, আবেগ-

ভাবাবেগ আছে, এ-সব আপনারা জানেন?' বলে আর ওখানে দাঁড়ায়নি সে।

বহুবচনে বললেও, রানা জানে অভিযোগটা একা ওর বিরুদ্ধেই করছে পাখি। কিন্তু সমস্যাটা জানা না থাকলে কিভাবে তার সমাধান করে ও!

সেদিন রাতে ডিনারে বসে ছোট্ট মানুষটাকে বারবার আড়চোখে লক্ষ করল পবন। সে তাঁর বয়েস আন্দাজ করল, পঁয়তাল্লিশের বেশি নয়। চেয়ারে বসে আছেন শিরদাঁড়া খাড়া করে, প্রতিটি নড়াচড়া মাপা ও নিয়ন্ত্রিত। রানা ওকে বলেছে, ব্রিটিশ সরকার তাঁকে সাতবার পদক দিয়েছে। তার মধ্যে বার সহ মিলিটারি ক্রস-ও ছিল।

এই মুহূর্তে পবন লাইমস্টোন পেভিং-এ শুয়ে গভীর মনোযোগ আনার চেষ্টা করছে, চেষ্টা করছে শরীরটা যেন না নড়ে। ওর পরনে শুধু সুইমসুট। গোজোয় এমন সব পোকা আছে, মশার চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ তাদের হুল। ওর পা নড়ে উঠল।

'তুমি নড়লে!'

'পোকা কামড়াচ্ছে।'

'পোকার কামড় কি বুলেটের চেয়ে বেশি ব্যথা দেয়?' জিজ্ঞেস করলেন গণেশ থাপা। দাঁড়ালেন তিনি, এগিয়ে গিয়ে নিচু একটা গাছের সরু ডাল ভেঙে আনলেন। ডালটা থেকে পাতাগুলো ছিঁড়লেন, চেয়ারটা পবনের কাছাকাছি টেনে এনে বসলেন আবার। 'ডাংগা,' সংক্ষেপে মনে করিয়ে দিলেন।

কয়েক মিনিট এক চুল না নড়ে পড়ে থাকল পবন, তারপর আবার ওকে পোকা কামড়াল। ওর পেশী আপনা থেকেই কেঁপে উঠল। এক সেকেণ্ড পর চিৎকার করে উঠল, গাছের ডালটা নিতম্বে মোটা দাগ ফেলে দিয়েছে।

'ডাংগা!'

স্টাডিরুমের বাইরে, ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছে রানা। নিঃশব্দে হাসছে ও। বেশ কয়েক বছর আগের কথা, নিজেকে তখন দক্ষ স্নাইপার বলে ভাবত ও, তারপর গণেশ থাপার সঙ্গে পরিচয় হলো, উপলব্ধি করল সে আসলে অ্যামেচার। গণেশ থাপার কাছে পবন এখন যে ট্রেনিং পাচ্ছে, দশ বছর আগে রানাও ওই একই ব্যক্তির কাছে একই ট্রেনিং নিয়েছে।

পরবর্তী দশ মিনিটে আরও তিনবার আঘাত করল ডালটা। শেষবার মার খেয়ে মোচড় খেলো পবন, উঠে বসে রাগের সঙ্গে বলল, 'এভাবে হতে পারে না!'

সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা, পুলটাকে পাশ কাটিয়ে বাগানে ঢুকল, ফিরে এল হাতে বড় আকারের তিনটে লাইমস্টোন পাথর নিয়ে! পবনের পাশে পাথরগুলো সাজাল ও, একটার সঙ্গে অপরটার ফাঁক থাকল প্রায় এক ফুট। এরপর পকেট থেকে এক বান্ডিল নোট বের করল ও। বান্ডিল থেকে একশো ডলারের দশটা নোট আলাদা করে একটা পাথরের নিচে চাপা দিল। গণেশ থাপার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

চেয়ার ছেড়ে শার্ট খুললেন ছোট্ট মানুষটা। শার্টটা ভাঁজ করে বেতের টেবিলে রেখে দিলেন। এরপর ট্রাউজার খুললেন, লক্ষ রাখলেন ভাঁজগুলো যাতে নষ্ট না হয়, সেটাও শার্টের পাশে সযত্নে রেখে দিলেন। এভাবে জুতো ও মোজাও খুলে ফেললেন। এখন তাঁকে নগ্নই বলা যায়, পরে আছেন শুধু একটা সাদা বক্সার শর্টস।

দাঁড়িয়ে আছে পবন, হতভম্ব দেখাচ্ছে ওকে। পাথরগুলোর কাছে হেঁটে এলেন গণেশ থাপা, তারপর ওগুলোর ওপর শুয়ে পড়লেন। একটা পাথর তাঁর চিবুকের নিচে, একটা সোলার প্লেক্সাসের নিচে, শেষটা উরুসন্ধিতে। ভঙ্গিটা অসম্ভব কষ্টদায়ক বলে মনে হলো।

খালি চেয়ারটা দেখিয়ে পবনকে রানা বলল, 'বসো, পবন। থাপা মশাকে ভালভাবে লক্ষ করো। আগামী দু'ঘণ্টায় তিনি যদি এক মিলিমিটারও নড়েন, পাথরের নিচে রাখা এক হাজার ডলার পাবে তুমি। ডালটা দিয়ে ওঁকে তুমি আঘাতও করতে পারবে। কিন্তু যদি না নড়েন, টাকাটা উনি পাবেন, তোমাকে মারবেনও। ছ'বার। বিশ্বাস করো, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে উনি খুব জোরে মারেন।'

হাসার সময় পবনের দাঁত বেরিয়ে পড়ল, ডালটা তুলে নিয়ে বসল চেয়ারে। ঝুঁকল ও, সামনে পড়ে থাকা শরীরটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে। কিচেনে চলে এল রানা, ফ্রিজ থেকে বিয়ার নিল, তারপর ফিরে গেল নিজের স্টাডিতে। প্রথমে সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফারকে লম্বা একটা চিঠি লিখল, তারপর লিখল বটলনেক টু-কে, সবশেষে ন্যানিকে। তিনটে এনভেলাপে ঠিকানা লিখল, সবগুলো একটা বড় খামে ভরল, তাতে ঠিকানার জায়গায় লিখল ব্রাসেলসের পোস্ট-বক্স নম্বর। চিঠিগুলো ওই পোস্ট-বক্স থেকে বিলি হবে। কাজ শেষ হয়েছে, এই সময় নিচে থেকে থ্যাচ করে একটা শব্দ ভেসে এল, সেই সঙ্গে পবনের চিৎকার। মাথা তুলে অপেক্ষা করছে ও। মারের দ্বিতীয় শব্দ ও দ্বিতীয় চিৎকার কানে ঢুকতে ক্ষীণ হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। মারের ছ'নম্বর আওয়াজ কানে ঢোকার সময় দেখা গেল হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। দ্বিতীয় চিৎকারের পর আর কোন চিৎকার শোনা যায়নি। হাতঘড়ি দেখল ও, দু'ঘণ্টার কিছু বেশি হয়েছে। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে দেখল, গণেশ থাপা তাঁর বেডরুমে ফিরে যাচ্ছেন, এক হাতে কাপড়চোপড়, অপর হাতে জুতো। পুলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে পবন, পিঠে হাত বুলাচ্ছে। হেঁটে এসে মাঝখানের পাথরটায় লাথি মারল রানা। টাকাগুলো এখনও রয়েছে ওখানে।

পবনের দিকে তাকাল রানা। তিক্ত হেসে পবন বলল, 'উনি নিচ্ছেন না। বলছেন, ওই পাথরের তলায় ওগুলো আরও দু'তিন হপ্তা থাকবে। তারপর যদি উনি সন্তুষ্ট হন, টাকাগুলো আমি পাব, তবে ভাল একটা রেস্তোরাঁয় ডিনার খাওয়াতে হবে সবাইকে।'

পায়ের ঠেলায় গড়িয়ে পাথরটাকে আবার আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনল রানা।

'ব্যাপারটা না দেখলে বিশ্বাস করতাম না,' বলল পবন। 'ওখানে তিনি ওই পাথরগুলোর মতই পড়েছিলেন।'

'জানি,' বলল রানা। 'ডাংগা জাসতো বসনে।'

বিস্মিত দেখাল পবনকে। 'আপনি গুর্খালি ভাষা জানেন?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, শুধু ওই তিনটে শব্দের অর্থ জানি। দশ বছর আগে হাতুড়ি দিয়ে আমার পিঠে ওগুলো গেঁথে দেয়া হয়েছে।'

'ওঁনার বয়েস কি সত্যি ষাট?' জিজ্ঞেস করল পবন। 'দেখে তো মনে হয় না।'

'হ্যাঁ, ষাট,' বলল রানা। 'শোনো, তাহলে একটা গল্প শোনাই। গল্প নয়, সত্যি

কাহিনী। একজন ব্রিটিশ কর্নেলের মুখে শোনা।'

মালয়ান যুদ্ধের সময় সেকেন্ড/টেন্থ গুর্খা ইউনিটের কমান্ডার ছিলেন কর্নেল। কমিউনিস্ট দুষ্কৃতকারীরা খাবার পাবার আশায় স্থানীয় খামার আর গ্রামগুলোয় হানা দিত। থাইল্যান্ড সীমান্তের কাছাকাছি বড়সড় একটা মুরগীর ফার্ম ছিল, নির্জন একটা এলাকায়। ব্রিটিশদের কাছে খবর এল, গেরিলাদের একটা গ্রুপ ওই ফার্মে হানা দিতে যাচ্ছে। ফার্মটা এমন এক জায়গায়, অ্যামবুশ সম্ভব নয়। কাছাকাছি পাহাড় থেকে গেরিলারা ফার্মটার ওপর আগে থেকেই নজর রাখছিল। কমান্ডার রাতের অন্ধকারে গণেশ থাপা ও অপর একজন গুর্খাকে পাঠালেন ওখানে। ওখানে পৌঁছে মালয়ান কৃষক আর তার পরিবারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন গণেশ থাপা, তারপর সবচেয়ে বড় চিকেন শেডে ঢুকলেন, মেশিন-পিস্তলটা বসালেন দরজা থেকে সবচেয়ে দূরের এক কোণে। এরপর শুরু হলো তাদের অপেক্ষার পালা। কিছুক্ষণের মধ্যে শান্ত হলো মুরগীগুলো, তাঁদেরকে আর গ্রাহ্য করছে না। 'তবে তাঁরা যদি নড়তেন, ডাকাডাকি ও ছটফট করত প্রাণীগুলো, ফলে শব্দ শুনে সাবধান হয়ে যেত গেরিলারা,' বলল রানা।

'ওখানে তাঁরা কতক্ষণ ছিলেন?' জিজ্ঞেস করল পবন।

'তিন দিন আর তিন রাত। ওই সময়ের ভেতর একবারও তাঁরা এক চুল নড়েননি। বিশ্বাস করো, মুরগীগুলো তাঁদের মাথা, কাঁধ ও মেশিন-গান ব্যারেলে মল ত্যাগ করে।'

'তারা নিজেরা?'

'না, প্রকৃতির একটা ডাকে তাঁরা সাড়া দেননি। তবে প্রস্রাব করেছিলেন, নড়াচড়া না করেই। ভেজা ট্রাউজার আবার শুকিয়ে গিয়েছিল। দুটো দিন মুখেও দেননি কিছু। প্রস্রাব করেছিলেন শুধু প্রথম দিন। তারপর শরীরে কিছু থাকলে তো। দুপুরের দিকে ওই শেডে টেমপারেচার ছিল একশো দশ ডিগ্রী। গেরিলারা এল তৃতীয় রাতে। এসেই কৃষক আর তার পরিবারের সবাইকে বেঁধে ফেলল। এরপর শেডে ঢুকল মুরগী ধরার জন্যে। শেডের ভেতর যখন আটজন ঢুকেছে, মেশিন-গান থেকে গুলি ছুঁড়লেন গণেশ থাপা। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্যেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে মিলিটারি ক্রস দেয়।'

কিছুক্ষণ চিন্তিত দেখাল পবনকে, বাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে। তারপর হাসল, বলল, 'উনিও নিশ্চয়ই কয়েকটা মুরগী পেয়েছিলেন, কি বলেন?'

'আমারও তাই ধারণা,' বলল রানা। 'অন্তত এক হপ্তা অফিসার্স মেসে শুধু বোধহয় মুরগীই রান্না হয়েছিল।'

রানার দৃষ্টি আকর্ষণের সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর পাখি সিদ্ধান্ত নিল, গোজোয় সে থাকবে না।

একই বাড়িতে দীর্ঘ অনেকগুলো দিন আছে সে, অথচ ওদের আচরণ দেখে মনে হবে তার অস্তিত্ব সম্পর্কে ওরা সচেতন নয়। এমনকি পবন, তার মায়ের পেটের ভাই, সে-ও তাকে এক মিনিট সময় দেয় না। দেখা হয় শুধু খাবার সময়, তা-ও কথা বললে সহজে কোন জবাব পাওয়া যায় না। সারাক্ষণ নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে

ওরা, তার সামনে, অথচ তাকে বাদ দিয়ে। এই অনাদর ও অবহেলা অনেক সহ্য করেছে সে, আর নয়।

নিজের কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা বা লজ্জা নেই পাখির, প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোককে তার ভাল লেগে যায়। যদিও তার মানে এই নয় যে ওঁরও তাকে ভাল লাগতে হবে। ভাল না লাগুক, তার প্রাপ্য সম্মানটুকু কেন সে পাবে না? মুক্ত মনের স্বাধীনচেতা একটা মেয়ে সে, তাকে অসুন্দরীও বলা যাবে না, একবার ভেবে দেখবেন না এখানে তার সময় কাটছে কিভাবে? বেশ বোঝা যায়, নিজেকে সযত্নে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেন উনি। কেন? সে কি বাঘ, না ভাল্লুক? কথাটা সে ঠিকই বলেছে, তাকে এ-বাড়ির একটা ফার্নিচার বলে মনে করা হয়।

তার আঁকা ওঁর প্রথম ছবিটা লুকিয়ে ফেলেছিল পাখি। তারপর যখন দেখল, তার দিকে ওঁর খেয়ালই নেই, ছবিটা বের করে নিজের বেডরুমের টেবিলে সাজিয়ে রেখেছিল। ভেবেছিল নিশ্চয়ই চোখে পড়বে। ওমা, ভুলেও একবার তার বেডরুমে ঢুকলেন না উনি। আশা ছিল অন্তত পবনের চোখে তো পড়বেই। ছবিটা পবন একবার খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি। এবার পেলে নিশ্চয়ই ওটা চুরি করবে, তারপর দেখাবে ওঁকে, প্রমাণ করার চেষ্টা করবে তার বোনের আঁকার হাত কত ভাল। কিন্তু তার সে আশাও পূরণ হলো না। কিছু না কিছু নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকে পবন, বোনের বেডরুমে ঢোকার সময় কখন তার।

শুধু ওই একটাই নয়, ভদ্রলোকের আরও কয়েকটা ছবি এঁকেছে পাখি। দেখাবার জন্যে, তা নয়। চেহারাটা তাকে মুগ্ধ করেছে, এঁকে আনন্দ পায়, তাই এঁকেছে। ভদ্রলোককে নিয়ে সে যে রঙিন সব স্বপ্ন দেখছে, ব্যাপারটা তা-ও নয়। ভাল লেগেছে ঠিকই, তবে সেই ভাল লাগার মধ্যে কোন ধরনের লোভ নেই। ভদ্রলোককে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে তার, ওঁর কথা ভাবলেই মনে এক ধরনের সমীহের ভাব চলে আসে। ভালবাসতে যে ইচ্ছে হয় না, তা নয়; তবে এ-কথা ভাবলেই ভয় লাগে তার। ভয় লাগে, কারণ ওঁকে তার অনেক দূরের মানুষ, ধরাছোঁয়ার বাইরের বলে মনে হয়। পৃথিবীতে এরকম কিছু পুরুষ সব সময়ই থাকে, যাদেরকে ভালবাসা যায়, কিন্তু কোনদিনই তাদের নাগাল পাওয়া যায় না—মাসুদ রানাকে তার সেরকম একজন পুরুষ বলে মনে হয়। সেজন্যেই ইচ্ছেটার গলা টিপে মেরেছে সে। তারপর নিজেকে প্রশ্ন করেছে, তাহলে এত কেন রাগ ওঁর ওপর? ওঁর কাছ থেকে কি সে আশা করে?

আশা করে সামান্য একটু মনোযোগ, সামান্য একটু প্রশংসা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দু'একটা সুযোগ, দু'এক দণ্ডের প্রীতিকর সঙ্গ, খানিকটা স্বীকৃতি।

কিন্তু না, উনি পবনকে নিয়ে মেতে থাকবেন সারাক্ষণ, তার দিকে তাকাবার সময় কোথায়! কাজেই কি দরকার তার এখানে থাকার?

কাপড়চোপড় গুছিয়ে নিজের ব্যাগে ভরে নিল পাখি। রান্নাবান্নার কাজ আগেই শেষ করেছে, বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার আগে বেডরুমে ঢুকে চিঠি লিখতে বসল। সে লিখল…

'প্রীতিভাজনেষু,

একঘেয়ে নিঃসঙ্গতা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে, তাই আমি লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি। ভাববেন না কারও বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ আছে। আমি জানি মহৎ ও বিপজ্জনক একটা কাজের প্রস্তুতি নিচ্ছেন আপনারা, কাজেই অন্য কোন দিকে খেয়াল দেয়ার সময় আপনাদের নেই। তবে এই ক'টা দিন এখানে খুব আনন্দে কাটল, এ-কথা বলতে পারলে খুশি হতাম। আমি আপনাদের কোন কাজে লাগলাম না, এই দুঃখটাও রয়ে গেল।

পবন আমার একমাত্র ভাই, ও ছাড়া আমার জীবনে আর কেউ নেই। এ ক'দিনে আপনাকে যতটুকু চিনেছি, আপনার কাছে ওকে রেখে যেতে আমার ভয় করছে না। আমি জানি, সব রকম বিপদ থেকে ওকে আপনি রক্ষা করবেন। পবনকে আর আলাদা করে চিঠি লিখলাম না। ওকে বলবেন, আমি বলেছি ও যেন আপনার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে, কখনও যেন আপনার কথার অবাধ্য না হয়। আর বলবেন আমার জন্যে যেন দুশ্চিন্তা না করে। আপনারা ভাল থাকুন, নিজেদের সাধনায় সফল হন, এই কামনা করি। আপনার গুণমুগ্ধ, পাখি।'

পাঁচ

জড় পদার্থের মত এক চুল না নড়ে চার ঘণ্টা পড়ে রয়েছে পবন। শনিবার দুপুর, গণেশ থাপা আসার পর দু'হপ্তা পেরিয়ে যাচ্ছে। এক জোড়া পাম গাছের মাঝখানে, বাগানের ভেতর, পাথরের একটা স্তূপের ওপর শুয়ে রয়েছে ও। জানে না শিক্ষক মহাশয় কোথায় আছেন।

লাউঞ্জের সমতল ছাদে পদ্মাসনে বসে রয়েছেন বৃদ্ধ, তাকিয়ে আছেন বাগানের ওপর দিয়ে দূরে। গত এক ঘণ্টা পবনের দিকে একবারও তাকাননি তিনি। অপলক চোখে সাগর দেখছেন, তবে তাঁর মন চলে গেছে আরও অনেক দূরে। তারপর এক সময় ঘড়ি দেখলেন, দাঁড়ালেন, নেমে এলেন ছাদ থেকে। তাঁর ফিরে আসার শব্দ পবনের কানে ঢুকল না। শুধু কাঁধে একটা আঙুলের স্পর্শ অনুভব করল, এবং কে যেন বলল, 'পাথর এখন নড়তে পারে।'

রাতে নিজের হাতে মাটন কারি রাঁধলেন গণেশ থাপা। সঙ্গে করে তিনি কিছু মশলা নিয়ে এসেছেন, রান্নার কাজে ব্যবহার করলেন। প্রথমবার সামান্য একটু মুখে দিতেই পবনের মনে হলো ভেতরে আগুন ধরে গেছে।

'খেতে মজা লাগছে?' গুর্খা ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

বড় করে শ্বাস টানল পবন, দু'সারি দাঁত এক করে মাথা ঝাঁকাল। বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসলেন গণেশ থাপা।

'ঝাল কম দিয়েছি,' বললেন তিনি। 'কারণ জানি ঝাল সবাই পছন্দ করে না। ঠিক আমরা যে রকম পছন্দ করি, একজন ব্রিটিশ অফিসারের তাতে অভ্যস্ত হতে এক বছর লেগে যেত।' আবার হলুদ দাঁত বের করে হাসলেন।

এক ঢোক পানি খেয়ে আবার খানিকটা কারি মুখে পুরল পবন। রানার দিকে তাকাল একবার। ঘামে চকচক করছে ওর কপাল, তবে মাংস চিবাচ্ছে দিব্যি অনায়াস ভঙ্গিতে।

পবন সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, ওর মাসুদ ভাইও ভুগছেন। তারপর ভাবল, কষ্ট পেয়েও উনি যদি তা প্রকাশ না করেন, আমিও চেপে যাব। 'এখন আমি রাইফেল চালাতে পারি তো?' গণেশ থাপাকে জিজ্ঞেস করল ও।

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। 'আগামী দুইদিন তুমি শিখবে কিভাবে ওটা ধরতে হয়, কিভাবে বহন করতে হয়, কিভাবে যত্ন নিতে হয়। তুমি কাউকে ভালবাস, বা তোমার কোন প্রেমিকা আছে, পবন?'

বোকা বোকা দেখাল পবনকে। আড়চোখে রানার দিকে তাকাল একবার। ওর দিকে তাকিয়ে আছে রানা, চোখে আগ্রহ ও কৌতূহল। এখন ওর কপাল শুধু চকচক করছে না, ঘাম বিন্দু হয়ে গেছে, বিন্দুগুলো ফোঁটায় পরিণত হচ্ছে। ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল, এখনও তাকিয়ে আছে পবনের দিকে।

'ইয়ে...মানে, হ্যাঁ,' বিড়বিড় করল পবন।

'ক'জন?' আবার জিজ্ঞেস করলেন গণেশ থাপা।

চেয়ারে যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল পবন। 'ক'জন মানে? কি বলছেন?'

'জবাব দাও, ক'জন?'

টেবিলের ওপর পট ভর্তি কারি, সেটার ভেতর তাকিয়ে চুপ করে থাকল পবন।

'গুরু প্রশ্ন করেছেন, তুমি জবাব দেবে,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

মুখ তুলে শিক্ষকের দিকে তাকাল পবন। 'আমার ভুল হয়েছে। একজনকে আমার একটু ভাল লেগেছিল, তবে তাকে প্রেমিকা বলা যায় না। এখন সে গোজোয় নেইও।'

গণেশ থাপা হাসলেন না। তবে সন্তুষ্টচিত্তে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালেন। 'গুড, ভেরি গুড। তারমানে নতুন একজন প্রেমিকা তোমার জীবনে এলে কারও সঙ্গে বেঈমানী করা হবে না। ওর সঙ্গে তোমার কাল দেখা হবে।'

'নতুন প্রেমিকা!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন বৃদ্ধ নেপালী। 'তুমি তাকে ধরবে, আদর করবে, এমন ব্যবহার করবে সে যেন তোমার রানী। এমনকি তার সঙ্গে শোবেও তুমি।'

ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে হাসল পবন। 'কি নাম তার?'

'তোমার প্রেমিকার নাম হেকলার অ্যান্ড কোচ পিএসজিআই, আমার মতে শ্রেষ্ঠ স্নাইপার রাইফেল। ওটা লেটেস্ট কিছু নয়, বাজারে এখন ফ্যানটাসটিক সব উইপন এসেছে, বিশেষ করে আমেরিকায়। তবে আমার কাছে এটাই সবচেয়ে বিশ্বস্ত মনে হয়। একটা কথা সত্যি বলে জেনো, পবন, তোমার এই প্রেমিকা যে-কোন রক্ত-মাংসের প্রেমিকার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী।'

'তাহলে বলুন আমি ওটা ছুঁড়তে পারব কবে?' জিজ্ঞেস করল পবন।

'যখন ওকে তুমি পটাতে আর সামলাতে পারবে,' জবাব দিলেন গণেশ থাপা। কারি ভরা পটটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'আরও নাও, পবন। বুঝতে পারছি, খেতে তোমার খুব ভাল লাগছে।'

মনে মনে আঁতকে উঠে পানির গ্লাসের দিকে হাত বাড়াল পবন।

অস্ত্রটাকে পবন নয়, অস্ত্রটাই পবনকে পটিয়ে ফেলল।

সকালে লম্বা ও কালো একটা লেদার কেস নিয়ে নিজের বেডরুম থেকে বেরিয়ে এলেন গণেশ থাপা। বাগানে, গাছের ছায়ায়, টেবিলের ওপর রাখলেন সেটা, কমবিনেশন লক খুলে ঢাকনি তুললেন। স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো খাঁজের ভেতর নরম বিছানায় শুয়ে রয়েছে। অন্যান্য খাঁজে রয়েছে ডে স্কোপ, নাইট স্কোপ, উইন্ড গজ আর চারটে ম্যাগাজিন।

লেদার স্ট্র্যাপ খুলে পবনকে ইশারা করলেন গণেশ থাপা। 'তোমার প্রেমিকার সঙ্গে পরিচিত হও।'

একটানা অনেকক্ষণ সার্চ করে চোখ টাটিয়ে গেল রানার। বিনকিউলার নামাল ও, পাশে দাঁড়ানো গণেশ থাপার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ঠিক জানেন দক্ষিণ-পুব দিকে, চারশো গজের মধ্যে আছে ও?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন নেপালী ভদ্রলোক।

'আপনি ওকে দেখতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তবে কোথায় তাকাতে হবে আমি জানি।'

সময়টা বিকেল, বাড়ির ছাদে বসে আছে ওরা। পবনকে নিয়ে ভোর হবার এক ঘন্টা আগে বেরিয়েছিলেন গণেশ থাপা। ভোর হবার একটু পর একা ফিরে আসেন তিনি, সেই থেকে সারাটা দিন ছাদে কাটাচ্ছেন। পিওতর মেনিনোর সঙ্গে দেখা করার জন্যে মাল্টায় গিয়েছিল রানা, ফিরেছে আধ ঘন্টা আগে।

চোখে আবার বিনকিউলার তুলল ও, সামনের জায়গাটার ওপর দৃষ্টি বুলাল। শুকনো পাথর, নিচু ইঁটের পাঁচিল, আর লাইমস্টোন পাথর ছাড়া দেখার কিছু নেই। দশ মিনিট পর বিনকিউলার নামাল আবার। বলল, 'আপনি সত্যি কাজ দেখিয়েছেন, মি. থাপা। ও গুলি করবে কখন?'

'আমি টার্গেট দেখিয়ে দেয়ার পাঁচ মিনিট পর,' জবাব দিলেন গণেশ থাপা, কোলের ওপর পড়ে থাকা খালি বিয়ারের বোতলটায় টোকা দিলেন।

ডান দিকে তাকাল রানা, প্রায় পাঁচশো গজ দূরে দু'জন চাষী খেতে কাজ করছে। 'রাইফেলে সাইলেন্সার আছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আছে। আপনি তো বোঝেনই, এরকম দূরত্বে গুলি করাটা আরও কঠিন।'

'আপনার কি ধারণা, পারবে ও?'

মাথা ঝাঁকালেন গণেশ থাপা। 'আমার ধারণা পারবে।' রানার দিকে তাকালেন তিনি। 'আপনি একটা রত্ন যোগাড় করেছেন, মি. রানা। হি ইজ ভেরি গুড।' হাসলেন তিনি, পরিবেশটা আগেই হালকা করে নিলেন, তারপর বললেন, 'ও আপনার চেয়ে ভাল করবে, মি. রানা। অথচ আমি জানি, আপনার প্রায় কোন তুলনাই হয় না।'

'আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা, চোখে বিনকিউলার তুলে আবার খুঁজতে শুরু করল।

'আমি শুধু শ্রদ্ধা আর ভালবাসা বিনিময় করি,' বললেন গণেশ থাপা। 'এক্ষেত্রে সেই শ্রদ্ধা-ভালবাসার সামান্য একটু মাত্র ফিরিয়ে দিয়েছি।'

কোলের ওপর থেকে বিয়ারের খালি বোতলটা নিয়ে সিধে হলেন তিনি। হেঁটে এলেন ছাদের শেষ মাথায়, বোতলটা কিনারায় রেখে সরে দাঁড়ালেন।

পাঁচ সেকেন্ড পর বিস্ফোরিত হলো সেটা।

সেদিন রাতে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেলেন গণেশ থাপা। যে-কোন একটা কাজ সুষ্ঠুভাবে শেষ হলেই একবার অন্তত মাতাল হওয়া তাঁর অভ্যেসই বলা যায়। এক ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় ডিনার খেতে গেল ওরা। পবনের অনুমতি নিয়ে জিন আর টনিকের অর্ডার দিলেন তিনি, একার জন্যে। তারপর ডিনার শুরু হতে বললেন, 'আমি কি শিভাস রিগ্যাল-এর একটা বোতল পেতে পারি?'

হুইস্কির বোতলটা ডিনার শেষ হবার আগেই একা শেষ করলেন গণেশ থাপা। করুণ চোখে তাকাতে আরেকটা বোতলের অর্ডার দিল পবন। সেটাও তিনি একা সাবাড় করলেন। সবশেষে কফির সঙ্গে খানিকটা কনিয়্যাক খেলেন।

পবন বিল দিল। চেয়ার ছেড়ে ওঠার সময় টেবিলটা ধরে থাকলেন গণেশ থাপা, সামান্য টলছেন। রানা নড়ার আগেই তাঁর পাশে চলে এল পবন, জড়িয়ে ধরল এক হাতে। হোঁচট খেতে খেতে গাড়ির কাছে এল ওরা, একটা শিশুর মত গণেশ থাপাকে বুকে তুলে নিল পবন, আস্তে করে নামিয়ে দিল জীপের ব্যাক সীটে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেখা গেল ঘুমিয়ে পড়েছেন ভদ্রলোক। গাড়ি থেকে নেমে তাঁর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল পবন, বলল, 'ডাংগা জাসতো বসনে।'

জীপের আরেক দিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, হাসছে না। জিজ্ঞেস করল, 'ভদ্রলোক সম্পর্কে কি ধারণা তোমার?'

তরুণ শিক্ষানবিস জবাব দিতে দেরি করল না, 'সত্যিকারের একজন পুরুষ।' ঝুঁকল, দু'হাতে ধরে বুকে তুলে নিল শিক্ষক মহাশয়কে।

গণেশ থাপার বেডরূম থেকে বেরিয়ে পাখির বেডরূমে ঢুকল পবন, তারপর বাগানে বেরিয়ে এসে দেখল পুলের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পানির দিকে। দেয়ালের দিকে এগোল ও, চাপ দিল একটা বোতামে। হালকা নীল আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুলের পানি। নিচু গলায় বলল, 'এখনই সময়।'

'কিসের সময়?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'প্রতিযোগিতার।'

ঘাড় ফিরিয়ে ওর দিকে তাকাল রানা। 'কতবার?'

'পঞ্চাশ, আসা-যাওয়া একবার ধরা হবে,' বলল পবন, মুচকি মুচকি হাসছে।

'কি বাজি? তুমি তো আগের বাজির পুরস্কারই দাওনি আমাকে।'

'এই যে নিয়ে এসেছি,' বলে একটা হাত পিছন থেকে সামনে আনল পবন।

এগিয়ে এসে ওর বাড়ানো হাত থেকে জিনিসটা নিল রানা। গোল পাকানো মোটা কাগজ। সিধে করতেই নিজেকে দেখতে পেল ও। হাতে আঁকা ছবি, সঙ্গে বাগান ও পুলের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে। 'কে এঁকেছে, তুমি?' জিজ্ঞেস করল ও।

কথা না বলে মাথা নাড়ল পবন।

'তারমানে পাখি এঁকেছেন,' বলল রানা। 'খুব ভাল হাত।'

পবন কোন মন্তব্য করল না।

হাসল রানা। 'আজ কি বাজি ধরতে চাও?'

'আপনি বলুন।' মুচকি হাসিটা আবার ফিরে এল পবনের ঠোঁটে।

'না, তুমি বলো।'

এক সেকেন্ড চিন্তা করল পবন, তারপর বলল, 'আপনি জিতলে যা চাইবেন তাই দেব আমি...যা চাইবেন।'

'ঠিক আছে, আমি রাজি,' চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল রানা।

'আর আপনি যদি হারেন?' জানতে চাইল পবন, এখনও হাসছে সে।

'যা চাইবে তাই পাবে,' শার্টের বোতাম খুলতে শুরু করেছে রানা।

আর মাত্র এক দফা বাকি, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে সাঁতরাচ্ছে ওরা। দু'বার পবনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে রানা, দু'বারই গতি বাড়িয়ে ওর কাঁধের কাছে কাঁধ নিয়ে এসেছে পবন। উনচল্লিশ দফার শেষ দিকে এতদিন রানা যা শিখিয়েছে, রেসিং-এর সেই নিখুঁত টার্ন নিল পবন। রানা বাঁক ঘুরল, তুলনায় মন্থর বেগে। শেষ দফা শুরু করল ওরা, তিন ফুট এগিয়ে রয়েছে পবন। এভাবেই শেষ হলো প্রতিযোগিতা।

পুলের অগভীর অংশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা, কোমর সমান পানিতে, দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। দম নিয়ে পবন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ভুল করেছেন আপনি?'

শান্ত সুরে রানা বলল, 'তুমি বলো।'

'আমার মোটিভ আপনার চেয়ে শক্তিশালী ছিল,' জবাব দিল পবন।

'কি সেটা?'

পানি থেকে উঠে পুলের কিনারায় বসল পবন। এখনও হাঁপাচ্ছে সে। 'বাজির সঙ্গে সম্পর্ক আছে।'

'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'আমি চাই লন্ডনে গিয়ে পাখি আপাকে আপনি নিয়ে আসবেন।'

হেসে উঠতে যাচ্ছিল রানা, সময় মত সামলে নিল নিজেকে। ও জিতলে পবনকে এই কথাই বলত, তোমার আপাকে ফিরিয়ে আনো। 'কেন বলো তো? তাকে কি সত্যি আমাদের দরকার?' পবনের মন বোঝার চেষ্টা করছে ও। মনে মনে আগেই ঠিক করে রেখেছে, দু'এক দিনের মধ্যে পাখিকে আনতে যাবে ও। তাকে ওদের দরকার।

'আপার চিঠি পড়ে আমার মনে হয়েছে, আমাদের ওপর তার অভিমান হয়েছে,' বলল পবন। 'তাছাড়া...'

'তাছাড়া?'

'আপা এখানে না থাকলে কাজে আমি মন বসাতে পারব না,' বলল পবন।

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'এমনিতেও আমি ওকে আনতে যেতাম।'

'ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই।'

*

ফ্ল্যাটে সারাদিন একা থাকে পাখি, সময় কাটে না, আর কিছু করার নেই বলে মন আর জিভের সাধ মিটিয়ে এটা-সেটা অনেক কিছু রান্না করেছে। তা-ও আবার দুপুরে নয়, সন্ধের পর। এখন রাত আটটা, টেবিল সাজিয়ে বসে আছে সে। বসে আছে, কিন্তু খাচ্ছে না।

গোজো থেকে ঝোঁকের মাথায় চলে আসা যে উচিত হয়নি, সেটা লন্ডনে ফিরে আসার পর উপলব্ধি করেছে পাখি। পবনের জন্যে খুব মন কেমন করছে তার। সে চলে আসায় কে ওদেরকে রেঁধে খাওয়াবে? তাছাড়া, চিঠিতে বা নিজের কাছে স্বীকার না করলেও, একটা কথা খুবই সত্যি— মাসুদ রানা তাকে জাদু করেছে। চলে আসার পর এখন বুঝতে পারছে ওঁর সঙ্গ সেভাবে না পেলেও, তাকে উনি অবহেলা করলেও, একই বাড়িতে ওঁর সঙ্গে থাকার সুযোগটাও তার জন্যে কম আনন্দের বা কম রোমাঞ্চকর ছিল না। চলে আসায় সেটা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে হচ্ছে তাকে।

লজ্জার মাথা খেয়ে এখন তার ফিরে যাবারও উপায় নেই। এরকম মানসিক অশান্তি দেখা দিলে পাখি সব সময় নিজেকে পীড়ন করার দিকে ঝুঁকে পড়ে। আজও তাই ঘটল। সে সিদ্ধান্ত নিল, আজ কিছু খাবে না। উপোস থাকবে।

খাবারগুলো তাহলে ফ্রিজে রেখে দিতে হয়। চেয়ার ছাড়তে যাবে পাখি, কলিংবেল বেজে উঠল। এই রাতে আবার কে এল? ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে পাখি। তার বান্ধবীরা আসে বটে, মাঝে মধ্যে থিয়েটারের ডিরেক্টর বা টিভির প্রডিউসাররাও আসেন কিন্তু রাতে কখনোই নয়। তাহলে!

দরজা খুলতেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল পাখি। 'আ-আপনি!'

'যেভাবে পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছেন,' বলল রানা, 'দরজা থেকেই তাড়িয়ে দেবেন নাকি?'

'ছি-ছি, কি বলছেন!' তাড়াতাড়ি একপাশে সরে দাঁড়াল পাখি। 'আসুন। আপনি একা? পবন আসেনি? কেমন আছে সে?'

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল রানা। ঘুরল। 'একা নই, পবনও এসেছে। তাকে আমাদের একটা সেফ হাউসে রেখে এসেছি। ভাল আছে সে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল পাখি, বাধা দিয়ে আবার বলল রানা, 'আমার খুব খিদে পেয়েছে। প্লেনের খাবার একদম পছন্দ হলো না।'

ব্যস্ত হয়ে উঠল পাখি। 'আসুন তাহলে। আমি খেতেই বসছিলাম।'

ডাইনিংরুমে ঢুকতেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'ওরেবাব্বা, এত কিছু!'

'বসে পড়ুন,' বলে রানার জন্যে একটা চেয়ার টেনে আনল পাখি। বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে বসল রানা, বসেই খেতে শুরু করল। পাখি জিজ্ঞেস করল, 'তা লন্ডনে কি মনে করে, মাসুদ ভাই?'

'আমরা আপনাকে নিতে এসেছি,' নরম সুরে বলল রানা।

কিছুক্ষণ কোন কথা বলল না পাখি। রানার প্লেটে এটা-সেটা তুলে দিচ্ছে, নিজেও নিচ্ছে—হঠাৎ করে খিদে বেড়ে গেছে তার। তারপর জিজ্ঞেস করল,

‘কেন?’

‘আপনার হাতের রান্না আমরা মিস করছি।’

‘গোজোয় যদি রাঁধুনীর অভাব থাকে, লন্ডন থেকে কাউকে চাকরি দিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।’

রানা বলল, ‘কাল রাতে পবনের কাছে আমি সাঁতারে হেরে গেছি।’

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল পাখি, রানা আর কিছু বলছে না দেখে জিজ্ঞেস করল, ‘তো?’

‘বাজি ধরা হয়েছিল, যে জিতবে সে যা খুশি তাই চাইতে পারে। পবন জিতেছে, সে চাইছে আপনি আবার আমাদের সঙ্গে থাকুন।’

‘বাজিতে হেরে গেছেন, তাই আলুর একটা বস্তার মত আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন?’

মাথা নাড়ল রানা। ‘প্রথমবার যখন নিয়ে যাই আপনাকে, মনে আছে কি বলেছিলাম? আপনার নিরাপত্তার স্বার্থেই এখানে আপনার থাকা চলে না।’

‘প্রায় মাসখানেক তো থাকলাম এখানে। কই, কোন বিপদ তো ঘটেনি।’

‘ঘটেনি, ঘটতে পারত,’ বলল রানা। ‘আপনাকে আমার এজেন্সির লোকজন রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিচ্ছে, তারপরও এই ক'দিন খুব চিন্তার মধ্যে ছিলাম।’

‘পাহারা দিচ্ছে? আমাকে? কই, আমি তো কিছুই টের পাইনি।’

‘টের পাবার কথা নয়, ওরা কাঁচা লোক নয়,’ বলল রানা। ‘তবে যতই পাহারা দিক, এখানে আপনি নিরাপদ নন।’

‘তারমানে আপনারা চাইছেন আবার আমি গোজোয় ফিরি, এবং একটা ফার্নিচার হিসেবে আপনার বাড়ির শোভা বর্ধন করি?’

‘দুঃখিত,’ বলল রানা। ‘আপনাকে যদি সত্যি অবহেলা করা হয়ে থাকে, সেটা খুবই অন্যায় হয়েছে। কথা দিচ্ছি, এবার গেলে নিজেকে আপনার ফার্নিচার বলে মনে হবে না।’

‘আচ্ছা!’ কৌতূহলে চিকচিক করে উঠল পাখির চোখ। ‘তাহলে বলুন, নিজেকে আমার কি মনে হবে?’

‘মনে হবে আপনিও আমাদের একজন পার্টনার,’ জবাব দিল রানা। ‘মনে আছে, বলেছিলাম আপনাকেও আমরা কাজে লাগাব? তার সময় হয়ে এসেছে। তবে ভাবছি, কাজটা আপনি পারবেন কিনা বা করতে রাজি হবেন কিনা।’

‘কি কাজ?’

‘সেটা এখুনি বলা যাচ্ছে না, আগে আরও কিছু তথ্য পেয়ে নিই, তারপর জানাব।’

‘তারমানে আমাকে এখন আপনাদের দরকার, তাই নিয়ে যেতে এসেছেন, এই তো?’

খাওয়া বন্ধ করে মাথা নাড়ল রানা। ‘না। আপনার প্রতি আমাদের একটা টানও আছে। সেটাই আসল কারণ।’

‘টান আছে? হ্যাঁ, পবনের তো আছেই, কারণ সে আমার ভাই। কিন্তু আমাদের শব্দটা ব্যবহার করলেন কেন?’

এখনও হাত গুটিয়ে বসে আছে রানা। 'ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা বেশ কঠিন। তবু চেষ্টা করি। দেখুন, পবনকে আমি অত্যন্ত স্নেহ করি। এটাকে শুধু সহানুভূতি ভাববেন না। পবনের মধ্যে আমি আমার ছেলেবেলাকে খুঁজে পেয়েছি, ওর মধ্যে আমি আমার ভবিষ্যৎও দেখতে পাই।'

'ওকে যে স্নেহ করেন, সে তো আমি জানিই,' বলল পাখি। 'একটু হয়তো বেশিই করেন, যে জন্যে আশপাশে আর কে আছে না আছে দেখতেই পান না। কিন্তু ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে গেল না? আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না যে ওকে স্নেহ করেন বলে খানিকটা তাই আমাকেও করেন? স্নেহ জিনিসটা, আমি যতদূর জানি, বড়দের কাছ থেকে ছোটদের প্রাপ্য। আমি নিজেকে ঠিক পবনের মত অত ছোট ভাবতে পারি না। আমার বয়েস ছাব্বিশ।'

পাখি লক্ষ করল রানার চেহারা লালচে হয়ে উঠেছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা যাচ্ছে।

'না, আসলে...,' দ্বিধা ও সঙ্কোচে পড়ে অসহায় দেখাচ্ছে রানাকে। '...আসলে, সত্যি কথা বলতে কি, একটা ভয়, একটা সংস্কার আমাকে আপনার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে...বললাম না, ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করা কঠিন!'

'কিসের ভয়? কিসের সংস্কার?' পাখি বিস্মিত।

গম্ভীর মুখে রানা বলল, 'স্নেহ-ভালবাসা শুধু ছোটদের প্রাপ্য, এ-কথা আমি স্বীকার করি না।'

'কিসের ভয়? কিসের সংস্কার?' উত্তর পাবার জন্যে জেদ ধরল পাখি।

'পবনের বোন যদি ভেবে বসেন তাকে আমি বাড়িতে নিয়ে এসে অন্যায় সুযোগ নিতে চাইছি, এই ভয়। পবনকে আমি নিজের আপন ভাইয়ের মত দেখি, তার বোনের সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকা উচিত নয়, এই সংস্কার।'

'বলুন সেকেলে ভয়, সেকেলে সংস্কার।'

'কি?'

চোখ রাঙাল পাখি, বলল, 'হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন? টেবিলে যা আছে সব খেয়ে উঠতে হবে।'

আঁতকে উঠল রানা। 'কি বলছেন!'

'কোন কথা নয়। যা বলছি শুনুন। আমার হাতের রান্না নাকি মিস করছেন আপনারা? প্রমাণ করুন!'

'ঠিক আছে,' অগত্যা রাজি হলো রানা, আবার খেতে শুরু করল।

পাখি সিদ্ধান্ত নিল, আলোচনাটা এখানেই শেষ হওয়া উচিত। তার ক্ষোভ বা অভিমান, কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, মনটা বোধহয় সেজন্যেই আনন্দে নাচছে। এই আনন্দটুকুই তার দরকার ছিল।

সবশেষে চোখের পাতা আর পাপড়ি রঙ করলেন ন্যানি, খুবই সূক্ষ্ম ব্রাশ ব্যবহার করলেন। পিছিয়ে গেলেন, সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করলেন নিজের কাজ। সন্তুষ্ট হয়ে হাসলেন, ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিলেন আয়নাটা। দাঁড়াল পাখি, হেঁটে এল আয়নার সামনে। কামরাটা ফিল্ম বা টিভির মেক-আপ রুমের মত করে সাজানো,

চারদিক থেকে উজ্জ্বল আলো ফেলার ব্যবস্থা আছে। এটা ন্যানির আলাদা ব্যবসা, বিউটি পারলার, তাঁর ব্রথেল থেকে অনেকটা দূরে। আয়নায় নিজের দিকে তাকাতেই অস্ফুট বিস্ময়-ধ্বনি বেরিয়ে এল পাখির গলার ভেতর থেকে। অপরূপ সুন্দর এক কিশোরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে, যার বয়েস কোনমতেই পনেরো কি ষোলোর বেশি হবে না।

আয়নার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল পাখি, তারপর ঘুরল সে। 'অ্যামেচারদের পক্ষে এ সম্ভব নয়।'

'আগেই বলেছি, আমার লোকজন চালায় এই বিউটি পারলার,' বললেন ন্যানি। 'তবে এক কালে এই পেশায় ছিলাম বৈকি। রুমানিয়ার মেয়ে আমি, চসেস্কুর আমলে ছোটখাট চরিত্রে অভিনয়ও করেছি। চসেস্কুর কয়েকটা প্রপাগাণ্ডা ফিল্মেও কাজ করেছি। শয়তানটার পতনের সময় কাগজে আমি একবার খবরও হয়েছিলাম। অনেক মেয়ের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সে, তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম।'

'কিন্তু আপনি এ লাইনে এলেন কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল পাখি।

ম্লান হাসলেন ন্যানি। এ লাইন বলতে কি বোঝাতে চাইছে পাখি, জানেন তিনি। 'সে অনেক লম্বা কাহিনী। চসেস্কুর পতনের আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে গিয়েছিল আমার। দেশ রাহু মুক্ত হলো ঠিকই, কিন্তু সেখানে টিকতে পারলাম না। নোংরা পেশায় একবার নাম লেখালে মেয়েরা কোনদিন সেখান থেকে উদ্ধার পায় না। আত্মীয়-স্বজনরা ঠাঁই দিল না, সমাজ এড়িয়ে যেতে চাইল। বাধ্য হয়ে দেশ ছাড়লাম।'

পাখির খুব কৌতূহল হচ্ছে। 'তারপর?'

'গেলাম জার্মানীতে। আমেরিকান আর্মির এক মেসে ঘর মোছার চাকরি পেলাম। ওখানে এক অফিসার আমাকে ···বুঝতেই পারছ। প্রেগন্যান্ট হলাম, কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার করতে রাজি হলো না সে।' কাঁধ ঝাঁকালেন ন্যানি। 'যাই হোক, মেয়েটা বাঁচল না, জন্মের সময়ই মারা গেল···'

'দুঃখিত,' বলল পাখি। 'তারপর আপনি কি করলেন?'

হাতঘড়ি দেখলেন বৃদ্ধা, তারপর ড্রিঙ্ক কেবিনেটের দিকে এগোলেন। 'কিছু মনে কোরো না, আমাকে দু'ঢোক হুইস্কি খেতে হবে। না, তোমাকে অফার করব না। রানা আমাকে যা বলার বলে দিয়েছে। তবে কোক আছে, নিতে পারো।'

নিজের জন্যে গ্লাসে হুইস্কি ঢালছেন ন্যানি, আবার আয়নার দিকে তাকিয়ে পাখি ভাবল, সে কি স্বপ্ন দেখছে? লন্ডন থেকে কাল রাতের শেষ ফ্লাইটে ব্রাসেলসে এসেছে ওরা। এয়ারপোর্টে নামার পর ন্যানি আর তাঁর ব্রথেল সম্পর্কে পাখিকে সব কথা জানিয়েছে রানা।

'আপনি বলতে চাইছেন, একটা ব্রথেলে আপনার আসা-যাওয়া আছে?' জিজ্ঞেস করেছিল পাখি, গলায় শুধু অবিশ্বাস নয়, আতঙ্কও ছিল।

'ওদের জন্যে ব্রথেল, আমার জন্যে সেফ হাউস,' জবাব দিয়েছে রানা। 'ওদের ব্যবসার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। শুধু বাধ্য হলে ওখানে মাঝে-মধ্যে আশ্রয় নিই। আপনারা দু'জন সঙ্গে না থাকলে এবারও ওখানে উঠতাম। তবে ন্যানির

সঙ্গে আপনার দেখা হবে। তাঁর একটা বিউটি পারলার আছে শহরে। আর, পবনকে ন্যানির ব্রথেলে একবার নিয়ে যেতে হবে।'

ন্যানির সঙ্গে রানার সম্পর্ক পরিষ্কার বোঝার পর পাখি বলেছিল, 'ঠিক আছে, তাহলে হোটেলে ওঠার দরকার নেই। আপনি যখন বলছেন নিরাপদ, সবাই ন্যানির ওখানেই উঠি চলুন।'

'কি!' রানা অবাক। 'আপনার ভয় করছে না?'

'ভুলে গেছেন, আমি অভিনেত্রী?' হেসে উঠে জবাব দিয়েছে পাখি। 'একজন অভিনেত্রীর সব রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার, তাকে সব পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেয়া শিখতে হয়।'

'মাফ করবেন, ওখানে আপনাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়,' পাখির প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছে রানা। 'অন্তত রাত কাটাবার অনুমতি আমি দিতে পারি না। হতে পারেন আপনি অভিনেত্রী, তবে বাঙালী মেয়েদের সুনাম বলে একটা কথা আছে, সেটা আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না। তবে ন্যানির বার-এ যখন খদ্দের থাকবে না তখন একবার যাওয়া যেতে পারে। পরিবেশটাও দেখবেন, আমার কাজও হবে।'

'বললেন ন্যানির সঙ্গে আমার দেখা হবে। কখন? আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে।'

'অপেক্ষা করুন,' জবাব দিয়েছে রানা। 'ব্যাপারটা আপনি উপভোগ করবেন।'

এয়ারপোর্ট থেকে সোজা বাংলাদেশী এক হোটেলে চলে এল ওরা। রানার ভাষায় এটাও একটা নিরাপদ আশ্রয়, তবে শুধু আর কোন উপায় না থাকলে ব্যবহার করা যায়। রাতেই ন্যানিকে ফোন করে রানা, সকালে ওদের হোটেলে নিজেই চলে এলেন ন্যানি।

ন্যানিকে দেখে চোখে ধাঁধা লেগে গেল পাখির। তার আদর্শ অভিনেত্রী এলিজাবেথ টেলরের সঙ্গে এত মিল! ন্যানির পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে জানে বলেই আড়ষ্ট বোধ করছিল সে, তবে দু'মিনিট না কাটতেই মধুর ব্যবহারে তাকে আপন করে নিলেন মহিলা।

রানা খুব সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, 'ইনি পাখি, আমার মেহমান। পবন, পাখির ভাই, আমার ছাত্র। আর উনি ন্যানি, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী।'

সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন ন্যানি।

রানা বলল, 'বিকেলে আমরা একবার আপনার বার-এ যাব, বটলনেক টু-র সঙ্গে দেখা করব। তারপর আমরা অন্য এক জায়গায় যাব। এই সময়টায় পাখিকে নিয়ে আপনি আপনার বিউটি পারলারে থাকবেন। সম্ভব?'

'খুব সম্ভব। কিন্তু বিউটি পারলারে কেন?' জানতে চাইলেন ন্যানি।

'কারণ, আমি চাই,' বলল রানা, 'আপনি ওর বয়েস দশ বছর কমিয়ে দেবেন। আর, সম্ভব হলে, আরও যেন সুন্দরী দেখায় ওকে। চুল হতে হবে সোনালি। ভুরু, চোখের পাপড়ি, হাতের লোম, সব সোনালি হবে।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল পাখি, তবে সে কিছু বলার আগে তার হাত ধরে আলোর দিকে টেনে আনলেন ন্যানি, চিবুকে হাত দিয়ে মুখটা নানাভাবে

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল করে দেখলেন। তারপর হাসলেন তিনি, বললেন, 'দশ বছর কমিয়ে দেয়া কোন ব্যাপার না। তবে আরও সুন্দর করা সম্ভব নয়, কারণ এমনিতেই অসম্ভব সুন্দর ও। আমি বড়জোর খানিকটা চাকচিক্য এনে দিতে পারি।'

রানা বলল, 'সেটাই আমার দরকার।'

হাতে গ্লাস নিয়ে সোফায় বসলেন ন্যানি, আরেকটা গ্লাসে কোক ঢেলে পাখির সামনে আগেই রেখেছেন। গল্পের খেই ধরে আবার তিনি শুরু করলেন।

বাচ্চাটা হারাবার পর দেহ ব্যবসাকে পেশা হিসেবে নিতে বাধ্য হলেন তিনি। তবে খুব কঠিন সময়ের মুখে পড়তে হলো তাঁকে। বয়েস বেশি হয়ে গেলে এই ব্যবসায় সুবিধে করা যায় না। জার্মানীতে সুবিধে করতে না পেরে চলে এলেন ইটালিতে, ইচ্ছে চেষ্টা করে দেখবেন ভদ্রভাবে বেঁচে থাকার কোন উপায় হয় কিনা। কিন্তু কপাল মন্দ, ইটালিতে এসে মাফিয়াদের খপ্পরে পড়ে গেলেন। ওরা তাঁকে বিক্রি করে দিল এক মিশরীয় এজেন্টের কাছে। সেই এজেন্ট তাকে আরও কয়েকটা মেয়ের সঙ্গে পাঠিয়ে দিল কায়রোয়, সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট একটা ব্রথেলে। এখানে খাটতে হত খুব বেশি, তবে আয়ও ভাল ছিল।

সব মিলিয়ে দু'শো মেয়ে ছিল সেখানে। সব কিছু ঘড়ির কাঁটা ধরে চলত। প্রতিটি মেয়ের জন্যে একটা করে খুপরি ছিল। নির্দিষ্ট সময় পরপর একজন করে অফিসার বা সৈনিক আসত। প্রতিদিন আট ঘণ্টা করে কাজ করতে হত সবাইকে। শরীরে শক্তি বলতে কিছু থাকত না।

'ওখানেই কি মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় আপনার?' জিজ্ঞেস করল পাখি।

'ব্রথেলে নয়,' জবাব দিলেন বৃদ্ধা। 'ওই ছেলে কখনোই কোন ব্রথেলে যায়নি। ওর সঙ্গে আমার দেখা হয় হাসপাতালে।'

'হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ, সে সময় মিশরীয় অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডকে ট্রেনিং দিচ্ছিল রানা। ওর স্কোয়াডের এক সার্জেন্ট একবার আমার খুপরিতে এল। লোকটা কোত্থেকে কে জানে এক বোতল মদ যোগাড় করেছিল, খেয়ে মাতাল হয়ে যায়। খুপরিতে ঢুকে ঠিক একটা জানোয়ারের মত আচরণ শুরু করল। খুপরিতে বোতাম ছিল, বিপদ হলে সাহায্য চাওয়ার জন্যে। লোকটা ছুরি বের করে মারতে এল আমাকে, বাধ্য হয়ে বোতামে চাপ দিলাম আমি। মেয়েদের রক্ষার জন্যে ব্রথেলে গার্ড ছিল, কিন্তু তারা পৌঁছুতে দেরি করে ফেলে। লোকটা আমার বুকে আর পেটে ছুরি মারে। হুঁশ ফিরল হাসপাতালে।'

'তারপর?'

'লোকটা রানার অ্যান্টি-টেরোরিস্ট স্কোয়াডের সদস্য ছিল,' বললেন ন্যানি। 'কোর্ট মার্শালে দু'বছরের সাজা হয় তার, তবে গ্রেফতার হবার আগেই রানা তাকে পিটিয়ে প্রায় লাশ বানিয়ে ফেলে। অবশ্য সে-কথা পরে জানতে পারি আমি।'

তার আগে ন্যানিকে হাসপাতালে দেখতে যায় রানা। ওর স্কোয়াডের একই লোক কাজটা করায় খুবই বিব্রত বোধ করছিল ও। ন্যানির জন্যে ফুল আর চকলেট

নিয়ে গিয়েছিল।

'এভাবেই ছেলেটার সঙ্গে আমার পরিচয়,' এক গাল হেসে উপসংহার টানলেন বৃদ্ধা।

মেক-আপ রুমের দরজা খুলে যাচ্ছে দেখে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পাখি। ঘন নীল ভেলভেট স্কার্ট হাত দিয়ে সমান করল সে, সোনালি সিল্ক ব্লাউজ টেনে-টুনে ঠিক করে নিল। মুখ তুলে যখন তাকাল, ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছে ওরা। তার নতুন চেহারা দেখে প্রশংসা ফুটল রানার চোখে। আর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল পবন।

ছয়

রাতে বেলেন্ডা ও ম্যাক-এর নতুন রেস্তোরাঁয় ডিনার খেলো ওরা। এখনও লম্বা স্কার্ট আর সিল্ক ব্লাউজ পরে আছে পাখি, রেস্তোরাঁয় উপস্থিত অন্যান্য মেয়েদের তুলনায় 'ওভারড্রেসড'-ই বলতে হবে তাকে। ব্যাপারটা সে গ্রাহ্য করল না। নিঃসঙ্গ পুরুষ যারা উপস্থিত রয়েছে, আড়চোখে তাদের তাকানোটা উপভোগ করছে সে। ব্যাপারটা খেয়াল করে হাসল রানা। 'না, পাখি। ন্যানিকে আমরা সঙ্গে করে গোজোয় নিয়ে যাচ্ছি না।'

হেসে উঠে পাখি বলল, 'যাই বলুন, অনুভূতিটা সত্যি অদ্ভুত। যেন সত্যি সত্যি আমার বয়েস দশ বছর কমে গেছে!'

রেস্তোরাঁর চারদিকে তাকাল সে। মাত্র আটটা টেবিল, সাতটাতেই লোকজন আছে। ডান পাশের একটা দরজা দিয়ে বার-এ যাওয়া যায়। ওদিকটা ম্যাক সামলায়। ইতিমধ্যে বেলেন্ডা ও ম্যাক সম্পর্কে তাকে জানিয়েছে রানা। ওরা যখন ঢুকল, কিচেনে ছিল বেলেন্ডা। খবর পেয়ে ছুটে এল সে। ওরা যে আসছে, ফোন করে তাকে আগেই জানিয়েছিল রানা।

ওদেরকে খাতির করে বসাল বেলেন্ডা, বলল মেন্যু দেখার দরকার নেই, ওরা আসছে শুনে স্পেশাল কিছু রান্না করছে সে। এরপর ম্যাককে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল, তারপর আবার ছুটল কিচেনের দিকে।

ওরা অপেক্ষা করছে, পাখি জানতে চাইল, 'আমার পরনে এত দামী পোশাক কেন? আমার বয়েসই বা দশ বছর কমিয়ে দেয়া হলো কি মনে করে?'

'এটা একটা এক্সারসাইজ,' বলল রানা। 'কি বলেছিলেন মনে নেই?'

'কত সময় কত কথাই তো বলেছি...'

'বলেননি, লিখেছিলেন—আমি আপনাদের কোন কাজে লাগলাম না, এই দুঃখটা রয়ে গেল। মনে পড়ে?'

'পড়ে।' চিঠিটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সামান্য বিব্রত বোধ করল পাখি। 'তারমানে কি এবার আমাকে কাজে লাগানো হবে?'

'জী।'

'এসব বাদ দিন তো। আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন না?'

'যদি অনুমতি দাও। আর যদি তুমিও তুমি বলো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলেন...'

মাথা নাড়ল রানা। 'ভুল করছেন।'

'ঠিক আছে, কি যেন বলছিলে?'

'এবার তোমাকে কাজে লাগাবার কথা ভাবছি।'

'ব্যাখ্যা করো। আমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

'এর জন্যে সেলার্ভিক বেলোভিচ নামে এক লোককে দায়ী করতে হয়।' পাখি লক্ষ করল, নামটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কঠিন হয়ে উঠল রানার চেহারা। চট করে একবার পবনের দিকে তাকাল সে, বুঝল সেলার্ভিক সম্পর্কে সে-ও সব কথা জানে।

'খুলে বলুন...বলো।'

'মেলানজিক বেলোভিচের ছেলে সে। সাউদিয়া একশো তিনে বোমা রাখার আয়োজনটা এই মেলানজিকই করেছিলেন।' মেলানজিকের অর্গানাইজেশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিল রানা।

ও থামতে পাখি আবার জানতে চাইল, 'কিন্তু আমার এই পোশাক আর সোনালি চেহারার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক হলো—স্বর্ণকেশী স্ক্যান্ডানেভিয়ান কিশোরীদের ওপর সেলার্ভিকের সাঙ্ঘাতিক দুর্বলতা আছে। জেনারেল কমান্ডের প্রতিনিধি হিসেবে দু'বছর সুইডেনে অপারেশন চালিয়েছে সে। দুর্বলতাটা তখনই সৃষ্টি হয়। অসংখ্য সুইডিশ মেয়ের সঙ্গে রাত কাটিয়েছে সে, তাদের সবাই কিশোরী ছিল, ছিল স্বর্ণকেশী।'

'আমাকে কি করতে হবে?' একটু ম্লান দেখাল পাখিকে। 'মানে ঠিক কি চাইছেন আপনি?'

'ছেলের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে বাপকে ধরা যায় কিনা ভাবছি,' জবাব দিল রানা।

'কিন্তু আমি সুন্দরী নই, আমার চুলও সোনালি নয়। সোনালি করা হয়েছে বটে, কিন্তু এ তো ধরা পড়ে যাবে।'

পবন বলল, 'আপা, বিনয় বাদ দিলে হয় না?'

হাত তুলল পাখি। 'মারব এক চড়।'

'মেক-আপ ছাড়াও তুমি অদ্ভুত সুন্দর, নিজেও সে-কথা জানো,' বলল পবন। 'সেজন্যেই তো অভিনয় শেখার জন্যে জেদ ধরেছিলে, আমার মনে নেই ভেবেছ?'

রানা বলল, 'আরও এক দু'বার তোমার চুলের যত্ন নেবেন ন্যানি। তারপর যতভাবেই পরীক্ষা করা হোক, তোমার চুল যে কালো ছিল তা কেউ টের পাবে না।'

কিচেন থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে, অনেকটাই বেলেন্ডার মত দেখতে। তার হাতে বিশাল একটা কালো রঙের মেটাল পট। টেবিলের মাঝখানে রাখল সেটা, তারপর ঢাকনি তুলল।

'বেলেন্ডার বোন,' বলল রানা।

পাখি জিজ্ঞেস করল, 'কি ওতে?' তাকিয়ে আছে পটের ভেতর।

বেলেন্ডার ছোট বোন জবাব দিল, 'এটা আমার দাদীমার রেসিপি। সেই দুপুর থেকে ধীরে ধীরে রান্না করা হয়েছে। এর নাম পট-অউ-ফিউ।'

এক বিকেলে হোয়াইট হাউসে ডাক পড়ল সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফারের।

পথ দেখিয়ে ওভাল অফিসে নিয়ে আসা হলো তাঁকে। উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর গ্লাসটা নিজের হাতে হুইস্কি আর সোডায় ভরে দিলেন। ওখানে এফবিআই-এর ডেপুটি ডিরেক্টর লী আলেকজান্ডারও উপস্থিত রয়েছেন, হাতে একটা গ্লাস—সিরিয়াস দেখাচ্ছে তাঁকে, সেই সঙ্গে মনে হলো প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছেন।

সবাই বসার পর প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ডেভিড, রাজনৈতিক কারণে মিডিয়াকে বলা যাচ্ছে না, তবে প্রমাণ সহ রিপোর্ট পাওয়া গেছে মিডলটন বম্বিং-এর জন্যে বসনিয়া জেনারেল কমান্ডই দায়ী। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সার্বদের ব্যবহার করেনি তারা, কাজে লাগিয়েছে সৌদি অ্যারাবিয়ান, লিবীয়ান, সিরিয়ান আর সম্ভবত ফ্রিল্যান্স কিছু লোককে। তবে পরিকল্পনাটা বসনিয়া সার্ব চরম পন্থী টেরোরিস্টদেরই।' সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি, আরও দৃঢ় শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর, 'রিপোর্ট গোপন রাখলে গ্রেফতার করা বা শায়েস্তা করা কি রকম কঠিন তুমি তো বোঝোই।'

মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর।

'তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তুমি অনুরোধ করায় এফবিআই ডিরেক্টরকে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম তোমার ওপর ওরা যেন নজর না রাখে। তখন তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, আমি যদি এফবিআইকে কোনও সাহায্য করার অনুরোধ করি, তুমি আমার সে অনুরোধ রক্ষা করবে। ঠিক আছে?'

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'এখন আমি তোমার সাহায্য চাই, ডেভিড।'

সিনেটর বললেন, 'আমি আমার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করব।'

'গুড।' আলেকজান্ডারের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট, বললেন, 'লী, আমি কিছু জানতে চাই না। কেউ যেন আমাকে না শোনায় যে সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার ব্যাপারটার সঙ্গে অন্য কোনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছেন। আমি এমন কি এ-ও চাই না যে কেউ জানুক এখানে আমরা তিনজন মিলিত হয়েছি বা আলাপ করেছি। কি বলছি বুঝতে পারছ তো? আমি কোন ওয়াটারগেট, ইরানগেট কিংবা অন্য কোন গেট চাই না। ঠিক আছে?'

দৃঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন আলেকজান্ডার। 'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'চাই না সিআইএ-তে কোন ইন্টারন্যাল মেমো বিলি করা হোক, যাতে আমার বা সিনেটর ডেভিডের নাম থাকবে। তাহলে আমি কি চাই?' একটু থেমে নিজেই উত্তর দিলেন প্রেসিডেন্ট, 'আমি চাই, এক দিন একটা রিপোর্ট পাব, তাতে বলা হবে ওই ব্যাপারটার সঙ্গে যারা জড়িত ছিল তাদেরকে অজ্ঞাতপরিচয় তৃতীয় কোন পার্টি হয় গ্রেফতার করেছে, নয়তো দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে।'

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট, সিনেটরের দিকে তাকালেন, গম্ভীর হেসে বললেন, 'এবার বলো, ডেভিড। ট্যাক্স বিলে কাল তুমি কি বিপক্ষে ভোট দেবে?'

সিনেটর হাসলেন। 'স্বভাবতই অনুকূলে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

মেলানজিক বেলোভিচ ধৈর্য ধরতে জানেন। একজন টেরোরিস্টের এই গুণ থাকা জরুরী। তবে একটানা তিন হপ্তা দানিয়ুবের তীরে ট্রেনিং ক্যাম্পে থাকার পর তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটার উপক্রম হয়েছে। বেলগ্রেডের কসমোপলিটান সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনি, বঞ্চিত হচ্ছেন তাঁর দুই মিসট্রেসের সান্নিধ্য থেকে। ক্যাম্পের কোন 'সৈনিক' বা অফিসারের নারী সঙ্গ পাবার অনুমতি নেই, তিনি যদি পাবার ব্যবস্থা করেন সেটা হবে খারাপ একটা দৃষ্টান্ত।

এক সময় তাঁর মনে হলো, হুমকিটাকে খুব বড় করে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া, তাঁর মত একজন ব্যক্তির আতঙ্কিত হয়ে পালিয়ে থাকা শোভা পায় না। সিদ্ধান্ত নিলেন, আবার তিনি বেলগ্রেডে ফিরে যাবেন।

আর্মড এসকর্ট-এর ব্যবস্থা করা হলো। বেলগ্রেড হেডকোয়ার্টারে ফিরে এলেন তিনি। সঙ্গে নিলেন এক ছেলে, গোরাজদিক বেলোভিচকে। তাঁর অপর ছেলে, সের্গেই সেলার্ভিক বেলোভিচ, দিন কয়েক আগে রাশিয়া ও জার্মানী সফর করে ফিরে এসেছে বেলগ্রেডে। হেডকোয়ার্টারে পৌঁছেই একটা মীটিং ডাকলেন তিনি। মীটিঙে তাঁর দুই ছেলে, তাঁর চীফ অভ স্টাফ পিটার মেলভিক থাকল। এই প্রথম পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত একটা ধারণা দিলেন তিনি, এবং কর্নেল পেত্রোভিচের সরবরাহ করা ফাইলটাও ওদেরকে দেখতে দিলেন।

সৈলার্ভিক ব্যাপারটাকে হালকা করে দেখল। সে বলল, 'একজন লোক কি করতে পারে? বছরের পর বছর ধরে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর ইন্টেলিজেন্স আপনাকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। বুঝতে পারছি না ব্যাপারটাকে আপনি এত সিরিয়াসলি নিচ্ছেন কেন।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল গোরাজদিকও। 'আমিও তাই বলি। একা একটা লোক কি করতে পারে?'

কিন্তু পিটার মেলভিককে উদ্বিগ্ন দেখাল। ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছেন তিনি, থমথম করছে চেহারা। ফাইলের ফটোগুলোর ওপর স্থির হয়ে থাকল তাঁর চোখ। বললেন, 'একজন লোক, সত্যি কি তাই? কিন্তু সে আমাদের এত আয়োজন ব্যর্থ করে দিয়েছে—সিনেটর ক্রিস্টোফারকে আমরা ধরতে পারিনি। একজন বলা ঠিক হচ্ছে না। তার সঙ্গে আরও লোক আছে, সবাই তারা দক্ষ।'

তাঁর যুক্তি মানল না গোরাজদিক। ফাইলের দিকে আঙুল তাক করে বলল, 'একদল সাধারণ ক্রিমিনালকে হারিয়ে দিয়েছে ওরা। জেনারেল কমান্ডের সঙ্গে কোন মাফিয়া গ্যাঙের আপনি তুলনা করতে পারেন না।' বাপের দিকে ফিরল সে। 'উচিত ছিল আমাদের নিজেদের লোক দিয়ে অপারেশন করানো।'

মাথা নেড়ে মেলানজিক গম্ভীর সুরে বললেন, 'তাতে সময় অনেক বেশি লাগত। তাছাড়া, ইউরোপে বর্তমানে আমরা আগের মত শক্তিশালী নই। সার্বদের মিত্রের

সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তারাও আমাদের সন্ত্রাসী কাজগুলো সমর্থন করে না।' চীফ অভ স্টাফ মেলভিকের দিকে তাকালেন। 'আমি ওর সঙ্গে একমত। হুমকিটা সিরিয়াসলি নিতে হবে।'

'কিন্তু কেন?' গোরাজদিক তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না।

'এই জন্যে যে কোনও কোনও সময় একটা সেনাবাহিনী যা করতে পারে না, মাত্র একজন লোক তা করতে পারে। আমরা বসনিয়া মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে সাবোটাজ করার জন্যে নিঃসঙ্গ ফাইটারকে পাঠিয়েছি। একবার নয়, বহুবার। বেশিরভাগই মারা গেছে তারা, তবে প্রত্যেকেই যে যার কাজে সফল হবার পর। এর কারণ হলো দেশপ্রেম ও শত্রুর প্রতি তীব্র ঘৃণা।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সেলার্ভিক, হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন মেলানজিক। ইঙ্গিতে ফাইলটা দেখালেন তিনি, তারপর আবার শুরু করলেন, 'এই লোক, মানে, মাসুদ রানার ওই একই ধরনের মোটিভ রয়েছে। আমরা যদি নিজেদের কাছে সৎ থাকি তাহলে স্বীকার করতে হবে যে আমাদের যে-কোন সৈনিকের চেয়ে তার অভিজ্ঞতা ও ট্রেনিং অনেক ভাল।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন সে নিজের মৃত্যুরও পরোয়া করে না?' জিজ্ঞেস করল গোরাজদিক।

'হ্যাঁ, আমি ঠিক সে-কথাই বলতে চাইছি। হতে পারে এর কারণ সে মুসলমান, শহীদ হবার আকাঙ্ক্ষা আছে, জানে বিধর্মী একজন লোককে মারতে এসে শহীদ হয়ে গেলে বেহেশতে যেতে পারবে।' একে একে তিনজনের দিকে তাকালেন মেলানজিক। 'তোমাদের কারও কোন সাজেশন আছে?'

সেলার্ভিক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করে তাকে আমাদের মেরে ফেলা উচিত।'

'তাহলে বলো কাজটা কিভাবে করা সম্ভব?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করলেন মেলানজিক। 'তার ঘাঁটি কোথায় আমরা তা জানি না। এমন কি সে কোন্ মহাদেশে আছে তা-ও জানা যায়নি। এই মুহূর্তে সে যদি বেলগ্রেডেও থেকে থাকে, আমি আশ্চর্য হব না।'

কামরার ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর চিন্তিত সুরে মেলভিক বললেন, 'কিন্তু একটা ঘাঁটি তার না থেকেই পারে না। লোকটা একা কাজ করে কি না, এ-ব্যাপারে আমার সন্দেহ আছে। সূত্র পেতে হলে তার ব্যাক-গ্রাউন্ড সার্চ করে দেখতে হবে, জানতে হবে অতীতে কারা তাকে সাহায্য করছে, কাদের সঙ্গে ওঠা-বসা ছিল।'

মেলানজিক বললেন, 'তার সম্পর্কে বহু কিছু জানি আমরা। তথ্যের কোন অভাব নেই। কিন্তু সে-সব তথ্য আমাদের কোন কাজে আসছে না।' ইঙ্গিতে ফাইলটা আবার তিনি দেখালেন। 'ওতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অন্যতম সেরা এজেন্ট সে। একটা প্রাইভেট এজেন্সির ডিরেক্টরও, যদিও এজেন্সিটাকে বিসিআই-এর একটা কাভার বলে সন্দেহ করা হয়। তার খ্যাতি সম্পর্কেও সমর্থিত-অসমর্থিত নানা খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু এ-সব তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে না এই মুহূর্তে সে কোথায় আছে বা কি করছে।'

'তাহলে উপায়?' জিজ্ঞেস করল সেলার্ভিক।

'উপায় ধৈর্য ধরে লেগে থাকা,' জবাব দিলেন মেলভিক। 'চোখ-কান খোলা রেখে অপেক্ষা করতে হবে।' মেলানজিকের দিকে ফিরলেন তিনি। 'বস্, ব্যাপারটা দু'একদিনের জন্যে আমার ওপর ছেড়ে দেয়া যায়? ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে চিন্তা-ভাবনা করতে দিন।'

'শুধুই চিন্তা-ভাবনা করতে চাও?'

'না, বলছি না যে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব। ইউরোপে কাউকে পাঠাতে চাই আমি, সম্ভবত প্যারিসে। পাঠালে রাদভিককে পাঠাব। তার ধৈর্য আছে, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞও বটে। তাকে পাঠাতে হলে কর্নেল পেত্রোভিচের সহযোগিতা দরকার হবে।'

'সেটা কোন সমস্যা নয়,' বললেন মেলানজিক। গোরাজদিককে বললেন, 'এদিকে আমি অন্য একটা জরুরী কাজ করতে যাচ্ছি। বোমাটা প্লেনে রেখে আসার কাজে যারা সাহায্য করেছিল, সেই দু'জন সৌদি অ্যারাবিয়ানকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করব।'

'সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা মানে?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল গোরাজদিক।

'মানে বোঝো না? দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নেবে ওরা।'

'কিন্তু কেন?'

ক্ষীণ হাসি ফুটল মেলানজিকের ঠোঁটে। 'ফলস ট্রেইল সৃষ্টি করার জন্যে। ফ্রেঞ্চ এসডিইসিই-তে আমাদের কনট্যাক্টকে ওদের নাম জানিয়ে দেব, সঙ্গে কিছু এভিডেন্সও দেব। এসডিইসিই সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ সরকার ও এফবিআই-কে জানিয়ে দেবে। এফবিআই-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে সিনেটর ক্রিস্টোফারের, তিনিও জানবেন, তাঁর কাছ থেকে জানবে এই ব্যাটা ম্লেচ্ছ মাসুদ রানা। ফলস ট্রেইল ধরে সে তখন দিক বদলাতে পারে, আমার বদলে টার্গেট করতে পারে হামাস বা ইসলামী জিহাদ গ্রুপের কোন লীডারকে।'

'ব্যাপারটা এত সহজ হবে না,' বললেন মেলভিক। 'সাধারণ যুক্তিই বলে, ইসলামী জিহাদ বা হামাস সাউদিয়ার কোন প্লেন উড়িয়ে দেবে না, বিশেষ করে প্লেনটায় যদি বাংলাদেশ ও বসনিয়ার মুসলমান কূটনীতিক আর আর্মি অফিসাররা থাকে।'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি, ডাইভার্ট করার সুযোগ কখনও ছাড়তে নেই,' বললেন মেলানজিক।

প্রতিবাদ করে সেলার্ভিকও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে তার বাপের চোখে এমন কিছু দেখল যে কথা বলতে সাহস পেল না। 'ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি বলল সে। 'আপনাকে কিছু করতে হবে না, ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিলেন মেলানজিক। এরপর গোরাজদিকের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি ক্যাম্পে ফিরে যাও। অপারেশন কোবরার সময় এগিয়ে আনতে চাই আমি, ব্যবস্থা করো মাসের শেষ দিকে কাজটা যেন করা যায়। আমি চাই না লোকে ভাবতে শুরু করুক যে আমরা ইনঅ্যাকটিভ হয়ে গেছি।' সেলার্ভিকের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুমি আমার বডিগার্ডদের চার্জ নিয়ে এখানেই

থাকো।' সবশেষে পিটার মেলভিককে বললেন, 'তোমার কাজ, বন্ধু, মাসুদ রানাকে খুঁজে বের করা। কিভাবে কি করবে আমি জানতে চাই না, শুধু রিপোর্ট পেতে চাই যে সে বেঁচে নেই।'

উপন্যাস লেখক হিসেবে জাঁ পল পেরো সম্পূর্ণ ব্যর্থ, যদিও ব্যাপারটা স্বীকার করতে একদম রাজি নন তিনি। ভাল কিছু লেখার জন্যে বছরের পর বছর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন তিনি, সেই সূত্রে ব্যাংক ম্যানেজারের সঙ্গেও। ঘটনাচক্রে এই ভদ্রলোক তাঁর বন্ধু।

দেখা হলে প্রতিবারই নরম সুরে পরামর্শ দেন ম্যানেজার ভদ্রলোক, 'বেস্ট সেলার উপন্যাসের কথা ভুলে যাও, বন্ধু। গোটা ফ্রান্সে তুমিই হলে সেরা ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট। নামী-দামী প্রতিটা নিউজপেপার আর ম্যাগাজিন অ্যাসাইনমেন্ট নেয়ার জন্যে তোমার হাতে-পায়ে ধরছে। ওদের কথায় রাজি হলে এতদিনে টাকার পাহাড় বানিয়ে ফেলতে তুমি। অথচ কি করছ? ব্রিটানির জঙ্গলে হপ্তার পর হপ্তা স্বেচ্ছা নির্বাসনে থাকছ, ছাই-পাঁশ কি লিখছ তুমিই জানো, ভাবছ একটা বোমশেল ছেড়ে দুনিয়াটাকে চমকে দেবে। জীবনের এমন নিষ্ফল অপচয় আমি আর দেখিনি।'

কিন্তু যত কথাই বলা হোক, পঞ্চান্ন বছর বয়েসে জাঁ পল পেরো উপলব্ধি করেছেন একটা উপন্যাসের আইডিয়া ক্যানসারের মত বাসা বেঁধেছে তাঁর ভেতর, ওটাকে কেটে বের করে আনতে হবে, তা না হলে তিনি বাঁচবেন না। আর তাই নির্জন ফার্মহাউসে দিনের পর দিন ভাঙাচোরা টাইপ রাইটার সামনে নিয়ে বসে থাকেন, প্রতিটি কাগজে কয়েক লাইন করে টাইপ করেন, তারপর ছিঁড়ে ফেলে দেন। এই টাইপ রাইটার তাঁর ত্রিশ বছরের সঙ্গী।

কিন্তু লেখকদেরও খেতে-পরতে হয়, আর এ-সব করতে টাকা লাগে। কাজেই তাঁর এজেন্ট প্যারিস থেকে ফোন করে আর্জেন্ট মীটিঙের কথা বলতে তোবড়ানো সিঁত্রো নিয়ে বেরুতেই হলো তাঁকে।

'আমি এর মধ্যে কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি।' এটা তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া, নির্দ্বিধায় প্রকাশও করলেন। 'প্রথমত, এক ঢিলে কয়েকটা পাখি মারতে চাইছে ওরা। সারা দুনিয়ার এলিট ফোর্স সম্পর্কে বই লিখতে বলছে, অতীত ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি সহ; তারপর বলছে এসপিওনাজ বা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলো সম্পর্কে কয়েকটা পরিচ্ছেদও রাখতে হবে। আচ্ছা, আপনিই বলুন, আমাকে কেন অনুরোধ করছে ওরা? মিলিটারি হিস্টোরিয়ান বা এক্সপার্টের তো কোন অভাব নেই দেশে।'

'আপনাকে অনুরোধ করার কারণ, বইটাতে মার্সেনারি সম্পর্কেও দু'একটা পরিচ্ছেদ রাখতে চাইছে ওরা,' জবাব দিলেন তাঁর এজেন্ট। 'সবাই জানে, মার্সেনারিদের সম্পর্কে আপনি একজন এক্সপার্ট। আপনার "উল্ভস্ অভ ওঅর" তার প্রমাণ।'

'একের ভেতর তিন!'

এজেন্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, 'অন্য কোন লেখক হলে যে টাকা অফার করত ওরা, আপনাকে অফার করছে তার তিনগুণ। অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের সমস্ত খরচ ওরা বহন করবে, আপনাকে দেবে দেড় লাখ ফ্রাঙ্ক। মাত্র একমাসের কাজ। এই সুযোগ কোন পাগলও তো ছাড়বে না।'

'অস্বীকার করছি না,' বললেন পল পেরো। 'তবে ব্যাপারটার মধ্যে কি যেন একটা গোলমাল আছে। অখ্যাত এক জার্মান প্রকাশক এ-ধরনের একটা বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হবে কেন? তাছাড়া, শুধু মুসলিম মার্সেনারি সম্পর্কে লিখতে বলছে। ফ্রেঞ্চ মার্সেনারি ডেনার্ড বা রোডেশিয়ান ম্যাক ম্যাকডোনাল্ড বাদ পড়বে কেন? দু'জনেই ওরা বেঁচে আছে এখনও। আরও অদ্ভুত ব্যাপার হলো, মুসলিম মার্সেনারিদের একজনের নাম বলে দেয়া হচ্ছে—ইমরুল হাসান। এটা একটা ওপেন সিক্রেট যে ইমরুল হাসান আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট, তার আসল নাম মাসুদ রানা, এবং তিনি বেঁচেও আছেন। বলা হচ্ছে, এই ভদ্রলোকের বর্তমান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। আরও উদ্ভট দাবি, সমস্ত তথ্য নিয়মিত প্রতি হপ্তায় ওদেরকে জানাতে হবে। কেন?'

'কে বলবে কেন,' জবাব দিলেন এজেন্ট। 'কি এসেই বা যায়? খরচের টাকা বাদেও অর্ধেক পারিশ্রমিক অগ্রিম পাবেন আপনি, বাকিটা পাবেন কাজ শেষ হলে। মাসুদ রানার অতীত সম্পর্কে সবই আপনার জানা আছে, দরকার শুধু এখনকার কিছু তথ্য। মুসলিম অন্যান্য মার্সেনারি সম্পর্কেও প্রায় সব তথ্য আপনার জানা। আপনি এক কাজ করতে পারেন, আরও সহজ হয়ে যাবে তাতে। রানা এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করুন, বলুন আপনি ভদ্রলোকের একটা সাক্ষাৎকার নিতে চান। আমার প্রশ্ন হলো, এ-ধরনের একটা অফার আপনি কি ফিরিয়ে দিতে পারেন?'

মাথা নাড়লেন জাঁ পেরো। 'তা যে পারি না আপনি খুব ভাল করেই জানেন। টাকাটা পেলে ব্যাংকের ওভারড্রাফট শোধ করা যায়।' চেয়ার ছেড়ে হাতঘড়ি দেখলেন তিনি। 'হপ্তা শেষ হবার আগেই মাসুদ রানার অতীত সম্পর্কে হাজার দশেক শব্দ ডাকযোগে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব আমি। তারপর ব্রাসেলসে যাব। ওখানে আমি এক পুরানো মার্সেনারিকে চিনি। যদিও সে মুসলমান নয়, তবে এক সময় মাসুদ রানার সঙ্গে কাজ করেছে।'

'ধন্যবাদ, মশিয়ে পেরো।'

গণেশ থাপা বিদায় নেয়ার পরও পাথরের মত স্থির হয়ে থাকা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে পবন। অন্যান্য বিষয়েও আগের মত ট্রেনিং নিচ্ছে ও।

ওর আঠারোতম জন্মদিনে রানা ওকে একটা সুজুকি জীপ উপহার দিল। আর ভাইকে পাখি দিল একটা রোলেক্স হাতঘড়ি। সেদিন পাজেরো তাজা সহ তাঁর পরিবারের সবাই ওদের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে এলেন। পরিবারের পক্ষ থেকে ওকে উপহার দেয়া হলো একটা শটগান। অনোরিয়া বললেন, 'এটা আমরা তোমাকে মানুষ মারার জন্যে দিচ্ছি না। গরম পড়ার শুরুতে আফ্রিকা থেকে হাঁস আসে, মাল্টা হয়ে চলে যায় ইউরোপে। আমি তোমাদের রেঁধে খাওয়াব।' সঙ্গে করে বাড়িতে তৈরি খানিকটা ওয়াইনও এনেছেন পাজেরো তাজা। মুসলমানরা যে

ওয়াইন খায় না তা তিনি জানেন। তবে এ-ও জানেন যে মাঝে মধ্যে এক-আধটু চেখে দেখে রানা। অবশ্য বললেন, 'এ আমরা নিজেরা খাব বলে এনেছি।'

দুপুরটা খুব আনন্দে কাটল। পবনের জন্ম দিন, কিন্তু বাড়িতে ঢুকেই পাখিকে সাজাতে বসলেন অনোরিয়া। মাল্টায় ও গোজোয় প্রচুর আরবের বসবাস, বিয়ের সময় ওদের মেয়েদের কিভাবে সাজানো হয় তা তিনি জানেন। পাখিকেও তিনি আরব নববধূর বেশে সাজালেন। প্রথমে প্রতিবাদ করল পাখি, তারপর হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল। তার প্রতিবাদের উত্তরে অনোরিয়া বললেন, 'অভ্যাস করো, বিয়ে তো একদিন হতেই হবে।'

রান্নার খানিকটা দায়িত্ব পালন করল পবন। আলু, শিম, মটরশুঁটি, মুলো, টম্যাটো, এই রকম আট-দশ রকম সবজি ও তরকারি দিয়ে 'গোজো স্পেশাল' রাঁধল সে, তার সঙ্গে সালাদ বানাল। আর রানা বাগানে আগুন জ্বেলে গোটা একটা ছাগল রোস্ট করল। পরিবেশন ছাড়া আর কোন কাজ করতে পাখিকে নিষেধ করে দিলেন অনোরিয়া।

লাঞ্চের পর টার্গেট প্র্যাকটিসের আয়োজন করল রানা। মাটির তৈরি কয়েকটা কবুতর ভাঙল ওরা। নিডো আর তার বাবা পাজেরো তাজা লক্ষ্যভেদে খুবই পটু, শতকরা সত্তর ভাগ সফল হলো। রানা ও পবন সফল হলো শতকরা একশো ভাগ।

'এ অবিশ্বাস্য!' মন্তব্য করলেন অনোরিয়া। 'আমার ছেলে সারা বছর গুলি করছে। অথচ পবন তাকেও হারিয়ে দিল। স্রেফ অবিশ্বাস্য!'

বন্দুকের প্রতিটি ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি ক্রমশ কাতর করে তুলছে পাখিকে। ব্রাসেলস থেকে গোজোয় ফেরার পর রানার সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন এক পর্যায়ে পৌঁচেছে, অবচেতন মনের প্রত্যাশাটা এখন তার কাছে অস্পষ্ট নেই, সে উপলব্ধি করতে পারছে দু'জনের এই ঘনিষ্ঠতা মধুর একটা মিলনে পৌঁছে পরিণত হবে এবং পরিণতি লাভ করবে। সে বুঝতে পারে, যে সংস্কারের কথা বলেছিল রানা, ওর মনে এখনও তার শিকড় রয়ে গেছে, এখনও দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে তার ব্যাকুল আহ্বানে সাড়া দিতে পারছে না ও। এমন কি আভাসে-ইঙ্গিতে এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করছে রানা যে তুমি আমার মেহমান ও আশ্রিতা, আমি কোন অন্যায় সুযোগ নিতে পারি না। পাখিও তাকে আকার-ইঙ্গিতে বলতে চেয়েছে, কেউ যদি নিজেকে ভালবাসার নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রিয় একজন পুরুষের হাতে তুলে দিতে চায়, সে যদি মনে করে তাতেই তার-জীবনের চরম সার্থকতা? আমাকে গ্রহণ করো, আপন করে তুলে নাও বুকে, এ-সব বলে তো আর আত্মসমর্পণ করা যায় না, তাই দূরত্ব মোচন করতে সময় লাগছে। তবে পাখির মনে দৃঢ় বিশ্বাস, এই রহস্যময় পুরুষটিকে একদিনের জন্যে হলেও একান্তে আপন করে পাবে সে। অন্তত সেভাবে পাওয়াই তার এখনকার সাধনা।

পাখির মন খারাপ, কারণ সেই সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। রানা তাকে জানিয়েছে, দু'একদিনের মধ্যেই পবনকে নিয়ে গোজোর বাইরে যাবে ও।

পবন যাবে সারায়েভোয়, বসনিয়ার রাজধানীতে, সঙ্গে থাকবেন ওর বসনিয়ান শিক্ষক। ওখানে সার্বদের খাবার খেতে অভ্যস্ত হবে সে, সার্ব-ক্রোট ভাষা শিখবে,

শিখবে চার্চে বসে কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তাদের সামাজিক রীতি-নীতি সম্পর্কে হাতে-কলমে পাঠ নেবে। ওকে সারায়েভোয় রেখে ইউরোপের অন্য কোন শহরে যাবে রানা, সেখানে ওর সঙ্গে সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফারের দেখা হবার কথা। তারপরই শুরু হবে ওদের অপারেশন।

রাতে ঝুল-বারান্দায় বসে পাখি জানতে চাইল, 'তুমি ফিরবে কবে?'

'কাজ শেষ হলে,' বলল রানা। 'কয়েক হপ্তা লেগে যেতে পারে।'

'আমার কি ভূমিকা?' ম্লান সুরে জিজ্ঞেস করল পাখি।

'তোমাকে সবচেয়ে কঠিন দায়িত্বটা পালন করতে হবে। তুমি মেসেজের জন্যে অপেক্ষা করবে এখানে। মেসেজ যদি আসে, ন্যানির মাধ্যমে আসবে। পরে তোমাকে আমার দরকার হবে।'

'কি করতে হতে পারে, একটা ধারণা দিতে পারো না?'

'সেলার্ভিক বেলোভিচকে ফাঁদে ফেলার জন্যে তোমাকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। কাজটা বিপজ্জনক, শারীরিকভাবে অপ্রীতিকর হতে পারে।'

'কি রকম বিপজ্জনক? মানে...'

'না-না, তোমার সম্মান হানি হবে না, তার আগেই তোমার পাশে পৌঁছে যাব আমি,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'তবে তার আগে লোকটা হয়তো তোমার হাত ধরবে, হয়তো বিছানার দিকে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে।'

'মন্দ কপাল,' বিড়বিড় করে বলল পাখি। 'যে মানুষ আমার হাত ধরবে বলে আশা করছি, এ লোক সে লোক নয়।'

'কি বলছ, পাখি?'

ম্লান হেসে পাখি বলল, 'না, কিছু না। শোনো, কাজটা যদি সত্যি জরুরী হয়, আমি করব।'

'বেশিক্ষণ চুলোয় রেখে পুড়িয়ে ফেলেছে সোল,' বলল রানা, গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে অ্যামবার লিকুইড-এর অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল।

'ফেরত পাঠান,' পরামর্শ দিলেন সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার।

স্যাভয় হোটেলের রিভারসাইড রেস্তোরাঁয়, জানালা ঘেঁষে ফেলা একটা টেবিলে বসে আছে ওরা। মাথা নাড়ল রানা। 'চীজ ট্রে না আসা পর্যন্ত পেট খালি থাকুক। তাছাড়া, বীফ স্টেকও তো আসছে।'

এফবিআই থেকে সর্বশেষ যে-সব তথ্য পেয়েছেন সব ইতিমধ্যে রানাকে জানিয়ে দিয়েছেন সিনেটর। তারপর বলেছেন, এখানে তিনি আসার কয়েক মিনিট আগে লী আলেকজান্ডার তাঁকে ফোন করেছিলেন। একটা মধ্যপ্রাচ্য সূত্র থেকে ফ্রেঞ্চ এসডিইসিই-কে বলা হয়েছে যে বোমাটা সাউদিয়া একশো তিনে প্রকৃত অর্থে রোপণ করেছিল সৌদি আরবের দু'জন নাগরিক। দু'জনেই তারা সৌদি ইন্টেলিজেন্স-এর এজেন্ট, এবং সৌদি রাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। একজনের নাম ফাহিম, মিডলটন ঘটনার সময় সাউদিয়া এয়ারওয়েজের স্টেশন ম্যানেজার ছিল মাল্টায়। ঘটনার পর সৌদি আরবে ফিরে গেছে সে। ধারণা করা হচ্ছে বোমাটা জার্নি শুরু করে ওই মাল্টা থেকেই।

'সম্ভব,' মন্তব্য করল রানা। 'সৌদি আরবে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী ও ইন্টেলিজেন্সের দুটো গ্রুপ গোপনে কাজ করছে অনেক দিন থেকে। এর আগেও তারা দেশের ভেতর স্যাবোটাজ করেছে। তবে, এক্ষেত্রে ওরা যদি জড়িত থাকেও, মাস্টারমাইন্ড ছিলেন মেলানজিক। অন্য কেউ পিছনে থাকলে সাব্বিরকে তিনি অত টাকা দিতেন না। না, মেলানজিকই আমার টার্গেট থাকছেন।'

'আমি একমত,' বললেন সিনেটর। 'তাহলে বলুন, আপনার প্ল্যান কি?'

রানা জানাল, 'প্ল্যান অনুসারে কাজ শুরু হয়ে গেছে। কাজটা শেষ হবে দেড় থেকে দুই হপ্তার ভেতর।'

সিনেটর নাছোড়বান্দা। স্টেক আসার পর জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজটা আপনি কিভাবে করতে যাচ্ছেন, আমাকে বলবেন না?'

রানা জবাব দিল, 'উনি মারা যাবেন বুলেটে। আপনাকে শুধু এইটুকুই জানাতে পারি, মি. ডেভিড। আরও একটা কথা বলতে পারি। ঘটনাটা বেলগ্রেডে ঘটবে, সার্বিয়ার রাজধানীতে।'

'টীমটা কত বড় হবে?'

'সব মিলিয়ে তিনজন আমরা। আমি, একজন অভিনেত্রী আর এক তরুণ।'

একটা ঝাঁকি মত খেয়ে মুখ তুললেন সিনেটর। 'আপনি...আপনি ওদেরকে ব্যবহার করছেন?'

'আমারও ধারণা ছিল, ওদের পরিচয় আপনি আন্দাজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, আপনি একা নন, ওরাও প্রতিশোধ নিতে চায়। আমি শুধু ওদেরকে সাহায্য করছি, যেমন আপনাকেও করছি।'

'কিন্তু আমি অংশগ্রহণ করছি না।'

'ওরা অংশগ্রহণ করছে স্বেচ্ছায়, মি. ডেভিড।'

'আমি তাহলে এখন ঝুঁকির পরিমাণ কতটুকু জানতে চাইব,' গম্ভীর সুরে বললেন সিনেটর।

'একটা মাত্র বুলেট দরকার হবে,' বলল রানা। 'ট্রিগার টানার জন্যে লাগবে একটা আঙুল।' দু'জনের মাঝখানে টেবিলে পড়ে থাকা ফোল্ডারটায় টোকা দিল ও। 'এতে বলা হয়েছে, দানিয়ুবের তীর অর্থাৎ ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে একটা আর্মড কনভয় নিয়ে বেলগ্রেডে ফিরে এসেছেন মেলানজিক। ক্যাম্পে বোধহয় তাঁর একঘেয়ে লাগছিল। তাঁর ছেলে সেলার্ভিকও রাশিয়া ও জার্মানী ঘুরে ফিরে এসেছে রাজধানীতে। আগামী দেড় দু'হপ্তায় বসনিয়া আর সার্বিয়ায় বার কয়েক আসা-যাওয়া করব আমি, কাভার নিখুঁত করার জন্যে। আপনি যখনই যে খবর পাবেন, ফোন করে জানিয়ে দেবেন—নম্বরটা আপনাকে দেয়া আছে।'

'ওদের সঙ্গে আপনিও থাকবেন, তাই না?' পাখি আর পবনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে সিনেটরের।

'অবশ্যই আমি থাকব,' বলল রানা। 'সবই তো আমি করব, ওরা শুধু প্রয়োজনে আমাকে সাহায্য করবে। ওদেরকে সঙ্গে রাখছি, ব্যাপারটা চাক্ষুষ করানোর জন্যে। অন্তত একজন একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার পাশে থাকবে।'

সিনেটর বললেন, 'সমস্ত খবর সময়মত পেয়ে যাবেন আপনি। এ বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনিও চান মেলানজিক মারা যান। কিভাবে, তা তিনি জানতে ইচ্ছুক নন। যে-কোন মহল থেকেই হোক, তাঁকে বলা হয়েছে এ-কাজের জন্যে আপনিই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। এর বেশি কিছু জানতে চান না।'

'আপনাকে আমি আর শুধু একটা কথা বলতে পারি, মি. ডেভিড। লুদভিক মেলানজিক বেলোভিচ একটা মাত্র বুলেটে মারা যাবেন। বোমাটা ফাটার সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে জুডি, ভায়োলা আর বৃষ্টি। অনেকেই বলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু মানেই সহজ মৃত্যু। কষ্ট খুব কম হয়।' গ্লাসটা তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে চুমুক দিল রানা। 'কিন্তু মেলানজিক তৎক্ষণাৎ মারা যাবেন না। তাঁর মৃত্যু সহজ হবে না। মারা যাবার আগে এ-কথা জানার প্রচুর সময় পাবেন যে কেন তিনি মারা যাচ্ছেন। নরকে যাবার তাঁর পথ আলোয় আলোময় হয়ে থাকবে। আগুনটা বহু দূর থেকে দেখতে পাবেন তিনি।'

সাত

ব্রাসেলস থেকে ফিরে এসে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখায় একবার ঢুঁ মারলেন জাঁ পেরো, ইচ্ছে কায়েস চৌধুরীকে ধরে মাসুদ রানার একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা। কায়েস চৌধুরী এককালে মার্সেনারি ছিলেন, 'উলভ্স্ অভ ওঅর' লেখার সময় ভদ্রলোকের কাছ থেকে প্রচুর তথ্য পেয়েছিলেন তিনি। পরে শুনেছেন, ভদ্রলোক রানা এজেন্সিতে কাজ নিয়েছেন।

এজেন্সি থেকে বলা হলো, কায়েস চৌধুরী ছুটিতে আছেন, এই মুহূর্তে স্কটল্যান্ডে গলফ খেলছেন তিনি। কোন হোটেলে উঠেছেন জেনে নিয়ে দু'ঘণ্টা পর প্লেনে চড়লেন পেরো, স্কটল্যান্ডে পৌঁছুলেন বিকেল সাড়ে তিনটায়। সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর হোটেলেই কায়েস চৌধুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। পেরোকে তিনি দেখেই চিনতে পারলেন, বাড়ানো হাতটা ধরে সহাস্যে জানতে চাইলেন, 'মার্সেনারিদের সম্পর্কে আরেকটা বই?'

হেসে ফেললেন পেরো, বললেন, 'আপনি কি সবজান্তা, মশিয়ে চৌধুরী?'

হোটেলের রেস্তোরাঁয় বসলেন ওঁরা। পেরো বললেন, 'কোন ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় আসি। আপনাদের বস্ মাসুদ রানার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই আমি...'

একটা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন কায়েস তাঁকে, বললেন, 'ইমপসিবল। যার অস্তিত্ব সম্পর্কেই সংশয় আছে, পরিচিতি সম্পর্কে আছে দুর্ভেদ্য রহস্য, কেউ তার সাক্ষাৎকার নেয় কিভাবে?'

'আমার প্রস্তাবটা ব্যাখ্যা করতে দিন, প্লীজ,' অনুরোধ করলেন পেরো। 'আমি ওঁনার এসপিওনাজ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করব না, এমনকি উনি যে

বাংলাদেশের একজন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট এ-কথাও আমার বইতে উল্লেখ করব না। আমি শুধু রানা এজেন্সি এবং ব্যক্তিগতভাবে মার্সেনারিদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাইব।'

কায়েস চৌধুরী রহস্যময় হাসি হাসলেন। একটা চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'মশিয়ে পেরো, আপনি আমার কথা বুঝতে পারেননি। আমি বলতে চাইছি, মাসুদ রানা নামে নির্দিষ্ট কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। আসলে তিনি বহুরূপী। আমরা যারা তাঁকে চিনি, তাঁর শুধু একটা রূপ দেখার সুযোগ পাই। তিনি যখন তাঁর অন্য রূপ নিয়ে আমাদের সামনে আসেন, আমরা তাঁকে চিনতে পারি না। এই যেমন ধরুন, জাঁ পেরোর রূপ ধরে এই মুহূর্তে মাসুদ রানা স্বয়ং আমার সামনে বসে নেই, এ-কথা আমি হলফ করে বলতে পারি না।'

কয়েক সেকেন্ড পেরোর মুখে কথা সরল না। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকলেন তিনি। তারপর মুখ কালো করে বললেন, 'আপনি কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন, মশিয়ে চৌধুরী। অথচ আমি খুব আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছি।'

'আর আপনি আমাকে অপমান করছেন, ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন আমি মিথ্যে কথা বলছি!' কায়েস চৌধুরীকে অসন্তুষ্ট দেখাল। 'মি. পেরো, মাসুদ রানাকে সনাক্ত করা সত্যি সম্ভব নয়। কেন শুধু শুধু মরীচিকার পিছনে ঘুরে সময় নষ্ট করবেন, তারচেয়ে আপনি আমার সাক্ষাৎকার নিন।'

একটু চিন্তা করে রাজি হয়ে গেলেন পেরো। কাগজ-কলম বের করে বললেন, 'আপনার পরিচয়, নাগরিকত্ব, অতীত ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে আমি কোন প্রশ্ন করব না, কারণ এ-সবই আমি জানি। গতকাল ব্রাসেলস ছিলাম আমি, ওখানে একটা গুজব কানে এল। এই গুজবের সূত্র ধরেই প্রশ্ন শুরু করি, কেমন?'

হাত বাড়িয়েও কফির কাপটা ধরলেন না কায়েস চৌধুরী, তারপর ধরলেন। 'কি গুজব?'

'রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার অন্তত দু'জন লোক দিন কয়েক আগে আমেরিকায় একটা অপারেশন চালিয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, সেই অপারেশনে আপনি ছিলেন কি না। কিংবা আপনার বস্ ছিলেন কিনা।'

'ছিলাম আমরা, আবার ছিলামও না,' জবাব দিলেন কায়েস চৌধুরী।

'মানে? এ কি রকম উত্তর!'

'যেমন প্রশ্ন তেমনি উত্তর। আপনি প্রশ্ন করবেন আর আমি আমাদের বিজনেস সিক্রেট ফাঁস করে দেব? ছিলাম আবার ছিলাম না বলার কারণ, রানা এজেন্সির সবাই আমরা বহুরূপী, মশিয়ে পেরো। হয়তো আমার বদলে রানা এজেন্সির অন্য কোন লোক আমেরিকায় গিয়েছিল, আমার চেহারা নিয়ে। কাজেই যদি বলি আমি ওখানে যাইনি, তাহলে মিথ্যে কথা বলা হবে। আবার যদি বলি, আমি ওখানে ছিলাম, তাহলেও মিথ্যে কথা বলা হবে। আমি ওখানে যাইনি এ-কথা সত্যি, কিন্তু আমার চেহারার কোন লোককে ওখানে দেখা যায়নি এ-কথা সত্যি না-ও হতে পারে।'

বিদায় নিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এলেন পেরো, মাথা নিচু করে হাঁটছেন, খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। তিনি লক্ষ করেছেন গুজব শব্দটা শোনামাত্র স্থির হয়ে

গিয়েছিল কায়েস চৌধুরীর হাত। ব্রাসেলসে দুই রাত তিন-চারটে বারে কাটিয়েছেন তিনি, ও-সব বারে মার্সেনারি ও সাবেক মার্সেনারিদের আসা-যাওয়া আছে। তাদের একজনের মুখ থেকেই গুজবটা তাঁর কানে আসে।

গুজবটা শোনার পর বারগুলোয় আসা-যাওয়া আছে এমন কয়েকজন লোককে মোটা টাকা পুরস্কারের লোভ দেখিয়েছেন তিনি। এই পুরস্কার সে-ই পাবে, গুজবটার উৎপত্তি ও সত্যতা যে প্রমাণ করতে পারবে। তাদের মধ্যে একজন ইটালিয়ান, অপরজন দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গ। এই দু'জনের সঙ্গে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেছে তাঁর। দু'জনেই যে মাসুদ রানার চরম শত্রু, এটাকে একটা কাকতালীয় ব্যাপারই বলতে হবে।

হোটেলে নিজের কামরায় ঢুকে কায়েস চৌধুরী দেরি করলেন না, সরাসরি ব্রাসেলসে ফোন করে কথা বললেন ন্যানির সঙ্গে। ন্যানির উত্তর শোনার পর তিনি বললেন, 'না, উনি এলেই জানাবেন। এর মধ্যে তেমন কিছু আছে বলে মনে হয় না, তবে জাঁ পেরো সম্ভবত অন্য কারও নির্দেশে কাজ করছেন।'

দশ দিনের মধ্যে বটলনেক টু-কে নিয়ে দু'বার বেলগ্রেড থেকে ঘুরে এল রানা। বেলগ্রেড ও সুপ্লিটের দুটো গর্ত ও মেশিনারি চেক করল ওরা। সব দেখেশুনে পুরোপুরি সন্তুষ্ট বোধ করল রানা। কয়েকজন খুদে সার্বিয়ান এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে দু'তিনবার করে মীটিং হলো, অল্প-বিস্তর ব্যবসাও হলো। নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়ে মেলানজিকের হেডকোয়ার্টার সহ শহরের আরও কয়েকটা বিল্ডিং রেকি করে এল রানা।

এই সময়টা ন্যানির ব্রথেলটাকে রানা ইউরোপিয়ান বেস হিসেবে ব্যবহার করল, তবে দ্বিতীয়বার সার্বিয়া ত্যাগ করার পর ব্রাসেলস থেকে ম্যাক ও স্কটল্যান্ড থেকে কায়েস চৌধুরীর মেসেজ পেয়ে সিদ্ধান্ত নিল নতুন বেস হিসেবে লন্ডনই ভাল। অবশ্য রানা এজেন্সির লন্ডন শাখাকে এড়িয়ে চলতে হবে। পাখিদের ফ্ল্যাটটা এই কাজের জন্যে আদর্শ বলে মনে হলো ওর। ও যে ধরনের মানুষ, গোজোয় ফোন করে প্রথমে পাখির অনুমতি চাইল। হাসতে হাসতে সম্মতি জানাল পাখি, সেই সঙ্গে পরামর্শ দিল ওদের পুরানো ফোর্ড গাড়িটাও ব্যবহার করতে পারে রানা, ট্যাক্সি খরচ বাঁচবে। মিনিট দশেক এটা-সেটা নিয়ে গল্প করল ওরা, তারপর রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল ও, ফিরে গেছে গোজোর পাহাড়ের ওপর বাড়িটায়। এক মিনিটও পেরোয়নি, বেজে উঠল ফোন। রিসিভার কানে তুলতেই আবার পাখির গলা পেল রানা।

'আমিও লন্ডনে চলে আসি না কেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'একা থাকবে, কে তোমাকে রান্না করে খাওয়াবে? ঘটনাটা ঘটার আগে কিছুটা সময় তোমার রিল্যাক্স করা উচিত, মাসুদ ভাই। আমি তোমাকে আমার বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, সবাই তারা শিল্প-সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িত...'

ইতস্তত করছে রানা। 'ওখানে পবনকে কে দেখবে?'

'সে তো এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ একজন পুরুষে পরিণত হয়েছে,' জবাব দিল পাখি।

'আমার কোন সাহায্য ছাড়াও তার চলে। কৃতিত্বটা আপনার, স্বীকার করতেই হয়। কি, আসব?'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'সত্যি আসতে চাও? ফ্ল্যাটে একা আমার সঙ্গে থাকতে তোমার ভয় করবে না?'

'আমার কোন ভয় নেই। তবে জানি তুমি খুব ভয় পাও। সেই ভয়টা দূর করার জন্যেই তো আসতে চাইছি।'

তবু ইতস্তত করছে রানা। 'সেটা কি উচিত হবে?' আবার লোভও হচ্ছে।

'কালই আমি আসছি...'

'না! এদিকের ঝামেলা সারতে দু'তিন দিন সময় দাও আমাকে। আসতেই যদি চাও, শনিবারের টিকেট বুক করো। কাল আমি লন্ডনে থাকব, দুপুরে একবার ফোন কোরো, ফ্ল্যাটের নম্বরে। কখন আসছ তখন জানিয়ো।'

তিন মিনিট পর নিজের ফ্লাইট বুক করার জন্যে এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করল রানা।

শিক্ষক করিম শ্লোভাকের পিছু পিছু একটা চার্চে ঢুকল পবন। ভেতরে প্রচুর মৌন মানুষ, প্রার্থনা করছে। লম্বা একটা বেঞ্চে পাশাপাশি বসল ওরা। বিড় বিড় করে প্রার্থনা উচ্চারণ করছে পবন, কান খাড়া করে শুনছেন করিম শ্লোভাক।

এক ঘণ্টা পর, একটা রেস্তোরাঁয় বসে আছে ওরা। পবনের সামনে বারো পদের খাবার, আস্তে-ধীরে খাচ্ছে সে।

করিম শ্লোভাক মনে মনে সন্তুষ্ট। আর দিন কয়েকের মধ্যেই খ্রিস্টানদের যে-কোন চার্চে একা প্রার্থনায় যোগ দিতে পারবে পবন, তাকে দেখে পুরোদস্তুর একজন সার্ব খ্রিস্টান যুবক ছাড়া আর কিছু মনে হবে না। শুধু তাই নয়, সার্বদের খাবার, তাদের সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সবই নিখুঁতভাবে রপ্ত করেছে সে। পবনের বয়েস সম্পর্কে জানেন তিনি, সেজন্যেই তার আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তার হাব-ভাব দেখে মনে হবে দুনিয়া চরে বেড়ানো অভিজ্ঞ লোক সে, বয়েস ত্রিশের কম নয়।

সারায়েভো ত্যাগ করার পর ছাত্রের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হবে না। ছাত্রের অভিভাবক মাসুদ রানার সঙ্গে সেই চুক্তিই হয়েছে। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের স্নেহ জন্মেছে, তা বলা যাবে না; তবে কোন সন্দেহ নেই যে শ্রদ্ধা জন্মেছে। তিনি জানেন, ফলাফল দেখে ভারি খুশি হবেন মাসুদ রানা।

আশির দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার কুখ্যাত সিকিউরিটি সার্ভিস বস্-এর এজেন্ট ছিল পিট দ্য বেনেট। অ্যাঙ্গোলা ও মোজাম্বিকে ফিল্ড এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করত সে, তবে মাঝে মধ্যে তাকে মধ্যপ্রাচ্যেও পাঠানো হত। চাকরির প্রথম দিকে শ্বেতাঙ্গ মনিবদের নির্দেশে দক্ষিণ আফ্রিকার ভেতরে কালো রাজনৈতিক নেতাদের খুন করাই ছিল তার প্রধান কাজ। বিদেশে পাঠাবার পর ড্রাগ ব্যবসা ধরে সে, ব্যক্তিগত আয় বাড়াবার জন্যে। ধরা পড়ার পর চাকরি হারায়, বেছে নেয় ভাড়াটে সৈনিকের জীবিকা। মার্সেনারি হিসেবে পশ্চিম আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পুব আফ্রিকায়

কাজ করেছে সে।

লোকটা নিষ্ঠুর, দয়ামায়াহীন, মানুষকে শারীরিক নির্যাতন করে আনন্দ পায়। টাকার প্রতিও তার খুব লোভ। কিন্তু চাকরি যাবার পর ড্রাগ ব্যবসা তাকে ছাড়তে হয়েছে, কারণ শুধু বস্ নয়, অন্যান্য অ্যান্টি-ড্রাগ স্কোয়াডও কড়া নজর রাখছে তার ওপর। হাতে কোন কাজ নেই, কাজেই টাকাও নেই। গত তিন মাসে একটা মাত্র কাজের প্রস্তাব পেয়েছে সে। রহস্যময় একদল লোক লুক্সেমবার্গের ছোট একটা ব্যাংক লুঠ করার জন্যে তাকে দলে রাখতে চেয়েছিল। প্ল্যানটা তার পছন্দ হয়নি বলে প্রস্তাবটা ফিরিয়ে দিয়েছে সে।

এরকম দুঃসময়ে সে খবর পেল তার পরিচিত এক লোক, মাইক কেনার্ড, খুব বড় ধরনের একটা কাজ পেয়েছে। ভারত মহাসাগরের একটা দ্বীপ দখল করতে হবে। ব্যাপারটা কী চেক করে দেখার জন্যে প্যারিসে যাবার সিদ্ধান্ত নিল পিট দ্য বেনেট।

কিন্তু ব্রাসেলস এয়ারপোর্টে পৌঁছে তার গন্তব্য বদলে গেল। ডিপারচার টার্মিনালের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামতে যাচ্ছে, এই সময় তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেল এক লোক। কাঠামোটা সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল সে। একহারা, দীর্ঘ শরীর। হাঁটার ভঙ্গিটাও চিনতে পারল সে। মাটিতে প্রথমে পায়ের বাইরের দিকটা পড়ে। লোকটার হাতে ক্যানভাসের একটা ব্যাগ, ঢুকে পড়ল টার্মিনাল ভবনের ভেতর। ফরাসী জার্নালিস্টের কথা ভাবল সে। তিন দিন আগে জাঁ পেরো একটা বারে বসে প্রস্তাবটা দেয় তাকে।

টার্মিনাল ভবনের ভেতরে খুব সাবধানে ঢুকল সে, হলের চারদিকে দ্রুত দৃষ্টি বুলাল। সাবেনা-র টিকেট কাউন্টারে রয়েছে লোকটা, হাতের ব্যাগটা পায়ের কাছে ফেলা।

লোকটার ওপর নজর রাখছে বেনেট, চিন্তার ঝড় বয়ে যাচ্ছে মাথার ভেতর। তীব্র ঘৃণা ও আক্রোশ অনুভব করছে সে। আবার প্রচণ্ড কৌতূহলও হচ্ছে। এ-সবের সঙ্গে মিশে আছে বুক কাঁপানো ভয়। ঘৃণা ও আক্রোশের কারণ টিকেট কাউন্টারে দাঁড়ানো এই লোক তাকে একবার তাঞ্জানিয়ায় চরম অপদস্থ করেছিল, শারীরিক ভাবে। ভয়ও পাচ্ছে সেই বেদম মারের কথা মনে করে। হাড়গোড় ভেঙে গিয়েছিল তার, হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল কয়েক হপ্তা। কৌতূহল বোধ করার কারণ, ইমরুল হাসান শুধু যে বেঁচে আছে তাই নয়, একটা প্রভাবশালী মহল তার সম্পর্কে তথ্য জানতে চাইছে।

কোথায় যাচ্ছে সে? কি করছে সে?

এ-সবের উত্তরে টাকা আছে।

রানা কাউন্টার থেকে ইমিগ্রেশনের দিকে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বেনেট। তারপর এগোল সে, একই টিকেট কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল। ক্লার্ক একজন মধ্য-বয়স্কা মহিলা। চোখাচোখি হতে মিষ্টি করে হাসল সে। বেনেট দীর্ঘদেহী, মাথায় সোনালি চুল, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তার হাসি খুবই আকর্ষণীয়।

'যেন মনে হলো এইমাত্র আমার এক বন্ধু ইমিগ্রেশনে ঢুকল। বহু বছর তার সঙ্গে আমার দেখা নেই। আপনি হয়তো সাহায্য করতে পারবেন।'

'হ্যাঁ, বলুন।' হাসলেন মহিলা।
'তাকে আমি এদিক থেকে যেতে দেখলাম,' বলল বেনেট। 'সে কি এখান থেকে টিকেট কিনল?' এরপর রানার চেহারার বর্ণনা দিল সে।
মাথা ঝাঁকিয়ে মহিলা বললেন, 'হ্যাঁ, লন্ডনের টিকেট কিনেছেন ভদ্রলোক, পৌনে তিনটেয় ছাড়বে।'
'ইকোনমি, নাকি ক্লাব?'
'ক্লাব।'
বেনেট ডিপারচার স্ক্রীনের দিকে তাকাল। দুটো পঁয়তাল্লিশের পর আরও একটা প্লেন লন্ডনে যাবে, সাড়ে চারটের সময়। মহিলাকে সে বলল, 'আমিও লন্ডনে যাচ্ছি, তবে সাড়ে চারটের ফ্লাইটে। আমাকে পৌনে তিনটের প্লেনে তুলে দেয়ার কোন উপায় করা যায়?'
কনসোল-এর কয়েকটা বোতামে চাপ দিলেন মহিলা, স্ক্রীনের লেখাগুলো পড়লেন, তারপর মাথা ঝাঁকালেন। 'কয়েকটা সীট এখনও খালি আছে, তবে সবই ইকোনমি ক্লাসে।'
'অসংখ্য ধন্যবাদ, চলবে,' বলে পকেটে হাত ভরল বেনেট।

ডকের পাশে ভিড়ল ফেরি, ধাতব শব্দ তুলে নিচে নামল র‍্যাম্প, ছুটে এসে পাখির দু'বাহুর মাঝখানে ঢুকে পড়ল পবন। গাড়ি চড়ে বাড়ি ফিরছে ওরা, পবন হাসতে হাসতে বলল, 'কি রান্না করেছ তাই বলো। সার্বদের খাবার খেয়ে আমার অরুচি ধরে গেছে।'
হেসে উঠল পাখি। 'তোকে আমি ডিনারে নিয়ে যাচ্ছি। মিশরীয় বুড়োর রেস্তোরাঁ আলিমুজ্জামান'স-এ। আগেই বলে রেখেছি, আমাদের জন্যে ফ্রেশ লবস্টার রেখে দিয়েছে।'
'হঠাৎ এত খাতির কেন আমাকে?'
আড়চোখে পবনের দিকে তাকাল পাখি, ভাবল কত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেছে ও। 'কারণ কাল আমি লন্ডনে যাচ্ছি,' বলল সে। 'মাসুদ ভাই ফোন করে ডেকে পাঠিয়েছেন আমাকে।' ও নিজেই যেতে চেয়েছে, এ-কথা আর বলল না।
কৃত্রিম হতাশা দেখিয়ে পবন বলল, 'অথচ আমাকে নিয়ে যাচ্ছ না!'
রাস্তার সামনে এক পাল ভেড়া দেখে জীপের গতি কমাল পাখি। 'দূর বোকা, আমি কি বেড়াতে যাচ্ছি ভেবেছিস! ওখানে আমাকে অনেক কাজ করতে হবে। মাসুদ ভাই একা থাকবেন, তাঁর রান্নাবান্না আছে···আর যাচ্ছি তো মাত্র তিন দিনের জন্যে।'
'আর সব খবর বলো।'
'নতুন আর কি। মাসুদ ভাই লন্ডনে আমাকে পরিস্থিতি সম্পর্কে বলবেন, ফিরে এসে তোকে আমি জানাব। উনি বললেন, রওনা হবার জন্যে এক হপ্তার মধ্যে তৈরি হতে হবে তোকে। উনি চাইছেন দু'দিনের জন্যে মাল্টায় যাবি তুই, হেকলার অ্যান্ড কোচ নিয়ে প্র্যাকটিস করবি রেঞ্জে। পিওতর মেনিনোর সঙ্গে আগেই উনি কথা বলে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

*

সেদিন রাতে, সাগরতীরের রেস্তোরাঁয় বসে আছে ওরা, লবস্টারের স্বাদ নেয়ার সময় প্রায় কোন কথাই বলছে না। কফির কাপে চুমুক দেয়ার সময় হাতঘড়ি দেখল পবন। লক্ষ করে পাখি বলল, 'হ্যাঁ, জানি,' পবন। আজ শুক্রবার, ডিসকোয় ওরা সবাই ধেই ধেই করছে। কিন্তু আজ রাতে তুই আরও আধ ঘণ্টা তোর বোনের সঙ্গে কাটাবি।'

আদুরে হেসে হাত বাড়াল পবন, পাখির হাতটা নিজের হাত দিয়ে ঢেকে বলল, 'তুমি না চাইলে তোমাকে একা রেখে কোথাও আমি যাব না আজ।' ইঙ্গিতে রেস্তোরাঁর ভিড়টা দেখাল সে। 'এখানে আমাদেরকে যারা চেনে না তারা কি ভাবছে বলো তো?' ওর ঠোঁটে দুষ্টামি মাখা হাসি। 'মানে পুরুষগুলো?'

পাখির চোখে কৃত্রিম শাসন, পবন কি বলতে চাইছে তা যেন সে বুঝে ফেলেছে। 'কি ভাবছে?' কৌতুক ঝিক করে উঠল তার চোখের তারায়।

'ওরা ভাবছে তুমি আমার গার্লফ্রেন্ড...'

'খুব পাজি হয়েছিস, না?'

'আমার কথা এখনও শেষ হয়নি। এত সুন্দর গার্লফ্রেন্ড দেখে ঈর্ষা বোধ করছে ওরা।'

খিলখিল করে হেসে উঠল পাখি। 'তাহলে শোন, মেয়েগুলো কি ভাবছে বলি। মেয়েগুলো ঈর্ষা করছে আমাকে, কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে কি সুন্দর একটা খেলনা বালক নিয়ে বসে আছি আমি।' হঠাৎ সিরিয়াস দেখাল তাকে, তরুণ ভাইটির মুখের দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকার পর আপনমনে মাথা নাড়ল। 'নারে, পবন, তুই এখন আর খেলনা বালক না। তুই এখন একটা বিশাল পুরুষ মানুষ হয়ে উঠেছিস। তোকে নিয়ে আমি গর্বিত...তোকে নিয়ে আমার ভয় হয়।'

'ভয় পেয়ো না, আপা,' নরম সুরে বলল পবন।

'সত্যি ভয় পাই রে। আজ যখন আমি তোর ফেরির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম, জীবনে এই প্রথম উপলব্ধি করলাম, সত্যি আমি খুব ভাগ্যবতী আর সুখী মেয়ে। আমার এক ভাই আছে, জীবনের সমস্ত দাবিকে অগ্রাহ্য করে মহৎ একটা কাজে উৎসর্গ করেছে নিজেকে। মানুষের জীবনে মা-বাবার চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই, ওরা খুন হবার পর ভাইটি আমার ভয় পেয়ে কোন গর্তে লুকায়নি। খুনের বদলা নেয়ার জন্যে অচেনা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কোত্থেকে কোথায় চলে এসেছে। তাঁর প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ...'

বাধা দিল পবন। বলল, 'আজ এ-সব কথা থাক, আপা। আমরা জানি, এটা আমাদের কর্তব্য। কাজটা আগে শেষ করি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

পাখি বলল, 'আমি চাই কাজটা ভালয় ভালয় শেষ করে তুই আমার কাছে ফিরে আসবি...'

পাখির হাতটায় চাপ দিল পবন। 'তোমার কাছে ফিরব না তো কার কাছে ফিরব, আপা। তুমিই তো আমার সব।'

*

হিথরো থেকে তোবড়ানো ফোর্ডে পাখিকে তুলে নিল রানা। জানতে চাইল, 'আসতে কোন অসুবিধে হয়নি তো?'

'হয়েছে,' মুখ ভার করে বলল পাখি। 'আমার ওপর নজর রাখা হয়, এ-কথা জানি বলেই এদিক-ওদিক তাকাই, আর তোমার লোকজনকে চিনে ফেলি। সেই মাল্টা থেকে আমার পিছু নিয়েছে ওরা। ভারি অস্বস্তিকর।'

'ঠিক আছে, ওদেরকে আমি বকে দেব।' রানা হাসছে।

সন্ধের সময় লন্ডনের রাস্তায় ট্রাফিক খুব বেশি, সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছে ও। মাঝে মধ্যে ভিউ মিররে তাকাচ্ছে।

'বকে দেবে? কেন?' বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকাল পাখি।

'তোমার চোখে ধরা পড়ে যাওয়াটা ওদের ব্যর্থতা,' বলল রানা। 'তুমি এই লাইনের মেয়ে নও, তোমার চোখে যদি ধরা পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে প্রতিপক্ষের লোকেরাও ওদেরকে চিনে ফেলেছে।'

'তারাও ছিল নাকি এয়ারপোর্টে? বা প্লেনে?'

'থাকতেও পারে।' পাখি লন্ডনে আসছে, কাজেই সম্ভাব্য সব রকম সতর্কতা আগেই নিয়ে রেখেছে রানা।

ভয়ে ভয়ে পিছন দিকে তাকাল পাখি। 'তারা কি কেউ আমাদের পিছু নিয়েছে?'

হেসে ফেলল রানা। 'বোধহয় না। নিলে আমি টের পেতাম। তবে চিন্তার কিছু নেই, পিছনে কেউ থাকলে তার ব্যবস্থা করার জন্যে লোক আছে।'

'সত্যি তুমি খুব সাবধানী মানুষ,' নরম সুরে বলল পাখি।

'লো পেসকাডু-তে একটা টেবিল রিজার্ভ করেছি,' বলল রানা। 'ওখানে চমৎকার সীফুড পাওয়া যায়। বিশেষ করে শেলফিশ।'

হেসে উঠে পাখি বলল, 'কাল রাতে পবনের সঙ্গে আমি লবস্টার খেয়েছি। আলিমুজ্জামান'স-এ।'

'ওকে তুমি নষ্ট করছ,' মিছামিছি অভিযোগ করল রানা। 'তাহলে কোথায় যেতে চাও বলো।'

'লন্ডনে বাংলাদেশী হোটেলের কোন অভাব নেই। গ্লস্টার রোড ছাড়িয়ে একটু সামনে বাড়লেই সারি সারি দেখা যাবে। আমি একটা রেস্তোরাঁ চিনি, কড়া ঝাল দেয়া ভুনা খিচুড়ি আর ভাজা ইলিশ পাওয়া যায়।'

'বেশ, চলো ওখানেই যাই।' হাতঘড়ি দেখল রানা। 'আগে খেয়ে নিই, তারপর ফ্ল্যাটে ফেরা যাবে, কি বলো?'

পাখি কথা বলছে না, তার চোখ স্টিয়ারিং হুইল ধরা রানার হাতের ওপর আটকে গেছে। শুকনো কাটা একটা দাগ, তাকে যেন জাদু করে ফেলল। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দাগটা ছুঁলো সে। 'কি করে হলো এটা?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া হলো রানার। এক ঝটকায় সরিয়ে নিল হাতটা। গাড়ির নাক বেঁকে গিয়ে একটা ট্রাকের গায়ে বাড়ি মারতে যাচ্ছিল, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে হুইল ঘুরিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল ও।

ঘাবড়ে গিয়ে একটু সরে বসল পাখি, তাকিয়ে আছে রানার মুখের দিকে। দেখে মনে হলো, ওর যেন কষ্ট হচ্ছে। 'কি বললাম আমি? তুমি অমন করলে কেন?'

'কিছু না,' বিড়বিড় করল রানা। 'মানে...'

পাখি এখনও রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। লক্ষ করল, কি যেন বলতে গিয়েও সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না। খুব নরম সুরে সে বলল, 'কি যেন মনে পড়ে গেছে তোমার। অতীতের কোন ঘটনা। ঠিক আছে, তুমি বলতে না চাইলে আমি শুনব না।'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, সেরকম কিছু নয়। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ তুমি। অতীতের একটা ঘটনা মনে পড়ে গেছে আমার। কয়েক বছর আগে, কেউ একজন গাড়িতে আমার পাশে বসে ঠিক এই কাণ্ড করেছিল—হাতের কাটা দাগটা ছুঁয়ে ঠিক ওই শব্দগুলো উচ্চারণ করেছিল, কি করে হলো এটা?'

'কোনও মেয়ে?'

'ছোট্ট এক কিশোরী।'

'ইটালির সেই মেয়েটা, যার গল্প অনোরিয়া শুনিয়েছেন আমাকে?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল পাখি। 'খুন হয়ে যায়?'

'হ্যাঁ।'

হাতটা আবার স্পর্শ করল পাখি। 'আমি দুঃখিত, মাসুদ ভাই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালাল রানা। তারপর ধীরে ধীরে শুরু করল ও। লুবনার গল্প, তাকে গান শোনাবার মধুর স্মৃতি, তাকে বাঁচাতে না পারার ব্যর্থতা, তারপর একের পর এক আর সবার কাহিনী—সংক্ষেপে সবই ছুঁয়ে গেল ও।

গাড়ির ভেতর আবার নিস্তব্ধতা নেমে এল। এক সময় ঘাড় ফিরিয়ে পাখির দিকে তাকাল রানা। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো ওর, মনে হলো ঠিক এই ঘটনা অতীতেও যেন একবার ঘটেছে। ও জানে, এটাকে দেজা ভু বলে। 'তুমি তো তোমার বাবা-মাকে হারিয়েছ, জানোই তো যে দুনিয়ায় মাঝে-মধ্যে খারাপ কিছু ঘটতে পারে।'

হাসল পাখি, আবার ছুঁলো হাতটা, বলল, 'মাসুদ ভাই, জীবনে ভাল কিছুও ঘটে। সেজন্যেই মানুষ সব ভুলে আবার সুখী হয়ে উঠতে পারে।'

'তোমার জীবনে সেরকম কিছু ঘটেছে নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিরস্কার করল রানা, এ-ধরনের প্রশ্ন আসলে প্ররোচিত করে মানুষকে, মনের গোপন দরজা খুলে ফেলতে উৎসাহী করে তোলে। অথচ রানা চায় না পাখির সঙ্গে হৃদয়ঘটিত কোনরকম জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে ও।

'হ্যাঁ, ঘটেছে,' বলল পাখি, রানার ভাবান্তর গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ করছে সে। 'তবে তোমার আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। কথাটা এজন্য বলছি যে সাধারণত যাকে ভাল লাগে, তার ঘাড়ের ওপর চেপে বসার একটা প্রবণতা থাকে মেয়েদের মধ্যে। তোমাকে আমি এটুকু নিশ্চয়তা দিতে পারি—তোমার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, তোমার জীবন ধারা পাল্টে দেয়া বা তোমাকে দখল করার কোন ইচ্ছে আমার নেই। শুনে খুশি হয়েছ তো?'

'খুশি হয়েছি কিনা বলতে পারব না,' বলল রানা, হাসছে না। 'তবে স্বস্তিবোধ

করছি।'

'জিজ্ঞেস করবে না, তাহলে আমার ভূমিকাটা কি? কোন্ চরিত্রে অভিনয় করছি?'

'হ্যাঁ, কৌতূহল হচ্ছে বৈকি।'

'ফুল, মনে কর একটা গোলাপই, গন্ধ বিলিয়ে ঝরে পড়াতেই যার সার্থকতা। নিশ্চয়ই অনেক পুণ্য করেছি, তাই দু'দিনের জন্যে কাছাকাছি পেয়েছি তোমাকে—আমার ভাল যা কিছু আছে, সবটুকু দিয়ে ধন্য হতে চাই...'

'না, পাখি,' রানার গলায় কঠিন সুর।

নির্দিষ্ট রেস্তোরাঁর সামনে চলে এসেছে ওরা, তাই পাখির আর কিছু বলা হলো না। গাড়িটা ফাঁকা চত্বরে পার্ক করল রানা, নিচে নেমে ফেলে আসা পথটার দিকে একবার তাকাল, তারপর উল্টোদিকের দরজা খুলে নিচে নামতে সাহায্য করল পাখিকে।

রেস্তোরাঁর ভেতর ঢোকার পর ওদের মুড হালকা হয়ে গেল। জায়গাটা ছোটই বলতে হবে, প্রায় অন্ধকার, লোকজনও খুব কম। ওরা ছাড়া আর মাত্র দু'জোড়া তরুণ দম্পতিকে দেখা গেল, কারও দিকে না তাকিয়ে নিজেদেরকে নিয়ে মগ্ন হয়ে আছে।

ওরা বসল জানালার ধারে, কোণার এক টেবিলে। অর্ডার দেয়ার পর বেশি কথা বলছে না কেউ। তরুণ দম্পতিদের দিকে মাঝে মধ্যে তাকাচ্ছে পাখি, তাকালেই তার চোখে দুষ্টামির ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। সেদিকে তেমন খেয়াল নেই রানার। জানালা দিয়ে বার বার বাইরে তাকাচ্ছে ও। পার্কিং লটে ওদের ফোর্ড ছাড়া আরও দুটো গাড়ি রয়েছে, তবে নতুন কোন গাড়ি আসেনি।

মিনিট দশেক পর চেয়ার ছাড়ল রানা। 'আসছি,' বলে এগিয়ে গেল পে-বুদের দিকে। ফিরে এল প্রায় পাঁচ মিনিট পর। ওর চেহারা দেখে কিছু বুঝতে পারল না পাখি, জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, মাসুদ ভাই? কাকে ফোন করলে? কিছু ঘটেছে নাকি?'

হাসল রানা। 'না, কি ঘটবে। একজনের সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল, বললাম আজ যেতে পারছি না।'

স্বস্তির ছাপ পড়ল পাখির চেহারায়। রানা আবার ওর চেয়ারে বসতেই সে জিজ্ঞেস করল, 'লন্ডন বা প্যারিসে এমন অনেক আর্টিস্ট আছে, যারা নিজের কল্পনা থেকে কিছু আঁকলে সেটা তেমন ভাল হয় না; কিন্তু যদি পৃথিবী বিখ্যাত কোন ছবির সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া যায়, ওই ছবি হুবহু এঁকে দেবে। তুমি জান?'

'জানি।'

নিজের চেয়ার ছেড়ে রানার পাশের খালি চেয়ারটায় বসল সে, ওর হাত দুটো নিজের মুঠোর ভেতর ভরল। 'তুমি তো এ-ও জানো যে আমি অভিনেত্রী, তাই না?'

'হ্যাঁ, জানি,' বলল রানা, বিব্রত দেখাচ্ছে ওকে, তাকিয়ে আছে হাতগুলোর দিকে। 'কিন্তু এ-সব কি করছ তুমি?'

'মাসুদ ভাই, আমিও ওই আর্টিস্টদের মত,' নিঃশব্দে হেসে বলল পাখি। 'কিভাবে প্রেম করতে হয় জানি না, তবে কেউ প্রেমের অভিনয় করছে দেখলে হুবহু

নকল করতে পারি। ওদিকে তাকাও,' বলে শ্বেতাঙ্গ একটা দম্পতির দিকে ইঙ্গিত করল সে।

সেদিকে তাকাতে রানা দেখল এক যুবকের কাঁধে মাথা রেখে কানে কানে কি যেন বলছে তার বান্ধবী, পরস্পরের হাত ধরে আছে। হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেল ও, পাখিও ওর কাঁধে মাথা ঠেকিয়ে কানের কাছে ঠোঁট সরিয়ে এনেছে।

'তখন "না" বললে কেন?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

'প্লীজ, পাখি।' চট করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। 'ওরা শ্বেতাঙ্গ, এ-দেশী, ওদের এ-সব মানায়। তাছাড়া, এটা বাংলাদেশী রেস্তোরাঁ,আমরাও বাঙালী...'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো!' বলেই সিধে হয়ে বসল পাখি। 'ঠিক আছে, এখানে নয়। ফ্ল্যাটে ফিরে টিভি খুললে এরকম দৃশ্য ভূরি ভূরি দেখতে পাওয়া যাবে।'

খেতে বসে পাখি লক্ষ করল, খাওয়ার দিকে তেমন মন নেই রানার। কি ব্যাপার জানতে চাওয়ায় হাসল, জবাব দিল, 'খাচ্ছি তো!'

পাশাপাশি চেয়ারে বসেই খেলো ওরা। খাওয়া শেষ হতে পাখি জিজ্ঞেস করল, 'পাশে বসায় তুমি অস্বস্তি বোধ করছ, মাসুদ ভাই?' উঠে যাচ্ছে সে।

তার হাত ধরে বাধা দিল রানা। 'শোনো, কথা আছে। তখন যে অভিনয়টা করতে চাইছিলে, আবার সেটা শুরু করো।'

'মানে?'

'উত্তেজিত হয়ো না,' হাসতে হাসতে বলল রানা। 'আমার কাঁধে মাথা রাখো, হাত ধরো, কানে কানে কথা বলো। তারপর আমিও তাই করব। শুরু করো, সব ব্যাখ্যা করছি।'

রানার নির্দেশ পালন করল পাখি।

খানিক পর পাখির আরও কাছে সরে এল রানা, কানে কানে বলল, 'এয়ারপোর্ট থেকে একটা গাড়ি আমাদের পিছু নিয়েছিল। আমার দু'জন লোক ছিল ওটায়। কথা ছিল সারাক্ষণ আমার দৃষ্টিসীমার ভেতর থাকবে ওরা। এখানে আসার পথে এক সময় ওরা আমাদেরকে হারিয়ে ফেলেছে।'

রানার কানে ফিস ফিস করল পাখি, 'হয়তো ট্রাফিক জামে আটকা পড়েছে...'

'না,' বলল রানা। 'আমি কোন ট্রাফিক জাম দেখিনি। আমাদের ঠিক পিছনেই থাকার কথা ছিল ওদের। কিছু একটা ঘটেছে, তাই ওদেরকে আমি দেখতে পাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি, ওদের যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে, এই মুহূর্তে আমরাও নিরাপদ নই। আমার সন্দেহ, কাছাকাছি কোথাও থেকে এই রেস্তোরাঁর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। আমরা বেরুলে আমাদের ওপর হামলা হতে পারে।'

'অ্যাঁ!'

'ভয় পেয়ো না,' অভয় দিল রানা। 'হাসছ না কেন? এক-আধটু আদরও করো আমাকে। শোনো, হামলা যদি হয়, আমার ওপর হবে। কাজেই দু'জন আমরা একসঙ্গে এখান থেকে বেরুব না। প্রথমে আমি একা বেরিয়ে যাব...'

'না!' রানাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল পাখি, একটু একটু কাঁপছে তার শরীর।

'আমি তোমাকে একা ছাড়ব না...'

'বোকামি কোরো না!' ফিসফিস করল রানা। 'ফোন করে আমি আমার আরও চারজন লোককে আনিয়েছি। দুটো গাড়ি নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে ওরা। ওদের দু'জন আমাকে কাভার দেবে। আমি বেরিয়ে যাবার পর যাই ঘটুক না কেন, তুমি এই জায়গা ছেড়ে নড়বে না। তার আগেই কালো সুট পরা এক লোক ঢুকবে এখানে, অমল বসু...ওই দেখো, ঢুকছে।' চেহারা দেখেই বোঝা যায় বাঙালী তরুণ, পরনে কালো সুট,কারও দিকে না তাকিয়ে ওদের কাছাকাছি একটা টেবিলে বসল। 'আমি বেরিয়ে যাবার পনেরো মিনিট পর তোমার টেবিলে আসবে ও, তোমাকে নিয়ে নিজেদের গাড়িতে উঠবে, পৌঁছে দেবে ফ্ল্যাটে। পথে যদি কিছু ঘটে, ওরা যা করতে বলবে তাই করবে তুমি।' টেবিলের ওপর ফোর্ডের চাবিটা রাখল। 'এটা তুমি অমলকে দেবে। আজ রাতেই কোন একসময় ফোর্ডটা ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবে সে।'

'আর তুমি? এখান থেকে বেরিয়ে কি করবে তুমি?'

'আমি একটা ট্যাক্সি নেব,' বলল রানা। 'তোমার ফ্ল্যাটের ঠিকানা দেব ড্রাইভারকে। পথে যদি দেখি কেউ আমার পিছু নিয়েছে, তার ব্যবস্থা করা হবে। নিজের লোকেরা কাভার দেবে আমাকে, কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই।'

'ভয় পাবার কিছু নেইই যদি, আমি সঙ্গে থাকলে অসুবিধে কি? আর তা না হলে পুলিসে ফোন করো, যা করার ওরাই করুক।'

'বুঝতে চেষ্টা করো, পাখি,' বলল রানা। এটা পুলিসী ব্যাপার না। তাছাড়া, গোটা ব্যাপারটাই তো স্রেফ আমার ধারণা, সত্যি না-ও হতে পারে। তোমাকে সঙ্গে নেয়া সম্ভব নয়, কারণ সত্যি যদি বিপদ হয়, তুমি একটা বাধা হয়ে দাঁড়াবে।'

'পথে যদি গোলাগুলি হয়? তুমি যদি আহত হও?' জেদ ধরল পাখি, মাথা নেড়ে বলল, 'কোন কথা শুনব না, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।'

হাসল রানা। 'ভয় আসলে ওদের, যারা আমার পিছু নেবে। আমাকে যারা কাভার দেবে বা তোমাকে যারা ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবে তারা আমার এজেন্সির সেরা লোক, নিজেদের কাজ খুব ভাল বোঝে। আধ ঘণ্টার ব্যাপার, ফ্ল্যাটে ফিরে দেখবে আমি বহাল তবিয়তে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। আর কোন কথা নয়, এবার আমি যাই।' পাখির কপালে হালকা চুমো খেয়ে চেয়ার ছাড়ল রানা, জ্যাকেটের বোতাম খুলে ঘুরে দাঁড়াল। কালো সুট পরা তরুণের দিকে একবারও না তাকিয়ে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ও। পার্কিং লটে একটা লাল ডাটসান দেখা গেল, কিছুক্ষণ আগে পৌঁচেছে। নম্বর প্লেটে চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হয়ে নিল,ওর এজেন্সিরই গাড়ি। ফোর্ডটাকে পাশ কাটিয়ে এগোল ও, সামনে রাস্তা। রাস্তার ওপারে সারি সারি অনেকগুলো রেস্তোরাঁ, অনেক গাড়িও পার্ক করা রয়েছে, তার মধ্যে তোবড়ানো একটা নীল মার্সিডিজ—ওটাও রানা এজেন্সির গাড়ি।

রাস্তায় প্রচুর ট্রাফিক, তবে জাম নেই। হাত তুলে একটা ট্যাক্সি থামাল রানা, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে ফ্ল্যাটের ঠিকানা বলল। চলতে শুরু করল ট্যাক্সি, উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে পিছনে লক্ষ রাখল ও, জ্যাকেটের ভেতর থেকে হাতে বেরিয়ে এসেছে একটা লুগার।

নীল মার্সিডিজের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে স্টার্ট নিল বাদামী রঙের একটা টয়োটা, ইউ টার্ন নিয়ে পিছু নিল ট্যাক্সির। ক্ষীণ হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। নীল মার্সিডিজও স্টার্ট নিয়ে বাঁক ঘুরল, যোগ দিল গাড়ির মিছিলে।

রানা সিদ্ধান্ত নিল, নির্জন একটা রাস্তা দরকার। কিভাবে কি করতে হবে মার্সিডিজের ড্রাইভার ও আরোহীকে আগেই বলা আছে।

'হঠাৎ একটা কাজের কথা মনে পড়ে গেছে,' ড্রাইভারকে বলল রানা। 'ফোল্ডার স্ট্রীট আর কুইনস এভিনিউ হয়ে গেলে ভাল হয়।'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। তিন মিনিট পর ট্রাফিক সিগন্যালে থামল ট্যাক্সি। পিছন দিকে তাকিয়ে রানা দেখল ট্যাক্সি আর বাদামী টয়োটার মাঝখানে দুটো গাড়ি রয়েছে। টয়োটা আর মার্সিডিজের মাঝখানেও তাই। আবার চলতে শুরু করল ট্যাক্সি, দু'মিনিট পর বাঁক ঘুরে ফোল্ডার স্ট্রীটে ঢুকল ওরা।

পিছু পিছু আসছে টয়োটা। ট্যাক্সি আর টয়োটার মাঝখানে এখন মাত্র একটা গাড়ি। চোখ নামিয়ে লুগারটা চেক করে নিল রানা। তারপর আরেকবার পিছন দিকে তাকাল। সামনের গাড়িটাকে ওভারটেক করছে টয়োটা। দেখাদেখি মার্সিডিজের ড্রাইভারও তার সামনের গাড়ি দুটোকে পাশ কাটাচ্ছে।

রাস্তার দু'পাশে তাকাল রানা। দোকান-পাট এখনও খোলা, ফুটপাথে প্রচুর মানুষ। রাস্তায় গাড়িও অনেক। না, এখানে গোলাগুলি হলে নিরীহ পথচারী মারা যেতে পারে। কুইন'স এভিনিউ খুব চওড়া রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে দোকান-পাটও কম। কাজেই অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুক্ষণ। আরেকবার পিছন দিকে তাকাতেই ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক। 'সর্বনাশ!' বিড়বিড় করল ও। নীল মার্সিডিজের বেশ খানিকটা পিছনে পাখির ফোর্ডটাকে দেখা যাচ্ছে।

রানা রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে যেতেই টেবিলে বিশ পাউন্ডের একটা নোট রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পাখি। সরাসরি কালো সুট পরা লোকটার সামনে এসে দাঁড়াল সে। 'আমি পাখি চৌধুরী। মাসুদ ভাই বলেছেন, আপনি আমাকে আমার ফ্ল্যাটে পৌঁছে দেবেন। চলুন।'

'আমি অমল বসু,' তরুণ জবাব দিল। 'মাসুদদা বলেছেন পনেরো মিনিট পর বেরুব আমরা। আপনি আপনার টেবিলে গিয়ে বসুন, প্লীজ।'

'ওঁকে কাভার দিচ্ছে দু'জন, তাই না? আপনার সঙ্গী বাইরে গাড়িতে বসে আছেন, আর আপনি আছেন এখানে। পনেরো মিনিট অপেক্ষা না করে আমরা যদি এখুনি রওনা হই, মাসুদ ভাই বিপদে পড়লে আপনারাও ওঁকে সাহায্য করতে পারবেন, ঠিক কিনা?'

মাথা নাড়ল অমল। 'মাসুদদার নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়।'

'কিন্তু আমি যদি অমান্য করি?'

বিব্রত দেখাল অমলকে। বলল, 'আপনাকে আমি রেস্তোরাঁ থেকে বেরুতে দিতে পারি না।'

বেরুচ্ছি, পারলে ঠেকাও, মনে মনে বলল পাখি। 'ঠিক আছে,' অসহায় একটা ভঙ্গি করল সে। 'আমি লেডি'স রূমে যাচ্ছি।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘুরল সে,

তারপরই ঝেড়ে দৌড় দিল দরজা লক্ষ্য করে।

এরকম অপ্রত্যাশিত ঘটনার জন্যে তৈরি ছিল না অমল, হতভম্ব হয়ে গেল সে। তারপর লাফ দিয়ে সে-ও চেয়ার ছাড়ল, ছুটল দরজার দিকে। ইতিমধ্যে দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছে পাখি।

ফোর্ড স্টার্ট নিচ্ছে, বাধা দেয়ার আর কোন উপায় না দেখে গাড়ির সামনে লাফিয়ে পড়ল অমল। ইতিমধ্যে লাল ডাটসান থেকে রানা এজেন্সির আরেকজন এজেন্ট নেমে পড়েছে। 'শাহীন, এদিকে আয়!' ডাকল অমল। শাহীন কাছে চলে আসতে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল সে। সবশেষে জানতে চাইল,'কি করা যায়?'

ফোর্ডের জানালা দিয়ে মুখ বের করে পাখি বলল,'হয় আপনারাও আমার সঙ্গে আসুন, তা না হলে আমি একাই রওনা হচ্ছি! পথ ছাড়ুন।'

শাহীন বলল,'বুঝতে পারছি না কি করা উচিত!'

'পুলিস ডাকব আমি!' চিৎকার করল পাখি। 'পথ ছাড়ুন!'

'কি আর করা, মাসুদ ভাইকে বুঝিয়ে বললেই হবে। ওঁকে আমরা একা ছাড়তে পারি না।'

দরজা খুলে দিল পাখি। 'উঠে পড়ুন, জলদি!'

অমল বলল, 'আপনি পিছনে বসুন, একা। আমি চালাব, পাশে শাহীন থাকবে।'

পিছনে বসার পর পাখি বলল,'আপনারা আমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছেন, কাজেই কোন অজুহাত আমি শুনতে চাই না, যেভাবে পারেন খুঁজে বের করুন ট্যাক্সিটা। মাসুদ ভাই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওদিকে গেছেন, জানালা দিয়ে দেখেছি আমি।'

গাড়ি ছেড়ে দিল অমল, তার কোলের ওপর একটা পিস্তল পড়ে রয়েছে। শাহীনের হাতেও রয়েছে একটা, মেকানিজম চেক করছে সে। কেউ ওরা খেয়াল করল না রাস্তার ওপার থেকে ইউ টার্ন নিয়ে অনুসরণ করছে একটা সাদা নিশান কার।

খানিক পর অমল বলল,'বাইরে থেকে কেউ যাতে দেখতে না পায় আপনি গাড়িতে আছেন। মাথাটা নিচু করে রাখুন।'

হেসে উঠল পাখি, সে খুব উত্তেজনা অনুভব করছে।'বিপদ আমার নয়, মাসুদ ভাইয়ের। ওঁকে আগে খুঁজে বের করুন।'

শাহীন বলল,'উনি আমাদের সামনে। ছ'টা গাড়ির পর একটা ট্যাক্সি দেখতে পাচ্ছেন? ওই ট্যাক্সিতে আছেন মাসুদ ভাই।'

'ভেরি গুড!'খুশিতে হাততালি দিতে ইচ্ছে করল পাখির। 'আরও কাছে যাবার চেষ্টা করুন। তা না হলে বিপদের সময় সাহায্য করবেন কিভাবে?'

অমল মাথা নাড়ল। 'সেটা উচিত হবে না। মাসুদদার একটা প্ল্যান আছে, আমরা কাছাকাছি থাকলে সমস্যা হতে পারে।'

গত দশ মিনিট ধরে ট্যাক্সির পঞ্চাশ গজ পিছনে থাকছে টয়োটা, পাশে চলে আসার কোন লক্ষণ নেই, পিছিয়েও পড়ছে না। মিনিট খানেক হলো কুইন'স এভিনিউয়ে ঢুকেছে ওরা, আর দু'এক মিনিট পর রাস্তার নির্জন দিকটায় পৌঁছে যাবে। রানা

জানে, টয়োটার আরোহীরা সেই অপেক্ষাতেই আছে। ও নিজেও সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে চায়।

কৌশলটায় সাঙ্ঘাতিক ঝুঁকি আছে, আদর্শ টার্গেট হিসেবে খোলা জায়গায় বেরুতে হবে ওকে। ঝুঁকি থাকলেও, সময়ের সূক্ষ্ম হিসাবে যদি খুঁত না থাকে, প্রতিপক্ষকে নিশ্চিহ্ন করা পানির মত সহজ। গোটা ব্যাপারটাই নির্ভর করছে নীল মার্সিডিজে তৈরি হয়ে থাকা রানা এজেন্সির এজেন্টদের ওপর। ফোর্ডটাকে দেখে প্ল্যানটা বাতিল করে দেয়ার কথা ভেবেছিল রানা। কি ঘটেছে, আন্দাজ করতে পারছে ও। কোন সন্দেহ নেই, পাখির কাণ্ড এটা। তার জেদের কাছে হার মানতে হয়েছে অমলকে। ওদের সঙ্গে সম্ভবত শাহীনও আছে। কিছুক্ষণ নজর রাখার পর বুঝল, ফোর্ডটা কাছাকাছি আসছে না, যথেষ্ট দূরত্ব বজায় রাখছে। কাজেই প্ল্যানটা বাতিল না করলেও চলে বলে মনে হলো।

তবে অন্য একটা কথা ভেবে খুঁত খুঁত করছে রানার মন। ওর বিরুদ্ধে অন্তত দুটো গ্রুপ রাস্তায় নেমেছে। হিথরো থেকে রানা এজেন্সির যারা নজর রাখছিল ওর আর পাখির ওপর, একটা গ্রুপ তাদেরকে পথের কোথাও অচল করে দিয়েছে। অপর গ্রুপটা পিছু নিয়ে রেস্তোরাঁর কাছাকাছি রাস্তার ওপারে এসে অপেক্ষা করছিল, এই মুহূর্তে টয়োটা নিয়ে অনুসরণ করছে ওকে। সন্দেহ নেই, মেলানজিক আবারও আন্ডারগ্রাউন্ডের কোন টেরোরিস্ট সংগঠনকে ভাড়া করেছে। লন্ডনে মাফিয়াদের তেমন দাপট নেই, আন্ডারগ্রাউন্ডে রাজত্ব করে আইআরএ। ফসেলা পরিবার ব্যর্থ হবার পর মেলানজিক দ্বিতীয় বার মাফিয়াদের সাহায্য নেবেন বলেও মনে হয় না। কাজেই ধরে নিতে হয় ওর বিরুদ্ধে আইআরএ-কে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, ওদের ব্যাক-আপ টীমটা কোথায়?

রানার মন খুঁত খুঁত করার এটাই কারণ। ব্যাক- আপ টীম একটা না থেকেই পারে না। সেটা কি পাখির ফ্ল্যাটের সামনে অপেক্ষা করছে?

এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করার বেশি সময় পাওয়া গেল না। চওড়া রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে, ফুটপাথ প্রায় খালি বললেই হয়। রাস্তায় ট্রাফিক আছে, তবে খুবই কম। পিছন দিকে তাকাল ও। যা ভেবেছিল তাই, স্পীড বাড়িয়ে দিয়েছে টয়োটা, কমিয়ে আনছে দূরত্ব।

ওদেরকে প্রথমে কিছু করতে দেবে না রানা, তার আগে ও-ই শুরু করবে। সামনে, ডান দিকে, ফুটপাথ ঘেঁষে একটা টেলিফোন বুদ দেখা গেল। 'একটা ফোন করব,' ড্রাইভারকে বলল ও।'গাড়ি থামাও।'

যাট মাইল স্পীডে ছুটছিল ট্যাক্সি, ধীরে ধীরে কমতে শুরু করল। শেষ একবার পিছনে তাকাল রানা, টয়োটার গতিও কমে আসছে। টয়োটার পিছনে মার্সিডিজ নেই, তার বদলে কালো একটা ফ্রেঞ্চ কার দেখা যাচ্ছে, সিত্রোঁ। টয়োটার আরোহীরা সন্দেহ করতে পারে, তাই রানা এজেন্সির লোকেরা মাঝপথে গাড়ি বদল করেছে।

ঠিক টেলিফোন বুদের পাশে থামল ড্রাইভার। ধীরে-সুস্থে ব্যাক সীট থেকে নিচে নামল রানা, লুগার ধরা হাতটা শরীরের পাশে আড়াল করা। নিচে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে বুদের দিকে এগোল না, জানালার দিকে ঝুঁকে ড্রাইভারকে বলল,'তুমি

কি আমার জন্যে অপেক্ষা করবে? ফোন করতে আমার দেরি হতে পারে।'

ঝোঁকার সময়, সরাসরি না তাকিয়েও, টয়োটাকে দেখে নিল রানা। বিশ-পঁচিশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়েছে ওরা। ড্রাইভার সহ তিনজন লোক, তিনজনই দরজা খুলে নিচে নামছে।

জবাবে ড্রাইভার কি বলল শুনতে পায়নি রানা। সিধে হলো ও, সরাসরি লোকগুলোর দিকে তাকাল। শুধু যে তাকাল তা নয়, হাসিমুখে এক পা এগোলও ওদের দিকে।

তিনজনের হাতই পিছন দিকে লুকানো। শান্ত অথচ দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসছে, চেহারায় আত্মবিশ্বাস। রানা হাসছে দেখেও ওদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া হলো না।

'হ্যালো!' একটা হাত তুলে নাড়ল রানা।

ওর গলার আওয়াজ বাতাসে তখনও মিলিয়ে যায়নি, টয়োটা আর ট্যাক্সির মাঝখানে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সিত্রোঁ! ঝাঁকিটা তখনও থামেনি, সিত্রোঁর ভেতর থেকে গর্জে উঠল কয়েকটা মেশিন-পিস্তল।

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ঝাঁঝরা করে দিল তিনজনের পিঠ, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল শিরদাঁড়া। রাস্তার ওপর পড়ে গেল সবাই, আবার একটা ঝাঁকি খেয়ে ছুটতে শুরু করল সিত্রোঁ।

পাঁচ থেকে সাত সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল ব্যাপারটা। রাস্তার মোড়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে সিত্রোঁ। পিছিয়ে এসে ট্যাক্সিতে উঠতে যাবে রানা, কংক্রিটের সঙ্গে চাকার ঘর্ষণে তীব্র আওয়াজ তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল ফোর্ড, কয়েক সেকেন্ড আগে ঠিক যেখানে সিত্রোঁটা দাঁড়িয়েছিল। পুরোপুরি থামার আগেই পিছনের দরজা খুলে ছিটকে বেরিয়ে এল পাখি। 'মাসুদ ভাই!' বলে চিৎকার দিল একটা, তারপর ছুটে এল রানার দিকে।

আর তারপরই আবার কংক্রিটের সঙ্গে চাকা ঘষা খাওয়ায় তীব্র আওয়াজ উঠল। এক কি দু'সেকেন্ডের মধ্যে ঘটে গেল অনেকগুলো ঘটনা, প্রতিটি দৃশ্য চিরকাল মনে থাকবে রানার।

ও দেখল, অমল আর শাহীন ফোর্ড থেকে বেরুতে চেষ্টা করছে, কিন্তু নিশান কার থেকে ছুটে এল এক পশলা বুলেট, গাড়ির আরও ভেতর দিকে সেঁধিয়ে গেল শরীর দুটো।

ফুটপাথ থেকে তখনও পাঁচ-সাত গজ দূরে পাখি, ব্রেক কষার আওয়াজ শুনে ছোটা বন্ধ করে ঘুরে গেল সে, পিছন ফিরল রানার দিকে। রানা ফুটপাথের ওপর দাঁড়িয়ে, পিস্তল ধরা হাতটা লম্বা করে দিয়েছে, কিন্তু নিশান কারের জানালা আর ওর মাঝখানে পাখি দাঁড়িয়ে পড়ায় গুলি করতে পারছে না।

'হায় আল্লা! পাখি!' বলে আর্তনাদ করে উঠল রানা। 'শোও! শুয়ে পড়ো!' শোও, শোও, শোও...!'

নিশান কারের ভেতর থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। রানার দিকে পিছন ফিরে পাখি যেন নাচতে শুরু করল। অসহায় রানা দেখল, পাখি ঠিক নাচছে না, প্রতি মুহূর্তে ছোট ছোট লাফ দিয়ে বাতাস থেকে কি যেন খামচি দিয়ে ধরার চেষ্টা করছে। কখনও বাঁ দিকে লাফ দিচ্ছে, কখনও ডান দিকে, আবার কখনও পিছন দিকে।

অকস্মাৎ এক বিহ্বল মুহূর্তে রানা উপলব্ধি করল, প্রতিটি বুলেট ছুটে আসছে ওর দিকে, আর পাখি সেগুলোকে লুফে নিতে চেষ্টা করছে, প্রতিটি গুলির সামনে পেতে দিচ্ছে নিজের নরম শরীরটা।

কেউ দেখেনি ফোর্ড থেকে কখন গড়িয়ে নেমে এসেছে শাহীন। সে সিধে হতেই নিশান কারের ভেতর সাবমেশিন-গানের মাজল ঘুরে যেতে শুরু করল। তার আগেই ঝলসে উঠল শাহীনের পিস্তল।

ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে টলছে পাখি, ফেরার চেষ্টা করছে রানার দিকে, এই সময় ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল রানা। ধীরে ধীরে রাস্তার ওপর বসল ও, কোলের ওপর ধরে আছে পাখিকে, ঝুঁকে একটা চুমো খেলো তার কপালে। 'এ কি করলে তুমি!'

চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে পাখি। তার ঠোঁটে সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা।

পাশে এসে দাঁড়াল শাহীন আর অমল। দু'জনেই গুলি খেয়েছে, তবে মারা যাবে না।

'মাসুদ ভাই, পুলিস আসছে। ফোর্ডে উঠতে হবে আপনাদের, আপনার ট্যাক্সি ড্রাইভার পালিয়েছে।'

চোখ খুলল পাখি। 'এখন যদি বলি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম, আমি জানি তুমি রাগ করতে পারবে না...' হাঁপাচ্ছে সে, একবার কাশতেই হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল গলা দিয়ে। 'পবনকে দেখো তুমি...'

দু'হাতে পাখিকে বুকে তুলে নিল রানা। ব্যাক সীটে তুলল তাকে, শাহীনকে বলল, 'কার্লটন স্ট্রীট, সেফ হাউস।'

'হাসপাতাল বা ক্লিনিকে...?'

'পাখি বেঁচে নেই,' বলল রানা। 'আমাকে হিথরোতে নামিয়ে দেবে, ওখান থেকে এজেন্সির ডাক্তারকে ফোন করব আমি। পাখির লাশ হপ্তা দুই প্রিজার্ভ করতে হবে, ওর ভাই ওকে দেখতে চাইতে পারে।'

রানার গলা শুনে শাহীনের পাশ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল অমল। জীবনে যা কোন দিন দেখেনি বা দেখবে বলে ভাবেনি, আজ তাই দেখল সে। অনবরত ঝাঁকি খাচ্ছে রানার শরীর, অদম্য কান্না ঠেকিয়ে রাখার ব্যর্থ চেষ্টায়। চির ঘুমে নিমগ্ন পাখির শান্ত পবিত্র মুখমণ্ডল ভেসে যাচ্ছে ওর চোখের অঝোর ধারায়।

আট

রিপোর্টটা দ্বিতীয় বার পড়লেন মেলানজিক বেলোভিচ। তারপর খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে আরেকবার চোখ বুলালেন। মনের গভীরে শীতল একটা অনুভূতি হলো তার, শরীরটা শিরশির করে উঠল। বিড়বিড় করে বললেন, 'লোকটা ভাগ্যবান।'

'না।' মাথা নাড়লেন পিটার মেলভিক। 'আইআরএ ভুল করেছে। কথা ছিল প্রথমে ওরা চেষ্টা করবে গাড়িটায় রেডিও-কন্ট্রোলড বোমা রেখে আসার। সময়

বাঁচাতে গিয়ে গোটা ব্যাপারটাই ভেস্তে দিয়েছে ওরা। অপারেশনটা ব্যর্থ হবার কারণ এয়ারপোর্ট থেকে রেস্তোরাঁয় যাবার পথে পিছনের গাড়িটা নেই দেখে মাসুদ রানা আগেই সাবধান হয়ে গিয়েছিল। একটা নয়, অনেকগুলো ভুল করেছে ওরা। রেস্তোরাঁ থেকে এতটা দূরে গাড়ি পার্ক করেছিল, ভেতরে রানা কি করছে দেখার সুযোগ ছিল না। ভুল আমাদেরও হয়েছে।'

'কি ভুল?'

'আইআরএ-কে আমরা জানাইনি লোকটা মাসুদ রানা, একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির ডিরেক্টর,' বললেন মেলভিক। 'রেস্তোরাঁ থেকে নিজের এজেন্সিতে ফোন করে রানা, দুটো গাড়ি নিয়ে রিইনফোর্সমেন্ট পৌঁছে যায়। প্ল্যানটাও ফোনে করা হয়। সেটা কাজে লাগানো হয় কুইন'স রোডে, আইআরএ-র দ্বিতীয় গ্রুপটাকে খতম করে। আরেকটা ভুল, ব্যাক-আপ টীমটাকেও রেস্তোরাঁর কাছাকাছি রাখা উচিত হয়নি, রাখা উচিত ছিল ফ্ল্যাটের কাছাকাছি। ফোর্ডটাকে অনুসরণ করে কি লাভ, একবারও ভেবে দেখেনি ওরা।'

'তবু ফোর্ডটাকে অনুসরণ করেছিল বলেই রাস্তায় রানাকে পেয়ে যায় ওরা...'

/মেলানজিককে বাধা দিয়ে মেলভিক বললেন, 'তাতে কোন লাভ হয়েছে? স্বাভাবিক যুক্তি কি বলে? একটা হামলা ব্যর্থ হলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় হামলা করা বোকামি নয়তো কি! মেয়েটা ওখানে ছিল বলে দু'পাঁচ সেকেন্ড পরে মারা গেছে ওরা, তা না হলে রানার গুলিতে আরও আগে মারা পড়ত।'

'মেয়েটা কে?' মেলানজিক জানতে চাইলেন।

'তার পরিচয় এখনও জানা যায়নি,' মেলভিক বললেন। 'ব্রিটিশ পুলিস মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস গোটা ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখছে, ওদের নির্দেশেই পুলিস কিছু বলছে না।'

'বিএসএস? তারাও জড়িত নাকি?'

'কে বলবে।' কাঁধ ঝাঁকালেন মেলভিক। 'আমরা জানি, এই লোকটা আপনার কাছে আসছে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া চলে যে সিআইএ জানে, কাজেই ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসেরও জানার কথা। আমার ধারণা, ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে তারা, ঘটনাটা কখন ঘটবে দেখার অপেক্ষায় আছে। এক্ষেত্রে বাধা না দেয়ার অর্থ লোকটাকে সাহায্য করা, তাই না? পুলিসকে মুখ খুলতে নিষেধ করে দিয়েছে বিএসএস, কারণ মেয়েটার পরিচয় ইত্যাদি জানা গেলে মাসুদ রানা সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়বে, তাকে খুঁজে বের করা খানিকটা সহজ হয়ে যাবে আমাদের জন্যে।'

চুরুট ধরাতে গিয়ে মেলানজিক লক্ষ করলেন তাঁর হাত একটু একটু কাঁপছে। 'আমরা তাহলে দু'বার ব্যর্থ হলাম।'

তার এইড মেলভিক বললেন, 'আরও খারাপ খবর আছে।'

'যেমন?'

'ফ্রেঞ্চ জার্নালিস্ট পেরো কন্ট্রাক্ট বাতিল করেছেন,' বললেন মেলভিক। 'বলছেন এ-সব ব্যাপারে তিনি নিজেকে জড়াতে চান না। জানা কথা, ফ্রেঞ্চ

এসডিইসিই-কে খবর দেবেন তিনি। আর ওরা ব্রিটিশদের জানাবে।'

'জানা কথা আর কি কি আছে?' বাঁকা হেসে জিজ্ঞেস করলেন মেলানজিক।

মেলভিক গম্ভীর হয়ে গেলেন। 'আরেকটা জানা কথা হলো এখানে আসার পথে রয়েছে মাসুদ রানা।'

'তাহলে এখানেই তাকে মরতে হবে,' কর্কশ সুরে বললেন মেলানজিক।

রানাকে দেখেই সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল পবন। এই মুহূর্তে কাঁদছে না সে, তবে চোখ দুটো ফুলে লালচে হয়ে আছে। রানা কোন কথা বলল না, নিঃশব্দে এগিয়ে এসে বুকে টেনে নিল ওকে। এতক্ষণে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল পবন, ফুঁপিয়ে উঠে বলল, 'আমি একদম একা হয়ে গেলাম, মাসুদ ভাই!'

না, পবন না! তোমার পাশে আমি আছি। শুধু একা আমি নই, গোটা রানা এজেন্সি চিরকাল তোমার পাশে থাকবে। কথাগুলো মনে মনে বলছে রানা, কোন শব্দ না করে পবনের মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরল শুধু। দু'মিনিট ওভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল ওরা, তারপর পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা রুমাল বের করে পবনের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'কেঁদো না, ভাই। তুমি কাঁদলে আমি কষ্ট পাব।'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে রানার মুখের দিকে তাকাল পবন। কি যেন খুঁজল সেখানে।

নেপলস-এ, নির্জন পাহাড়ের ওপর একটা বাড়িতে রয়েছে ওরা। এদিকের সবগুলো পাহাড়ের মাথায় একটা করে বাড়ি, সারা বছর প্রায় খালিই পড়ে থাকে, শুধু শীতের সময় সৌখিন লোকেরা স্কিইং-এর জন্যে এলে দরজা-জানালা খোলা হয়। এই বাড়িটা রানা এজেন্সির নিজস্ব সম্পত্তি, প্রয়োজনে সেফ হাউস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে গোজোয় ছিল পবন, ব্রাসেলস থেকে ওকে ফোন করেন ন্যানি। 'নিজেকে শক্ত করো, বাছা,' ওকে বলেন তিনি। 'তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে। দুঃসংবাদটা যে কি, তোমাকে বলতে পারছি না, কারণ সঠিক জানা নেই আমার। তোমার জিনিস-পত্র একটা ব্যাগে গুছিয়ে অপেক্ষা করো। সোহেল আহমেদ নামে রানার এক বন্ধু তোমার কাছে আসছেন। রানাই তাঁকে পাঠাচ্ছে। রানা বলেছে, তাঁর সঙ্গে চলে আসবে তুমি।'

ব্যাগ গুছিয়ে অপেক্ষা করছিল পবন, বারো ঘণ্টা পর পৌঁছুল সোহেল, হাতে একটা পেনট্যাক্স ক্যামেরা। দরজা খোলাই ছিল, সরাসরি বাড়িতে ঢুকে পবনকে মাথায় হাত দিয়ে ড্রইংরুমে বসে থাকতে দেখে সে। উঠে দাঁড়ায় পবন, রানার মত সোহেলও তাকে নিজের বুকে টেনে নেয়।

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয় পবন, যেন বিরক্ত হয়েছে। তারপর ফিসফিস করে জানতে চায়, 'আপা নেই, না?'

কথা না বলে ছোট করে মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

জানালার দিকে ঘুরে গেল পবন। 'আমি একটু একা থাকতে চাই, প্লীজ।'

কথা না বলে ক্যামেরাটা টেবিলে রেখে কামরা থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল সোহেল, শুনতে পেল ঘরের ভেতর ফোঁপাচ্ছে পবন, 'আপা...আপা...' করে

ডাকছে বারবার। দু'মিনিট পর ডাকটা বন্ধ হলো, আরও তিন মিনিট পর কান্নার শব্দও থামল।

তারপর পায়ের শব্দ পেয়ে ঘুরল সোহেল। দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে পবন, বলল, 'দুঃখিত। ভেতরে এসে বসুন, প্লীজ। সব কথা বলুন আমাকে।'

পবনের হাত ধরে সোফায় এনে বসাল সোহেল। প্রথমে নিজের পরিচয় দিল ও। এই প্রথম জানতে পারল পবন, রানা এজেন্সি আসলে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একটা কাভার। এজেন্সির ডিরেক্টর মাসুদ রানা, তবে সেটা ওর প্রধান পরিচয় নয়। ওর আসল পরিচয়, বিসিআই-এর অন্যতম একজন এজেন্ট। আর সোহেল আহমেদ শুধু রানার বন্ধু নয়, বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরও (অপারেশনস) বটে।

ঘটনাটা বর্ণনা করার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা করল সোহেল। 'বিসিআই বলো, রানা এজেন্সি বলো, এ-দুটোর সঙ্গে আমরা যারা জড়িত তারা সবাই আসলে দেশের সেবা করছি। আমাদের বস্, অবসর প্রাপ্ত মেজর জেনারেল রাহাত খান নমস্য ব্যক্তি। এখানে আসার আগে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। তিনি তোমাকে বলতে বলেছেন, মারা যাবার সময় দেশ-সেবার মহৎ একটা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করে গেছেন তোমার বোন পাখি চৌধুরী। মাসুদ রানা বাংলাদেশের একটা অমূল্য সম্পদ, তোমার বোন ওকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন।'

অবাক হয়ে শুনছে পবন।

এরপর ধীরে ধীরে ঘটনাটার বর্ণনা দিল সোহেল। পবন কোন প্রশ্ন করল না, কাঁদল না, সোহেলের প্রতিটি কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনে গেল শুধু।

এক সময় সব কথা ফুরাল। পবনের চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল, তবে কোন শব্দ করল না। পাঁচ মিনিট নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল। তারপর সোহেল বলল, 'এবার আমাদের যেতে হয়, পবন। ভাল কথা, ক্যামেরাটা তোমার জন্যে নিয়ে এসেছি। সুযোগ পেলেই ব্যবহার কোরো, প্রয়োজন আছে।'

রাতের ফেরি ধরে নেপলসে চলে এল ওরা। ফেরির কেবিনে রাতটা একাই কাটায় পবন, সোহেল মাঝে মধ্যে ভেতরে ঢুকে দেখে গেছে তাকে। পবন বুঝতে পারে, বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে আসলে পাহারা দিচ্ছে সে।

ঘুম আসছিল না, ফেরির ক্যান্টিনে চা পাওয়া যাবে কিনা দেখার জন্যে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে ও। ওর সঙ্গে সোহেলও ক্যান্টিনে গিয়ে বসে। ওদের পাশের টেবিলেই বসে ছিল এক কিশোরী, তার বাপের সঙ্গে। চোখাচোখি হতে মেয়েটা হাত নেড়ে 'হাই' বলল। উত্তরে ম্লান হাসল পবন, 'হ্যালো' বলল। অনুমতি নিয়ে তার কয়েকটা ছবি তুলল ও। ঠিকানাটাও নিয়ে রাখল, প্রিন্ট করিয়ে পাঠিয়ে দেবে।

সকালে ফেরি থেকে নেমে ট্যাক্সি নিয়ে সেফ হাউসে চলে আসে ওরা। পবনকে একটা কামরা দেখিয়ে দিয়ে সোহেল বলল, 'যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বে রানা। আমরা ওর জন্যে অপেক্ষা করব।'

রানা এল আরও তিন ঘণ্টা পর।

রানার মুখে কি যেন খুঁজছে পবন। 'মাসুদ ভাই, আপা কি···আপা কি সঙ্গে সঙ্গে

মারা গেছে?'

'না,' বলল রানা। 'গুলি খাবার পর কিছুক্ষণ বেঁচে ছিল, তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'কি কথা হয়েছে?' পবনের গলায় ব্যাকুল সুর। 'আমার কথা কিছু বলে গেছে আপা?'

'বলল আমি যেন তোমাকে দেখি।'

মেঝের দিকে তাকাল পবন, তারপর বড় করে শ্বাস টেনে মুখ তুলল। 'জানেন, মাসুদ ভাই, গোজো থেকে যে দিন রওনা হলো, তার আগের রাতে আলিমুজ্জামান'স-এ আমরা ডিনার খেয়েছিলাম··· লবস্টার।'

'আমি জানি।'

'খেতে খেতে আপনার সম্পর্কেও অনেক কথা হলো। আপা নেই, তাই এখন কথাটা বলা যায়···'

পবন চুপ করে গেল দেখে রানা জিজ্ঞেস করল, 'কি কথা, পবন?'

'আপা···আপা আপনাকে ভালবাসত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। 'আগে থেকেই জানতাম আমি,' বলল ও। 'মারা যাবার আগে মুখ ফুটে বলেও গেছে সে।'

আবার ভিজে এল পবনের চোখ দুটো। 'মাসুদ ভাই, আপাকে আপনারা কোথায় কবর দিলেন?' কপাল থেকে চুল সরাল সে। 'শেষ একবার দেখার ভাগ্যও হলো না আমার।'

'পাখির লাশ প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা হয়েছে, পবন। কাজটা শেষ হলে তুমি তাকে দেখার সুযোগ পাবে। তুমি যদি চাও, তাকে আমরা বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েও কবর দিতে পারি। ডেথ সার্টিফিকেট, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট, ইত্যাদি কোন সমস্যা হবে না।'

রানার একটা হাত চেপে ধরল পবন। 'ধন্যবাদ, মাসুদ ভাই। দেশে ফেরার খুব ইচ্ছে ছিল আপার। আমরা ওকে দেশেই কবর দেব।'

'চোখ মোছো, পবন,' বলল রানা। 'শোকটাকে শক্তিতে পরিণত করো। যে দায়ী তার কথা চিন্তা করো শুধু··· মেলানজিক সম্পর্কে ভাবো।'

সাদা গ্যাবার্ডিনের সুট পরেছে সোহেল, তাকে কামরায় ঢুকতে দেখে পবন ভাবল, ভদ্রলোকের মধ্যে কি যেন একটা খুঁত আছে, সন্দেহ হয় অথচ ধরা যায় না।

সেফ হাউসের ঝুল-বারান্দায় বসে ডিনার খেলো ওরা। অনেক নিচে নেপলস শহরের আলো দেখা যাচ্ছে, ক্রমশ আরও নিচের দিকে নেমে গেছে, আলোগুলোর সামনে বন্দর ও সাগর দেখা যাচ্ছে। সেফ হাউসের কেয়ারটেকার, বৃদ্ধ এক বাঙালী পরিবেশন করলেন ওদেরকে। বৃদ্ধের আচরণ দেখেই বোঝা গেল রানাকে তিনি অনেক দিন থেকে চেনেন।

টেবিলে বসার পর সোহেলের দিকে ইঙ্গিত করে পবনকে রানা বলল, 'ওর পরিচয় তো জেনেছ। আমাদের এই কাজটা শেষ হলে ও তোমাকে দেশে নিয়ে যাবে। আগামী দুটো বছর ওখানে ট্রেনিং নেবে তুমি। এই দু'বছর ট্রেনিঙের ফাঁকে

ফাঁকে রানা এজেন্সির কাজও করবে। তবে বিসিআই-এ নাম লেখাতে হলে ট্রেনিঙে ভাল করতে হবে তোমাকে, প্রতিটি বিষয়ে একশোয় একশো পেতে হবে। প্রায় অসাধ্য সাধনই বলতে পারো। কি, ভয় লাগছে?'

মৃদু হেসে পবন মাথা নাড়ল। 'এখন আর আমি ভয় কাকে বলে জানি না।'

'সোহেল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' বলল রানা। 'প্রশংসা করছি না, সত্যি কথা বলছি, ওর হাতে পড়লে একদম খাঁটি সোনা হয়ে উঠবে তুমি।'

একটু আড়ষ্ট হেসে পবন জিজ্ঞেস করল, 'উনি···মানে সোহেল ভাই কি আপনার চেয়েও ভাল?'

'ভাল কোন্ অর্থে?'

'উনি তো প্রশাসনে আছেন, তাই না? যখন ফিল্ডে ছিলেন, স্নাইপার হিসেবে আপনার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতেন? কিংবা পিস্তলে? আনআর্মড কমব্যাটে?'

সোহেল হাসছে।

রানা বলল, 'ও এতবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে, সংখ্যাটা আমি ভুলে গেছি। উত্তর পেলে?'

'তখন বোধহয় সোহেল ভাইয়ের দুটো হাতই ছিল, তাই না?'

'গুড, ভেরি গুড। তুমি তাহলে ব্যাপারটা ধরে ফেলেছ? তোমার অবজারভেশন সত্যি ভাল।' হাসছে সোহেল। হাত একটা সত্যি নেই তার, তবে আর্টিফিশিয়াল হাত থাকায় সহজে তা ধরা যায় না।

'একটা হাত ছাড়াই স্নাইপার হিসেবে আমার মতই দক্ষ ও,' বলল রানা।

'তারমানে কি আমার চেয়েও ভাল?' হাসছে পবনও।

'সেটা বলা মুশকিল,' জবাব দিল রানা। 'তবে ও তো আর গণেশ থাপার কাছে ট্রেনিং পায়নি।'

বিস্মিত দেখাল সোহেলকে। 'তুই এই বাচ্চা ছেলেকে গণেশ থাপার হাতে তুলে দিয়েছিলি?'

'এক মাসের জন্যে। ট্রেনিং শেষ হতে বললেন, তিনি সন্তুষ্ট।'

পবনের দিকে এবার যেন নতুন দৃষ্টিতে তাকাল সোহেল। পবন বলল, 'সোহেল ভাই, আমি কিন্তু এখন আর বাচ্চা ছেলে নই।'

হেসে উঠে মাথা ঝাঁকাল সোহেল।

এরপর কাজের কথা পাড়ল রানা। 'অতিরিক্ত একটা করে পাসপোর্টের কথা বলেছিলাম, যোগাড় হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'বসনিয়া থেকে সার্বিয়ায় যাওয়া এখন প্রায় অসম্ভব। এনজিও-র লোকজন চলাফেরায় কিছুটা স্বাধীনতা পাচ্ছে বটে, কিন্তু তা-ও শুধু বসনিয়ার ভেতর। অনেক দিক চিন্তা করে একজন জার্নালিস্ট ও একজন ফটোগ্রাফারের কাগজ-পত্র তৈরি করা হয়েছে। দু'জনেই তোরা ভারতীয়, বর্তমানে ব্রিটিশ নাগরিক, তুই ডেইলি স্টার-এর জার্নালিস্ট, পবন ওই একই পত্রিকার ফটোগ্রাফার।'

'গুড।'

সোহেল বলল, 'আলোচনার সময় বস্ আমাকে বললেন, তুই সরাসরি কারও

সাহায্য না নিয়ে একাই কাজটা করতে চাইবি, তবু জিজ্ঞেস করতে বলেছেন যে বেলগ্রেডে বিসিআই কোন লোক পাঠাবে কিনা।'

মাথা নাড়ল রানা। 'দরকার হবে না।'

আরও দশ মিনিট নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। ঘরের ভেতর নিস্তব্ধতা নামতেই পবন জানতে চাইল, 'এরপর? আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে?'

'আগামী হপ্তার নির্দিষ্ট একটা দিনে বসনিয়া জেনারেল কমান্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী,' বলল রানা। 'প্রতি বছরই বেলগ্রেডে একটা অনুষ্ঠান করা হয়। শতকরা পঁচানব্বই ভাগ সম্ভাবনা আছে মেলানজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন।'

'কি ধরনের অনুষ্ঠান···সাংস্কৃতিক?' জিজ্ঞেস করল পবন।

'পাঁচমিশালি। প্রথম দিকে ভাষণ দেয়া হয়। জেনারেল কমান্ডের গেরিলারা মিছিল করে আসে। বসনিয়া সার্ব শিল্পীরা দেশাত্মবোধক গান করে। গোটা অনুষ্ঠানটাই হয় খোলা একটা মঞ্চে। মেলানজিককে চারদিক থেকে ঘিরে রাখবে সশস্ত্র বডিগার্ডরা, তবে দূর থেকে তাঁকে একটা গুলি করা অসম্ভব হবে না।'

'কত দূর থেকে?'

বড় করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'প্রায় পাঁচশো মিটার।'

'দিনের কোন্ সময়ে?' দ্রুত জিজ্ঞেস করল পবন।

'সন্ধের কাছাকাছি, সূর্য ডোবার ঠিক আগে।'

পবন উচ্চারণ করল, 'গণেশ থাপা।'

ঝট করে মুখ তুলল রানা। 'তাঁকে আমি কোনদিনই ব্যবহার করব না।'

মাথা নাড়ল পবন। 'আমি সে-কথা বলছি না। ব্যাপারটা আমারও ব্যক্তিগত। নিশ্চয়ই একা প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবছেন না আপনি? গণেশ থাপার কথা বললাম তাঁর ধারণার কথা ভেবে। তিনি বলেছেন, স্নাইপার হিসেবে আপনার চেয়ে ভাল আমি।'

'সেটা বিতর্কের ব্যাপার,' বলল রানা। 'ফায়ারিং রেঞ্জে তুমি হয়তো আমার চেয়ে ভাল। কিন্তু ফিল্ডে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমার আছে।'

সোহেল বলল, 'ব্যাপারটার মধ্যে বিস্তর ফারাক। কার্ডবোর্ড টার্গেট আর হিউম্যান বিইঙ এক জিনিস নয়। রক্ত-মাংসে গুলি করার সময় মন আর চোখে প্রতিক্রিয়া হয়।'

'মেলানজিক রক্ত-মাংস নন,' জবাব দিল পবন। 'আমার মন শান্ত থাকবে, চোখের দৃষ্টিও তীক্ষ্ণ থাকবে। আমি মিস করব না।' রানার দিকে ফিরল সে, জানতে চাইল, 'বেলগ্রেডে ক'টা রাইফেল রাখা হয়েছে?'

'দুটো।'

'হেকলার অ্যান্ড কোচ?'

'হ্যাঁ।'

চেয়ারের কিনারায় সরে এসে সামনের দিকে ঝুঁকল পবন। 'তাহলে আমি গুলি করব। আপনি আমার ব্যাক-আপ। ঠিক আছে, মাসুদ ভাই?'

রানা কিছু বলার আগেই চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে. হাতের ন্যাপকিন ফেলে দিল

টেবিলে। 'আমি শুতে যাচ্ছি,' বলল সে। 'মাসুদ ভাই, ও আমার মায়ের পেটের বোন ছিল।' সোহেলের দিকে তাকাল সে। 'আমি যদি কোন বেয়াদবি করে থাকি, মাফ করবেন, প্লীজ।' ঝুল-বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'কি বুঝলি?' পবন চলে যেতে সোহেলকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ঠিক মত সামলাতে পারলে বিসিআই-এর জন্যে একটা অ্যাসেট হতে পারে এই ছেলে,' মন্তব্য করল সোহেল। 'যা বলল তা কি সত্যি? তোর চেয়ে ভাল স্নাইপার? আমি ছ'শো মিটার দূর থেকে এক লোকের দু'চোখের মাঝখানে গুলি করতে দেখেছি তোকে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ স্নাইপার বলতে গণেশ থাপাকে বুঝি আমি। পবনকে নিজের সমকক্ষ মনে করেন তিনি। এ-ব্যাপারে নিখুঁত হবার গুণটা যেন জন্মসূত্রে পেয়েছে পবন। তারপর সেরা লোকের কাছে ট্রেনিং পেয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছে।'

'অন্যান্য অস্ত্রে?' সোহেলের চোখে কৌতূহল।

'ভেরি, ভেরি গুড,' জবাব দিল রানা। 'ছেলেটাকে আমি একটা সত্যিকার ফাইটারে পরিণত করেছি। এক অর্থে ঠিকই বলেছে ও। প্রতিশোধ নেয়া আমার একার মনোপলি হতে পারে না। রক্তের সম্পর্ক আছে, এমন কেউ মারা যায়নি আমার। পবনের তো সবাইকেই মেরে ফেলা হয়েছে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'পাখির মৃত্যুর জন্যে নিজেকে দায়ী করি আমি। এ যেন একটা অভিশাপ, কেউ আমার কাছাকাছি এলেই মৃত্যু হয় তার।'

'তুই কি ভয় পাচ্ছিস, রানা?' ভুরু কুঁচকে তাকাল সোহেল।

'আমার জন্যে নয়,' জবাব দিল রানা। 'ভয় পাচ্ছি পবনের জন্যে।'

নয়

বেলগ্রেডে মেলানজিক তাঁর দুই ছেলে, এইড মেলভিক আর কর্নেল পেত্রোভিচকে নিয়ে জেনারেল কমান্ডের হেডকোয়ার্টারে ডিনার খেলেন। মাসুদ রানা আসছে, এই ছিল তাঁদের আলোচনার বিষয়-বস্তু।

রাতের ট্রেনে রোম থেকে প্যারিসে আসছে রানা, পবনকে নিয়ে ডিনার খেলো রেস্টুরেন্ট কার-এ, কথা বলল আসন্ন অপারেশন নিয়ে।

'আমার রুটিন আমি বদলাব না।' জেদ ধরলেন মেলানজিক। 'অপারেশন কোবরার সময় এগিয়ে আনা হয়েছে, কাজেই কাল আমাকে ক্যাম্পে গিয়ে ফাইটারদের বিদায় জানাতে হবে। এই অপারেশনটায় সবাই ওরা মারা যেতে পারে। ওদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে নিজে আমি এখানে লুকিয়ে থাকতে পারব না।'

'মেলানজিকের হেডকোয়ার্টার দুর্গম দুর্গ,' বলল রানা। আলপস-এর পার্দদেশে পৌঁছে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে আসছে। 'ওখানে আমরা সুবিধে করতে পারব না। তাঁকে আমাদের হেডকোয়ার্টারের বাইরে কোথাও পেতে হবে।'

'আপনি নিশ্চিত, হেডকোয়ার্টার ছেড়ে বেরুবেন তিনি?' জিজ্ঞেস করল পবন।

ডাইনিং কার মাত্র অর্ধেকটা ভরেছে, ওদের সামনের ও পিছনের টেবিলগুলো খালি। মেইন কোর্স হিসেবে স্টেক-এর অর্ডার দিয়েছে ওরা। স্টুয়ার্ড পরিবেশন করে চলে যাবার পর জবাব দিল রানা, 'সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রতি বছরই আসেন তিনি।'

'প্রতি বছর কি একই জায়গায় অনুষ্ঠান করে ওরা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'একই জায়গায়। মুসলমানদের ওপর প্রথমবার যখন চড়াও হলো বসনিয়ার সার্বরা, মুসলমানদের পাল্টা আক্রমণে বহু সার্ব মারা যায়। তাদেরকে ওরা শহীদ বলছে, তাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বেলগ্রেডের একটা চৌরাস্তার নামকরণ করেছে শহীদ স্কয়্যার। ওখানেই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।'

'ওখান থেকে পাঁচশো মিটার দূরে আমরা পজিশন নেব?'

'হ্যাঁ। ওই পজিশন থেকে স্কয়্যারটা দেখা যায়।'

বিপদটাকে একদমই পাত্তা দিতে চাইছে না সেলার্ভিক। ধূমায়িত বাউল-এর দিকে হাত বাড়াল সে, এক টুকরো মাটন তুলে মুখে পুরল। 'ভয় পাবার কিছুই নেই,' মাংস চিবাতে চিবাতে বলল সে। 'আমরা সার্বিয়ার ভেতর, সুরক্ষিত নিজেদের এলাকায় রয়েছি। যুদ্ধ বলো, দাঙ্গা-ফ্যাসাদ বলো, সীমান্তের ওপারে হচ্ছে। সীমান্ত পেরিয়ে সিআইএ পর্যন্ত ঢুকতে পারেনি, পারলে আমাদের বহু নেতাকে মেরে ফেলত।' বাবার দিকে তাকাল সে। 'এতদিন বেঁচে আছেন, দশ-বারো হাজার মাইল দূরের এক ভেতো বাঙালীর হাতে মারা যাবেন বলে, এ স্রেফ হতেই পারে না।'

'ভেতো বাঙালী মানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল গোরাজদিক।

সেলার্ভিক হাসল। 'এই মাসুদ রানা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছি আমি,' বলল সে। 'তোমরা তো শুধু তার গুণ আর খ্যাতির কথাই জেনেছ, সব প্লাস পয়েন্ট। কিন্তু আমি জেনেছি খারাপ দিকগুলো। গরীব একটা দেশে জন্ম তার, বারো কোটি মানুষের মধ্যে আট-নয় কোটিই দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না। পরনের কাপড় নেই, মেয়ে শিশুরাও উলঙ্গ থাকে। বছরে বিশ লাখ টন চাল ঘাটতি। ভাতই ওদের প্রধান খাদ্য। অলস, চতুর, অশ্লীল একটা জাতি। তাদের প্রতিনিধি মাসুদ রানাকে ভয় পাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ, তোমরাই বলো?'

নিরেট খাবারের চেয়ে পানীয়ই বেশি গিলছেন কর্নেল পেত্রোভিচ। হুইস্কির গ্লাসে পানি ঢেলে নাড়ছেন তিনি, বললেন, 'সিআইএ সম্পর্কে যে-কথা বললে তুমি, তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। আমাদের রাজনৈতিক নেতা রাদোভান কারাদজিক ও সেনা কমান্ডার রাতকো ম্লাদিচ সহ কর্মকর্তা শ্রেণীর পঁচিশ জনের

বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে। বলা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে বিচার করা হবে তাঁদের। সীমান্ত পেরিয়ে সার্বিয়ার ভেতরে ঢোকার দরকার নেই সিআইএ-র, উনিশশো বিরানব্বুইয়ের অনেক আগে থেকেই সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সবখানে আছে ওরা। সেনা কম্যান্ডার ম্লাদিচের নাগাল পাওয়া হয়তো কঠিন, কারণ তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে থাকেন, কিন্তু ইচ্ছে করলে রাদোভান কারাদজিক বা অন্যান্যদের তারা অনায়াসে ধরতে পারত বা এখনও পারে। ধরছে না, কারণ বসনিয়ার এই যুদ্ধটা আমেরিকানরাও নিজেদের স্বার্থে আরও কিছুদিন জিইয়ে রাখতে চায়। রাশিয়া সহ ইউরোপীয় অন্যান্য বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করতে না চাওয়াও অন্যতম একটা কারণ। কাজেই সিআইএ আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারছে না, এ-কথা ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করা ঠিক নয়।'

'আপনার সঙ্গে আমিও একমত,' মেলানজিক বললেন। 'সিআইএ অ্যাসাসিনেশনে এক্সপার্ট, ইচ্ছে করলে এতদিনে দু'চারজনকে কি আর মারতে পারত না?'

'এ-প্রসঙ্গে আবার মাসুদ রানা ও বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স প্রসঙ্গ উঠে পড়ে,' বললেন কর্নেল পেত্রোভিচ। 'আমি ওদের সাফল্যের সংক্ষিপ্ত একটা তালিকা দিই। ইসরায়েলকে নিউক্লিয়ার বোমা বানাতে সাহায্য করছিল একদল জার্মান বিজ্ঞানী, দেশে ছুটি কাটাতে আসার পথে সবাই তারা খুন হয়ে যায়। ধারণা করা হয় লিবীয় ইন্টেলিজেন্স দায়ী, ওদেরকে সাহায্য করেছিল বিসিআই অর্থাৎ মাসুদ রানা। বসনিয়ার প্রেসিডেন্ট আলিয়া ইজাতবেগোভিচকে খুন করার প্ল্যান করে কেজিবি, আমরা ওদেরকে সাহায্য করি, কিন্তু প্ল্যানটা বানচাল করে দেয় রানা এজেন্সি। সেদিন ইজাতবেগোভিচের একটা অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসেননি, তাঁর ছদ্মবেশ নিয়ে অন্য এক লোক এসেছিল, সঙ্গে ছিল রানা এজেন্সির অপারেটররা। কেজিবি হামলা শুরুর আগে তারাই প্রথম আক্রমণ করে। বছর খানেক আগে ব্রাসেলসে এক কানাডীয় ব্যালেস্টিক এক্সপার্ট খুন হন, সার্বিয়া সরকারের সঙ্গে গোপন একটা চুক্তি করার পরপরই। ভদ্রলোক আমাদের প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছিলেন যে তাঁর দ্বারা এমন একটা আর্টিলারি পীস তৈরি করা সম্ভব যার সাহায্যে বসনিয়ার যে-কোন মুসলিম প্রধান এলাকায় কেমিক্যাল শেল ফেলা যাবে।'

'সত্যি কথা বলতে কি, এ-সব শোনার পর সমস্যাটাকে খাটো করে দেখার উপায় নেই,' মন্তব্য করলেন মেলানজিক। 'তবে এ-কথাও ঠিক যে বিপদ সম্পর্কে আগাম খবর পেয়েছি আমরা। আমাদের শক্তিও কম নয়। আমরা বসনিয়া সরকার, ক্রোয়েশীয় সরকার, জাতিসংঘের শান্তি বাহিনী ও মুসলিম বিশ্বের বিরুদ্ধে লড়াই করে টিকে আছি। একটা লোককে ভয় পেয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়।' পালা করে দুই ছেলের দিকে তাকালেন তিনি। 'বাপকে রক্ষা করার দায়িত্ব আমি তোমাদের ওপর ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমাকে যদি রুটিন বদলাতে বলো, আমি মানব না।'

*

আকাশ ছোঁয়া, তুষার ঢাকা আলপ্‌সের চূড়াগুলোর দিকে তাকাল পবন। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল, 'পজিশনটা ঠিক কোথায়? কোনও বিল্ডিঙে?'

'হ্যাঁ, টপফ্লোরে।'

'তাহলে তো আমাদেরকে দেখা যাবে।'

'অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। শহীদ স্কয়ারের চারপাশে তিনশো মিটারের মধ্যে যত বিল্ডিং আছে সবগুলো পুরোপুরি সুরক্ষিত করা হবে। প্রতিটি বিল্ডিঙের ছাদে নির্দিষ্ট সংখ্যক ট্রুপস্ আর পুলিস থাকবে।'

ডেজার্ট হিসেবে ফ্রুট আর ফ্রেশ ক্রীম পরিবেশন করল স্টুয়ার্ড। খেতে শুরু করে পবন বলল, 'ও, আচ্ছা, সেজন্যেই পাঁচশো মিটার দূর থেকে গুলি করতে হবে আমাদের।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ।'

নোটবুক আর পেন্সিল বের করল সেলার্ভিক। 'আগামী কয়েকদিন আপনার গতিবিধি সম্পর্কে জানতে হবে আমাকে,' বাবাকে বলল সে, খসখস করে লিখতে শুরু করল। 'কাল আপনি ক্যাম্পে যাচ্ছেন কখন?'

'ফাইটাররা কখন রওনা হচ্ছে?' গোরাজদিককে প্রশ্ন করলেন মেলানজিক।

'সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা পর,' জবাব দিল বড় ছেলে।

মেলানজিক জানালেন, 'তাহলে সূর্য ডোবার এক ঘণ্টা আগে পৌঁছুলেই চলবে আমার।'

নোট নিয়ে আবার মুখ তুলল সেলার্ভিক। একটা হাত নেড়ে মেলানজিক বললেন, 'আমার পরবর্তী মুভমেন্ট সম্পর্কে খুঁটিনাটি কাল সব বলব আমি।'

আলোচনায় যোগ দিলেন মেলভিক। 'জেনারেল কমান্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আগামী রোববারে, অনুষ্ঠানে আপনি থাকবেন?'

'অবশ্যই থাকব,' জবাব দিলেন মেলানজিক। 'আমি না থাকলে অনুষ্ঠান হয় কি করে!'

পুলম্যান ক্যারিজ-এর স্লীপিং কম্পার্টমেন্টে ফিরে এল রানা ও পবন। পবনের বাঙ্কটা ওপরে। শুলো সে, কিন্তু চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারছে না। 'আপনি জেগে?' নিচু গলায় জানতে চাইল সে।

নিচের বাঙ্ক থেকে রানা বলল, 'হ্যাঁ। কিছু বলবে?'

'আমার ঘুম আসছে না।'

'ধীরে ধীরে অভ্যাস হয়ে যাবে,' বলল রানা। 'আমার তো অন্য যে-কোন জায়গার চেয়ে ট্রেনেই ভাল ঘুম হয়।'

নিস্তব্ধতার ভেতর মৃদু দোল খাচ্ছে ওরা। কিছুক্ষণ পর পবন বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই বিল্ডিংটার ছাদে ওঠার একটা উপায় ভেবে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।'

'নেমে আসার ব্যাপারটা কি হবে? গুলি করার পর?'

'বিল্ডিঙের এক দিকে সরু একটা গলি আছে, খুব একটা ব্যবহার করা হয় না। আমাদের সঙ্গে রশি থাকবে, গুলি করার পর ওটা বেয়ে নেমে আসব, মেনিনো জানিয়েছে, কাজটা তুমি ভালই পারো।'

পবনের মৃদু হাসি শুনতে পেল রানা। তারপর সে বলল, 'চারপাশে হাজার হাজার সিকিউরিটি গার্ড থাকবে...আচ্ছা, তার আগে বলুন, বেলগ্রেডে আমরা ঢুকছি কিভাবে?'

'আমি রওনা হব জাহাজে। ভেনিস থেকে যাব স্প্লিট। তুমি প্যারিস থেকে প্লেনে চড়ে যাবে জাগরেব, ক্রোয়েশীয়ার রাজধানী। ওখানে পৌঁছে ছবি তুলতে তুলতে সীমান্তের দিকে এগোবে। সাবেক যুগোশ্লাভিয়ার সবখানে এখন ফটো-সাংবাদিক গিজগিজ করছে। জাল হলেও তোমার পাসপোর্টে কোন খুঁত নেই। বেলগ্রেডে এখন কয়েকজন ব্রিটিশ এমপি রয়েছেন, সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট স্লোবোদান মিলোসেভিচকে অনুরোধ করছেন তিনি যেন বসনিয়া সার্বদের আলোচনার টেবিলে ফিরে আসতে বাধ্য করেন। প্রায় প্রতিদিনই মীটিং করছেন দু'পক্ষ। সার্বিয়ায় ঢোকার জন্যে তোমার অজুহাত হবে এই মীটিঙের খবর ও ছবি সংগ্রহ করা। বেলগ্রেডে কিছু সময় ঘোরাফেরা করার পর আমাদের হোল-এ আমার সঙ্গে দেখা করবে তুমি।'

আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল, তারপর পবন জিজ্ঞেস করল, 'প্যারিসে কেন যাচ্ছি আমরা?'

'বটলনেক টু-র সঙ্গে দেখা করতে। আরেক জোড়া পাসপোর্ট, অন্যান্য কাগজ-পত্র দেবে সে। বেলগ্রেডের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কেও বলবে আমাদের। কিছু বুলেটও পাব।'

'বুলেট?'

'হ্যাঁ। খুবই স্পেশাল বুলেট। এবার তুমি ঘুমাও।'

প্যারিসের হোটেল ক্রিলন-এ উঠেছে ওরা। এই মুহূর্তে একটা স্যুইটের লাউঞ্জে বসে রয়েছে। বটলনেক টু ওদেরকে পাসপোর্ট, টিকেট ও টাইপ করা অন্যান্য কাগজ-পত্র দিল। সবশেষে পকেট থেকে বের করল কাঠের একটা ছোট বাক্স। বাক্সটা নিয়ে খুলল রানা।

বাক্সের ভেতর খাঁজে সাজানো রয়েছে চারটে বুলেট, মাথাগুলো সিলভার দিয়ে মোড়া, ডগায় ক্রস চিহ্ন খোদাই করা।

রানা ওগুলো পরীক্ষা করছে, বটলনেক টু বলল, 'যত তাড়াতাড়ি ব্যবহার করা হবে তত ভাল রেজাল্ট দেবে ওগুলো।'

অবাক হয়ে তাকাল পবন। 'কি ওগুলো?'

'কি আবার, বুলেট,' ক্ষীণ হেসে বলল রানা। 'মেলানজিকের জন্যে বিশেষ ধরনের বুলেট। পরে আমি ব্যাখ্যা করব।'

*

কোন প্রশ্নই বাদ রাখছে না পবন। সে জিজ্ঞেস করল, 'দূরত্বের ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে, মাসুদ ভাই?'

'মাপা হয়নি, আন্দাজ করা হয়েছে,' জবাব দিল রানা। 'তবে সময়মত পা ফেলে মেপে নেব আমি। নিচের দিকের অ্যাঙ্গেলটাও মাপতে হবে। তারপর রাইফেলের সাইটে চোখ রেখে নিখুঁত হিসেব করা যাবে।'

নিঃশব্দে হেসে পবন বলল, 'ডাংগা জাসতো বসনে।'

রানাও হাসল। পবনকে সে জুনিয়ার লেফটেন্যান্ট ভাবছে না, গ্রহণ করেছে পুরোপুরি একজন পার্টনার হিসেবে।

'ছাদে আমাদের সঙ্গে একটা উইন্ড গজও থাকবে?' জানতে চাইল পবন।

বটলনেক টু মাথা ঝাঁকাল। 'হ্যাঁ। জাসকার থ্রী। এক্সট্রিমলি অ্যাকিউরেট।'

চিন্তা করার সময় মাথাটা নুয়ে পড়ল পবনের, গণেশ থাপার বলা একটা কথা স্মরণ করার চেষ্টা করছে। এক সময় মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। 'তারমানে আমরা সাইলেন্সার ব্যবহার করার কথা ভাবছি।'

'অপটিমাম সিচুয়েশন সেটাই দাবি করে,' ভারি গলায় জবাব দিল রানা।

আরও কিছুক্ষণ চিন্তা করে পবন বলল, 'ক্রস উইন্ড ফ্যাক্টর যদি ফাইভ নটের বেশি হয়, সাইলেন্সার খুলে ফেলতে হবে। তা না হলে পাঁচশো মিটার দূরত্বে ড্রিফট খুব বেশি হয়ে যাবে। দা সাপ্রেসন ফ্যাক্টর ইজ টু গ্রেট।'

বটলনেক টু-র দিকে তাকাল রানা। লোকটা হেসে উঠে বলল, 'আপনার শিষ্য দেখছি সবই জানে।'

হাসল রানাও। 'অন্তত এক্ষেত্রে ও ঠিকই বলছে।'

রাত আটটায় বিদায় নিল বটলনেক টু। যাবার সময় মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করল সে, 'গুড লাক।'

মাঝরাতে জাগরেবের প্লেন ধরতে যেতে হবে পবনকে।

রানা ওকে এয়ারপোর্টে নিয়ে এসে ডিনার খাওয়াল ম্যাক্সিম'স রেস্তোরাঁর একটা শাখায়। জানালার ধারে বসল ওরা, বাইরে রানওয়ে আর ট্যাক্সিওয়েতে দাঁড়ানো প্লেনগুলোকে দেখা যাচ্ছে। খাবার সময় বেশি কথা হলো না, দু'জনেই যে যার চিন্তায় ডুবে আছে। ডিনার শেষ হলো, কফির অর্ডার দিল রানা। 'কাজটা শেষ হলে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব,' বলল ও।

'কোন বন্ধু? মানে, কি রকম বন্ধু?'

'তাঁর স্ত্রী সাউদিয়া একশো তিনে ছিলেন। আমরা কি করতে যাচ্ছি তিনি জানেন। প্রথম থেকেই আমাদেরকে সাহায্য করছেন।' কোন কারণ না থাকলেও একটু বিরতি নিয়ে আবার বলল রানা, 'আমেরিকায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জুডি। ওঁদের কোন সন্তান নেই।'

ডিপারচার লাউঞ্জে পবনের সঙ্গে গেল না রানা। পরস্পরকে বিদায় জানাল ওরা রেস্তোরাঁর বাইরে। হ্যান্ডশেক করল, তারপর পবনের কাঁধে দু'হাত রেখে মাথায়

চুমো খেলো রানা, ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটা ধরল।

রাতে ভাল ঘুম হয়েছে, সকালে শরীরটা খুব তাজা লাগল পবনের। অ্যাশ কালারের সুট পরে বেরিয়ে এল সে, হাতে ক্যামেরা।

কাল দুপুরে বাস ভর্তি একদল সাংবাদিকের সঙ্গে ক্রোয়েশীয় সীমান্ত পেরিয়ে সার্বিয়ায় ঢুকেছে ও। বেলগ্রেড শহরের কিনারায় ব্যারন হোটেলে উঠেছে।

হোটেলের লাউঞ্জে দেশ-বিদেশের ডজন দুই সাংবাদিক ভিড় করেছে, তাদের মধ্যে বিবিসি ও সিএনএন-এর তিন চারজনকে চিনতে পারল পবন, আসার পথে বাসে পরিচয় হয়েছে। ফরাসী ফটো সাংবাদিক তরুণী ওনিদার সঙ্গে চোখাচোখি হলো, হতেই মিষ্টি করে হেসে হাত নাড়ল সে। উত্তরে পবনও হাসল, তবে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে।

খুবই সুন্দরী মেয়ে ওনিদা, বয়েসও খুব বেশি নয়, টেনেটুনে বিশ কি একুশ হবে। কে জানে কেন, বাসে ওঠার পর থেকেই ওর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছে না মেয়েটা। এখনও ওদের মধ্যে কোন কথা হয়নি, শুধু হাসি বিনিময় হয়েছে। পবনের ধারণা, ও প্রথম কথা বলবে সেই আশায় অপেক্ষা করছে ওনিদা। কিন্তু কেন যেন ভয় ভয় করছে পবনের। বিদেশে এই প্রথম একা এসেছে ও, বিপদে পড়তে কতক্ষণ। সর্ব অর্থেই সার্বিয়া তার জন্যে শত্রু এলাকা, কাজেই যতটা সম্ভব সাবধানে থাকতে হবে ওকে।

সকালের প্রথম খবরটাই খারাপ। ব্রিটিশ এমপিরা আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই অকস্মাৎ কাল রাতে ফিরে গেছেন লন্ডনে। টেলিফোন বুদের বাইরে লাইন দিয়েছে সাংবাদিকরা, প্লেনের টিকেট বুক করতে ব্যস্ত সবাই। বেলগ্রেডে থাকার আর কোন মানে হয় না, কারণ এখানে আপাতত কোন খবর সৃষ্টি হতে যাচ্ছে না।

বিপদেই পড়ল পবন। সবাই যদি সার্বিয়া ছেড়ে চলে যায়, ও কোন্ অজুহাতে থাকে? চিন্তা করছে ও, ভাবছে, এক্ষেত্রে রানা হলে কি করত। শরীর খারাপ, এটা একটা অজুহাত হিসেবে চালানো যায়। কিংবা কেউ প্রশ্ন করলে বলা যেতে পারে ওর পত্রিকার হেডঅফিস থেকে পরবর্তী নির্দেশ পাবার অপেক্ষায় আছে ও।

বেলগ্রেডে পৌঁচেছে ঠিকই, কিন্তু নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে হোল-এ হাজির হবার কথা ওর। আগেও নয়, পরেও নয়। কাজেই মাঝখানের সময়টা ওকে একা কোন হোটেলেই থাকতে হবে। একজন ফটোসাংবাদিক হোটেল রূমে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে, ব্যাপারটা সন্দেহজনক। কাজেই বাইরে বেরিয়ে শহরটা দেখা দরকার।

হোটেল থেকে একাই বেরিয়ে পড়ল পবন। মনটা খুশি খুশিই লাগছে, কাছাকাছি মৃত্যুর আশঙ্কা ঝুলতে থাকায় ইচ্ছে হচ্ছে মাঝখানের কয়েকটা দিন ঘুরেফিরে আনন্দে কাটায়।

রাস্তাটার নাম জেনারেল গ্রেচকো স্ট্রীট, ম্যাপে দেখা যাচ্ছে মারটার স্ট্রীট এখান থেকে সাত মাইল দূরে। একটা পার্কের ভেতর দিয়ে হাঁটছে পবন, রাস্তার শেষ মাথায় বিশাল এক ফোয়ারা দেখা যাচ্ছে। 'ও হে, ইয়ংম্যান, দয়া করে একটু আস্তে

হাঁটো না!'

মিষ্টি মেয়েলি কণ্ঠ, ইংরেজিতে কথা বলল। ঘাড় ফেরাতেই মেরুন কেশী ফরাসী সুন্দরীকে চিনতে পারল পবন। কাঁধে ক্যামেরা, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওর দিকেই এগিয়ে আসছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল পবন। কাছে এসে হাসল মেয়েটা। 'সুন্দরী একটা মেয়ের জন্যে বিদেশে কত রকম বিপদই তো ওত পেতে থাকতে পারে, পারে না? শহরটা আমারও খুব দেখার ইচ্ছে, তাই তোমার পিছু নিয়ে বেরিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে পরিচয়ও হবে, একসঙ্গে দু'জনে ঘুরেও বেড়াব। কোন আপত্তি নেই তো?'

আড়ষ্ট হেসে জবাব দিল পবন, 'না-না, আপত্তি করব কেন। এসো।'

'কি নাম তোমার? কোন দেশ থেকে এলে? টিভির, নাকি পত্রিকার প্রতিনিধি?'

'পবন চৌধুরী,' বলল ও। 'আমি ব্রিটিশ, ব্রিটিশ ভারতীয়, ডেলি স্টারে আছি। তুমি?'

'লা বেলা, প্যারিস থেকে বেরায়। আমি ও···'

পবন বলল, 'আমি তোমার নাম জানি, ওনিদা। বাসে এক ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কথা বলার সময় কানে এল।'

পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। ওনিদা জিজ্ঞেস করল, 'এত কম বয়েসে এরকম বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টে পাঠাল তোমাকে ওরা?'

ছ্যাঁৎ করে উঠল পবনের বুক। কি বলতে চায় মেয়েটা? 'বিপজ্জনক মানে?'

'চারদিকে তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে, বিপজ্জনক নয়?'

'ও, আচ্ছা,' বলে জোর করে হাসল পবন। 'আমার বয়েস যদি কম বলো, তোমার বয়েসও এমন বেশি কিছু নয়। আমার একুশ চলছে,' বাড়িয়ে বলল ও।

'আমার তেইশ,' বলল ওনিদা। 'চলো, কোথাও বসে কফি খাওয়া যাক। আজ দুপুরে কিন্তু আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে তুমি। গল্পও করা যাবে। কিছু মনে কোরো না, তোমার সম্পর্কে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে।'

'তাই? আগ্রহের কারণ?'

ওনিদার ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। 'সব আগ্রহের কারণ কি ব্যাখ্যা করা যায়? ভাল কথা, ব্রিটিশ এমপিরা চলে যাওয়ায় সাংবাদিকরা সবাই বেলগ্রেড ত্যাগ করছে, তুমি যাবে না?'

'পত্রিকা থেকে পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় আছি,' জবাব দিল পবন।

'আমিও,' বলল ওনিদা। 'আন্দাজ করতে পারি, তবু জিজ্ঞেস করছি, তুমি তো বিয়ে করোনি, না?'

মাথা নাড়ল পবন। 'তুমি?'

ওনিদাও মাথা নাড়ল। 'বিশ্বাস করবে, আমার এমনকি কোন বয়-ফ্রেন্ডও নেই।'

'কেন নেই? তুমি তো অসম্ভব সুন্দর।'

'সত্যি?' আবার সেই রহস্যময় হাসি ফুটল ওনিদার ঠোঁটে। 'কথাটা আর কেউ বললে কি প্রতিক্রিয়া হত জানি না, কিন্তু তোমার মুখ থেকে শুনে ভাল লাগছে আমার।' পবনের একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিল সে।

কফি হাউসে ঢোকার সময় আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকাল ওরা। এক ঝাঁক ফাইটার প্লেন উড়ে যাচ্ছে এক সারিতে।

দুপুরে এক সঙ্গে লাঞ্চ খেলো ওরা। বিকেলটা হাত ধরাধরি করে শহর দেখে বেড়াল। 'তোমার সঙ্গে সাইট সীইং এত জমবে, আমার ধারণা ছিল না,' এক সময় মন্তব্য করল ওনিদা। 'বলছ এই প্রথম এসেছ বেলগ্রেডে, অথচ দেখা যাচ্ছে এখানের সব কিছু তোমার পরিচিত।'

'যেখানেই যাই, আগে জায়গাটা সম্পর্কে পড়াশোনা করে নিই,' জবাব দিল পবন। অস্বীকার করার উপায় নেই, মিষ্টি-মধুর ব্যবহারে মেয়েটা ধীরে ধীরে মুগ্ধ করে ফেলছে ওকে। তার সঙ্গ দারুণ ভাল লাগতে শুরু করেছে পবনের। ঝোঁকের মাথায় সে প্রস্তাব দিয়ে ফেলল, 'রাতে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খাবে।'

'ধন্যবাদ...না, সত্যি আমি কৃতজ্ঞ,' আন্তরিক সুরে বলল ওনিদা। 'তোমার সঙ্গ সাঙ্ঘাতিক লোভনীয় লাগছে।'

রাতে বিছানায় শুয়ে সারা দিনে কি কি ঘটল স্মরণ করছে পবন। ওনিদা মেয়েটা এত সরল, তার ব্যবহারে এমন জাদু আছে, তাকে সন্দেহ করতে খারাপ লাগছে ওর। বয়েসের পার্থক্য সত্ত্বেও মেয়েটা যে ওকে দেখে মজে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওর নিজেরও ইচ্ছে হচ্ছে হাতে যে সময়টুকু আছে, দু'জন একসঙ্গে আনন্দ-ফুর্তি করে বেড়াতে। কিন্তু...।

চিন্তায় এমন মগ্ন হয়ে ছিল পবন, দরজা খোলা বা বন্ধ হবার আওয়াজ ওর কানেই ঢোকেনি। দেখল ওর দিকে এগিয়ে আসছে ওনিদা, হাতে দুটো বিয়ার।

'সারাদিন হাঁটাহাঁটি করে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,' বলল সে। 'তুমি বললে যে রাতে আর বাইরে বেরুবে না, তাই তোমার জন্যে খানিকটা রিফ্রেশমেন্ট এনেছি।'

এগিয়ে এসে বিছানার কিনারায় বসল ওনিদা।

হঠাৎ করে সাবধান হয়ে গেল পবন। উঠে বসল, সন্দেহে অস্থির হয়ে উঠেছে মন। জীবনে এই প্রথম নিশ্চিত একটা রোমান্টিক সম্পর্ক থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছে ও। মেয়েটাকে ওর অসম্ভব ভাল লেগেছে, কিন্তু মাথার ভেতর একটাই চিন্তা ঝড় তুলছে—ওনিদা নিশ্চয়ই কোন ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট, এবং সম্ভবত ওর প্ল্যান সম্পর্কে অনেক কিছুই জানে। রানার কথা মনে পড়ল ওর। এই পরিস্থিতিতে পড়লে সে কি করত? মনে পড়ল পাখির কথা, শেষবার আলিমুজ্জামন'স-এ ডিনার খেয়েছিল ওরা। পাখি শুধু ওর বোন ছিল না, একমাত্র আপনজন ছিল। আরও মনে পড়ল মা-বাবার কথা। ওকে বাদ দিয়ে গোটা পরিবারটাকেই মেরে ফেলা হয়েছে। ওনিদা মেয়েটা যদি এজেন্ট না-ও হয়, ওর কোন ঝুঁকি নেয়া চলে না। নিজেকে সে স্মরণ করিয়ে দিল, প্রথম কাজ প্রতিশোধ গ্রহণ। আনন্দ-ফুর্তি এই মুহূর্তে ওর জন্যে হারাম। আগে মেলানজিককে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে, তারপর অন্য কথা।

ওনিদার দিকে তাকাল পবন। ওর চোখে বা মুখে কোন ভাব নেই। 'আমার ঘরে এভাবে তোমার আসা উচিত হয়নি,' বলল ও। 'অফিস থেকে নির্দেশ পেয়েছি আমি, কাল চলে যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা হবে না। বিশ্বাস করো, তোমার সঙ্গে সময়টা আমি দারুণ উপভোগ করেছি। তবে না, কোন প্রশ্ন কোরো না।' বিছানা থেকে নামল ও। দরজার কাছে হেঁটে এসে ইঙ্গিত করল।

প্রথমে হতভম্ব দেখাল ওনিদাকে। তারপর রাগ ফুটল চেহারায়। কামরা থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'তুমি সম্ভবত গে!'

দশ

স্প্লিটে জাহাজ থেকে নামার আগে কালো চুল সোনালি করে নিল রানা, নাকের নিচে একজোড়া গোঁফ বসাল। ক্রোয়েটদের সাহায্যে এলাকাটা আবার দখল করে নিয়েছে বসনিয়ার মুসলমানরা, শহরের মাঝখানে তাই আনন্দ-উৎসবে মেতে আছে লোকজন। কিন্তু শহরতলির দিকে পরিবেশ সম্পূর্ণ ভিন্ন। একের পর এক গণকবর পাওয়া যাচ্ছে, খবর পেয়েই ছুটছে সাংবাদিকরা। সার্বরা দীর্ঘদিন শহরটাকে দখল করে রেখেছিল, এলাকার কয়েক হাজার মুসলমান আর ক্রোয়েটকে পাইকারীভাবে খুন করে মাটি চাপা দেয় তারা।

স্প্লিটের সেফ হাউসে একবার ঢুকল রানা, তবে বেশিক্ষণ থাকল না। পাঁচতলা বাড়ির চারতলার একটা ফ্ল্যাট, মেশিনারি, খাবারদাবার সব ঠিকমত রাখা আছে।

রানার সঙ্গে একটা ক্যামেরা রয়েছে, কয়েকটা গণকবরের ছবিও তুলল ও, তবে শহরে রাত কাটাল না। সারায়েভোয় চলে এল ও, পরদিন সকালে রওনা হলো সীমান্তের দিকে। পথে জাতিসংঘের একটা ট্রাক বহর দেখতে পেল ও, সার্বদের দখল করা এলাকায়। মানবিক সাহায্য নিয়ে বেলগ্রেড থেকে সারায়েভোয় যাচ্ছিল কনভয়টা, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপে সার্বিয়া সরকার সীমান্ত পেরুতে বাধা দেয়নি ওদেরকে। কিন্তু সারায়েভোর কাছাকাছি বাধা দিল সার্ব বিদ্রোহীরা, সারায়েভোয় তারা কোনরকম সাহায্য পৌঁছুতে দেবে না। দু'দিন ধরে আটকা পড়ে আছে কনভয়, ইতিমধ্যে অনেক সাংবাদিক জড়ো হয়েছে ছোট্ট শহরটায়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা বাহিনীকে অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহীরা যে-কোন মুহূর্তে কনভয় লুঠ করতে পারে। অগত্যা সিদ্ধান্ত হলো, কনভয় ফিরে যাবে।

জাতিসংঘ বাহিনী পাহারা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কনভয়টাকে, সাংবাদিকরাও অনেকে সঙ্গে থাকছে, তাদের সঙ্গে ভিড়ে গেল রানা। সীমান্ত চৌকিতে ওরও কাগজ-পত্র চেক করা হলো, তবে কোন প্রশ্ন করা হলো না। সার্বিয়ায় ঢুকে একটা রেস্তোরাঁয় বসল রানা, আধ ঘণ্টা পর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত বাসে চড়ে পৌঁছুল রাজধানী বেলগ্রেডে।

সকাল দশটায় পৌঁছুল রানা। সেফ হাউসে ঢোকার আগে মার্শাল টিটো এভিনিউয়ের বিল্ডিংটা রেকি করল। এভিনিউয়ের বাঁকে দাঁড়াল ও, দু'শো গজ দূরে রাস্তাটা ম্লাসোভিচ স্ট্রীটে মিশেছে। পুরানো, দশতলা একটা অফিস বিল্ডিং; নিচ তলায় রেস্তোরাঁ, রেস্তোরাঁর কয়েকটা টেবিল ফুটপাথেও ফেলা হয়েছে। খালি একটা টেবিলে বসে কফি চাইল রানা। বিল্ডিংটার উচ্চতা আন্দাজ করল ও। ওটার ছাদ থেকে নামার জন্যে রশি কিনতে হবে ওকে। রেস্তোরাঁ ও বাইরের রাস্তায় প্রচুর লোকজন। সবাই খুব ব্যস্ত, আড্ডাবাজির সময় নেই কারও। ভিড়ের মধ্যে ইউনিফর্ম পরা পুলিস ও সৈনিকও দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ওপারে সারি সারি সাজানো দোকান। রাস্তায় ট্রাফিকও প্রচুর।

কফি শেষ করে কয়েকশো মিটার হেঁটে বাজার এলাকায় চলে এল রানা, সেফ হাউসটা এখানেই।

বেলগ্রেডের সেফ হাউসটাও এক কামরার অ্যাপার্টমেন্ট, পুরানো একটা বিল্ডিঙের তিনতলায়। ভেতরে ঢুকে প্রথমে ড্রয়ার খুলে মেশিনারি পরীক্ষা করল রানা। সন্তুষ্ট হয়ে কিচেনে চলে এল, আইরিশ স্টু-র একটা ক্যান খুলল, সসপ্যানে গরম করে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে খেলো, মাথার ভেতর চিন্তা চলছে। সব যদি ঠিক থাকে, কাল সকাল ন'টায় পৌঁছে যাবে পবন।

পবন এল পাঁচ মিনিট দেরি করে। নির্দেশ মত ডিম, রুটি, মাখন, সেদ্ধ মুরগী, আলু ইত্যাদি কিনে এনেছে। জিনিসগুলো টেবিলে রাখার পর রানার পা ছুঁয়ে সালাম করতে গেল ও, তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে বুকে টেনে নিল রানা।

খাদ্যবস্তু জায়গা মত রেখে মেশিনারি নিয়ে বসল ওরা, প্রতিটি আইটেম কয়েকবার চেক করল। স্নাইপার রাইফেলটাকে এমন ভঙ্গিতে নাড়াচাড়া করল পবন, ওটা যেন কোন সুন্দরী নারী, গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করল, কাঁধে বাট ঠেকিয়ে ডান গালটা পাশ ঠেকাল কালো স্টকে।

ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা, বিড়বিড় করে বলল, 'দূরত্বটা কম নয়।'

ধীরে ধীরে অস্ত্রটা বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে গম্ভীর হাসল পবন। 'আমি মিস করব না, মাসুদ ভাই। বিশ্বাস করুন।'

মুরগী রোস্ট করে লাঞ্চ সারল ওরা। খেতে বসে পবনকে রানা জিজ্ঞেস করল আসার পথে কিছু ঘটেছে কিনা, যেচে পড়ে কেউ ওর সঙ্গে আলাপ করেছে কিনা। ফরাসী তরুণী ওনিদার কথা বলল পবন, তাকে প্রত্যাখ্যান করার ঘটনাটাও ব্যাখ্যা করল।

রানা যে খুশি হয়েছে সেটা ওর চেহারা দেখেই বোঝা গেল। বলল, 'কাজটা শেষ হলে সাইপ্রাসে ছুটি কাটাব আমরা।'

'সফল হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল পবন।

'ফিফটি-ফিফটি,' রানার জবাবে কোন দ্বিধা নেই। 'এটাকেই আমি ভাল

সম্ভাবনা বলব।'

লাঞ্চের পর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে এল ওরা, আলাদাভাবে। রানা গেল শহীদ স্কয়্যারে। আর পবন গেল মার্শাল টিটো এভিনিউয়ের বিল্ডিংটা দেখতে।

শহীদ স্কয়্যারে পৌঁছে রানা দেখল শ্রমিকরা একটা ডায়াস তৈরিতে ব্যস্ত। বোঝাই যায়, জেনারেল কমান্ডের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে এই ডায়াস তৈরি করা হচ্ছে, অনুষ্ঠানটা এখানেই হবে। মার্শাল টিটো এভিনিউয়ের কোণার বিল্ডিং আর ডায়াসের সঙ্গে সরল একটা রেখা তৈরি করল মনে মনে, রেখাটার ওপর দাঁড়াল, দেখল বিল্ডিংটার শুধু একদিকের খানিকটা কিনারা দেখা যায়। দেখে মনে হলো অনেক দূরে ওটা। তর্জনী ব্যবহার করে বিল্ডিঙের ছাদ ও ডায়াসের অ্যাঙ্গেল-এর রাফ একটা হিসাব নিল ও। বিশ বা পঁচিশ ডিগ্রী হবে বলে মনে হলো। রাইফেল তাক করার সময় এটা কাজে লাগবে।

এই মুহূর্তে বিল্ডিংটার নিচে রেস্তোরাঁয় রয়েছে পবন। কফি শেষ করে শান্ত স্বাভাবিক ভঙ্গিতে হেঁটে চলে এল বিল্ডিঙের ফয়ার-এ। প্রবেশ মুখে পুরানো একটা কাঠের ডেস্ক রয়েছে, বুড়ো এক দারোয়ান বসে সেটার পিছনে। বটলনেক টু ওদেরকে জানিয়েছে, সন্ধে ছ'টার সময় দারোয়ান চলে যায়। সদর দরজায় তালা দেয়ার কোন মানে হয় না, কারণ রেস্তোরাঁ থেকে বিল্ডিঙের ফয়ার-এ আসা-যাওয়া করার একটা পথ আছে। দরজার উল্টোদিকে একটা লিফট, লিফটের ডান দিকে সিঁড়ি। বিল্ডিঙের মাথার দিকেও একটা দরজা আছে, তালা দেয়া হয় না, ওটা দিয়ে ছাদে যাওয়া যায়। বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে শহীদ স্কয়ারে চলে এল পবন। রানা ইতিমধ্যে ডায়াস থেকে সেফ হাউসের দূরত্ব মাপার জন্যে ওখান থেকে রওনা হয়ে গেছে। ওর হিসেবে দাঁড়াল পাঁচশো বিশ মিটার। মার্শাল টিটো এভিনিউয়ের বিল্ডিং আর ডায়াসের মাঝখানে একটা সরল রেখা কল্পনা করে দূরত্বটা পবনও আন্দাজ করে নিল। ওরও মনে হলো, অনেকটা দূরে। এভিনিউয়ের বিল্ডিঙের সামনে আবার ফিরে এল ও, ওখান থেকে সেফ হাউসের দূরত্বটা পা ফেলে মাপল। পাঁচশো মিটারের কিছু বেশি, হাঁটতে সময় লাগল ছ'মিনিট।

এরইমধ্যে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এসেছে রানা। বিকেলটা ওরা কাটাল প্রসিডিউর, কোডওয়ার্ড, বিকল্প ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে।

রাতে স্টেক, ভাত আর সবজি রান্না করল পবন। আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টায় নিরেট কিছু খাবার সুযোগ পাবে না ওরা।

পরদিন অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরুল না ওরা, মাঝে মধ্যে পানি ছাড়া আর কিছু খেলো না। সন্ধে সাতটায় লম্বা ক্যানভাস ব্যাগটায় ইকুইপমেন্ট ভরা হলো। প্রথমে বিছানার ওপর সাজানো হলো সব কিছু, খুঁটিয়ে চেক করা হলো। একজোড়া স্নাইপার রাইফেল, টেলিস্কোপিক সাইট ও সাইলেন্সার সহ; জেসকার উইন্ড গজ, চল্লিশ মিটার লম্বা এক প্রস্থ রশি, গ্লুকোজ মেশানো পানির বোতল, এক শিশি ডেক্সাড্রিন ট্যাবলেট, ঘুম তাড়াতে সাহায্য করবে; পাইরন ট্যাবলেটের আরেকটা শিশি. খেতে হবে গুলি করার আগে, ফলে শান্ত থাকবে নার্ভ, হাত কাঁপবে না।

বিভিন্ন সাইজের কালো রাবারের গোঁজ, একজোড়া উলেন চাদর, একজোড়া ছোট কিন্তু শক্তিশালী বিনকিউলার, কালো দুটো সোয়েটার, সুতী একজোড়া কালো দস্তানা, ছোট দুটো টর্চ, আটটা স্পেয়ার ব্যাটারি, বারো ফুটি চৌকো ক্যামোফ্লেজ ক্যানভাস, কাঠের ছোট বাক্সে ভরা বিশেষ বুলেট চারটেও থাকল। কাপড়চোপড়ের ওপর ওভারকোট পরে থাকবে ওরা, ভেতরে লুকানো থাকবে হ্যান্ড গান আর রশির কয়েল।

দশটা বাজার পর আলাদাভাবে বেরিয়ে এল ওরা। প্রথমে বেরুল রানা। দরজা খোলার আগে পবনকে আলিঙ্গন করল ও, বলল, 'যাই ঘটুক না কেন, পবন, মনে রাখবে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তুমি আমার ছোট ভাই।'

'আপনি আমার জন্যে দোয়া করবেন, মাসুদ ভাই। দোয়া করবেন আমি যেন আপনার সম্মান রাখতে পারি।'

পরিচ্ছন্ন আকাশ। বিল্ডিঙের নিচে রেস্তোরাঁয় বসে কফি খাচ্ছে রানা। বসেছে দরজার কাছাকাছি।

যানবাহনের ফাঁক দিয়ে রাস্তার ওপারে পবনকে দেখতে পেল ও, ছোট একটা কাফের বাইরে একা একটা টেবিলে বসে আছে, ক্যানভাস ব্যাগটা পায়ের কাছে।

রেস্তোরাঁয় বেশ ভিড়। ভাল ঠাণ্ডা পড়েছে, ফলে খদ্দেররা অনেকেই ওভারকোট পরে আছে। ট্রুপস ভর্তি খোলা একটা ট্রাক চলে গেল রানার সামনে দিয়ে। রাস্তার ওপার দিয়ে অলস ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে এক পুলিস, হোলস্টারে ভরা হ্যান্ড-গান রয়েছে ডান নিতম্বে। রানা তাকিয়ে আছে বিল্ডিংটার মেইন এন্ট্রান্স-এর দিকে। গত আধ ঘণ্টায় বেশ কয়েকজন লোক বেরিয়ে এসেছে। আরও এক কাপ কফির অর্ডার দিয়ে আস্তে-ধীরে চুমুক দিচ্ছে ও। অবশেষে বাঁ হাত তুলে বার কয়েক কপাল থেকে চুল সরাল। ব্যাগটা হাতে নিয়ে পবনকে উঠে দাঁড়াতে দেখল ও। ট্রাফিকের ফাঁক-ফোকর গলে রাস্তা পেরুল পবন। রানার দিকে একবারও না তাকিয়ে রেস্তোরাঁর ভেতর ঢুকে সাইড এন্ট্রান্স দিয়ে বেরিয়ে গেল।

পাঁচ মিনিট পর সিঁড়ি বেয়ে বিল্ডিংটার দশতলায় উঠতে শুরু করল রানা। ছাদের সিঁড়িতে, দরজার সামনে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল পবন, পায়ের কাছে ক্যানভাস ব্যাগ, ডান হাতে কোল্ট নাইনটিন হানড্রেড ইলেভেন, সাইলেন্সার সহ। ওভারকোটের বোতাম খুলে ওই একই অস্ত্র রানাও হাতে নিল। তারপর পবনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল ও।

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল পবন। মাথা নিচু করে ছাদে চলে এল রানা, হাতের পিস্তল সামনে ধরা। দ্রুত চোখ বুলিয়ে ছাদটা দেখে নিল প্রথমে। বাঁ দিকে কংক্রিটের একটা ঘর, ভেতরে লিফটের মেশিনারি আছে। পাশেই গোলাকার ওয়াটার ট্যাংক। ছাদের চারদিকের কিনারায় চোখ বুলাল ও। আশপাশে এটার চেয়ে উঁচু আর কোন বিল্ডিং নেই। অন্তত তিনশো মিটারের মধ্যে থেকে ওদেরকে কেউ দেখতে পাবে না। পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে ইঙ্গিত দিল রানা। পবনও মাথা নিচু

করে ছাদে চলে এল, হাতে ব্যাগ। দরজা বন্ধ করল ও, ব্যাগ খুলে কালো রাবার গোঁজ বের করল। তৃতীয় গোঁজটা ফিট করল, হাতের তালু দিয়ে ঠুকে দরজার তলায় আটকে দিল শক্ত ভাবে।

প্রস্তুতি নিতে সময় লাগল তিন মিনিট। প্রথমে কালো চাদর দুটো ছাদের কিনারায় পাশাপাশি বিছাল, তারপর স্নাইপার রাইফেল ও অন্যান্য ইকুইপমেন্টের প্যাকেট খুলল। ওভারকোট খুলে ফেলল, হ্যান্ড-গান বের করে চাদরের ওপর স্নাইপার রাইফেলের পাশে রেখে দিল। এরপর কোমর থেকে খুলল রশির কুণ্ডলী, হেঁটে চলে এল বিল্ডিঙের পিছন দিকে, উঁকি দিয়ে নিচের অন্ধকার গলিতে তাকাল। নিচু পাঁচিলের গোড়ায় পানির পাইপ রয়েছে, রশির একটা প্রান্ত শক্ত করে বাঁধল তাতে, বাকি রশি আবার সযত্নে কুণ্ডলী পাকিয়ে রেখে দিল ছাদের কিনারায়। কাজ শেষ করে ফিরে এল ফায়ারিং পজিশনে।

চাদরের ওপর পেট দিয়ে শুয়ে থাকল ওরা, গায়ে টেনে নিল ক্যামোফ্লেজ ক্যানভাস। বালি রঙা ছাদের সঙ্গে ওটার রঙ একদম মিলে গেছে। রোলেক্স পকেট ঘড়ি বের করে চোখের সামনে ধরল রানা, দশটা বেজে পঞ্চান্ন মিনিট হয়েছে। নিজের রাইফেলটা তুলে নিয়ে ক্যানভাসের আবরণ খানিকটা সরাল গা থেকে, তারপর এভিনিউয়ের দিকে তাকাল টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে।

ডায়াসটা পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। কমবেশি চল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওই ডায়াসে এসে দাঁড়াবেন মেলানজিক। 'চার দিকটা ভাল করে একবার দেখে নাও,' পবনকে বলল ও। 'তারপর আমরা ডাংগা জাসতো বসনে হয়ে যাব।'

রঙচঙে পোশাকের ওপর দুর্বলতা আছে মেলানজিক বেলোভিচের। ইটালিয়ান সুট আর রঙিন স্পোর্টস শার্ট তাঁর প্রিয় পোশাক। তবে আজকের অনুষ্ঠানের জন্যে রঙচটা কমব্যাট ইউনিফর্ম পরেছেন তিনি।

একটা জীপে চড়ে হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুলেন তিনি, ছোটছেলে সেলার্ভিককে নিয়ে বসেছেন পিছনের সীটে। ড্রাইভারের পাশে বসেছে সশস্ত্র একজন অভিজ্ঞ ফাইটার। তাঁর জীপের দু'পাশে রয়েছে আরও দুটো জীপ, দুটোতেই গিজগিজ করছে বডিগার্ড। শহীদ স্কয়্যারের কাছাকাছি আসার পর দেখা গেল রাস্তার দু'ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পুলিস আর সৈনিক। আশপাশের প্রায় প্রতিটি ছাদে একজন করে শার্প-শূটারকে দেখতে পেলেন তিনি। সার্বিয়া সরকার তাঁর নিরাপত্তার আয়োজনে কোন ত্রুটি রাখেনি।

প্রতি বছরের মত এবারও সার্বিয়ার প্রেসিডেন্ট শুভেচ্ছা জানিয়ে বাণী পাঠাবেন, রাজনৈতিক কারণে তিনি নিজে আসবেন না।

স্কয়্যারে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন কর্নেল পেত্রোভিচ। পরস্পরকে স্যালুট করলেন ওঁরা, তারপর আলিঙ্গন। ধাপ বেয়ে ডায়াসে উঠলেন এক সঙ্গে, পিছু পিছু এল সেলার্ভিক। আগে থেকেই ডায়াসে বারোজন লোক রয়েছে, সবার পরনে ইউনিফর্ম, সবাই তারা সার্ব বিদ্রোহীদের বিভিন্ন গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছে। মেলানজিককে তারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে অভ্যর্থনা জানাল। মাত্র তিন দিন আগে

জেনারেল কমান্ডের চারজন ফাইটার সারায়েভোয় ঢুকে প্রেসিডেন্ট আলিয়া ইজাতবেগোভিচকে খুন করার চেষ্টা চালায়। প্রেসিডেন্টের তিনজন বডিগার্ডকে মারতে পারলেও, প্রেসিডেন্ট অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পান। পরে বডিগার্ডরা ওদের চারজনকেই গুলি করে মেরে ফেলে।

সরে গিয়ে মেলানজিক, সেলার্ভিক আর কর্নেল পেত্রোভিচকে জায়গা ছেড়ে দিল ওরা।

প্রায় পাঁচশো বিশ মিটার দূরে, জেসকার উইন্ড গজ ধরা রানার হাত ক্যামোফ্লেজ ক্যানভাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। কাঁটা স্থির হয়ে আছে নাইন নট-এর ঘরে। ক্যানভাসের তলায় গজটা রেখে দিল ও, তারপর দু'জনেই স্নাইপার রাইফেল থেকে প্যাঁচ ঘুরিয়ে সাইলেন্সার খুলল। নড়াচড়া না করে অনেকক্ষণ শুয়ে থাকায় আড়ষ্ট হয়ে গেছে শরীর। দিনের বেলা বেশ কয়েকবার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে সামরিক হেলিকপ্টার, বিশেষ করে গত দু'ঘণ্টায়। প্রথম দিন দু'জনেই ট্রাউজারে প্রস্রাব করেছে। দ্বিতীয় বিকেলে রানার একটা পা ক্র্যাম্পে আক্রান্ত হয়। ব্যথায় জান বেরিয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল।

'এসো, সাইটে চোখ রেখে দেখা যাক,' ফিসফিস করল রানা।

ক্যানভাসের তলা থেকে রাইফেলের ব্যারেল একটু একটু করে বেরিয়ে এল, সঙ্গে স্কোপ। শহীদ স্কয়ারের ওপর চোখ বুলাল ওরা। কয়েক সেকেন্ড পর আবার ফিসফিস করল রানা, 'মাঝখানে রয়েছেন। দেখতে পাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। তাঁর মাথা আমার ক্রস সাইটে।'

'ও.কে.,' বলল রানা। 'এখন আমরা সাইট অ্যাডজাস্ট করব—বাঁ দিক থেকে নাইন-মিটার ক্রস উইন্ড। পাঁচশো বিশ মিটার, সঙ্গে ধরো সাতাশ ডিগ্রী ডিপ্রেশন...'

দু'জনেই ওরা সাইটের হুইল ঘোরাল। রানা বলল, 'তুমি আগে গুলি করবে। ঠিক তারপরই করব আমি।'

'মাথা, নাকি বুক?' ফিসফিস করল পবন।

'কোনটাই না। যে পজিশনে দাঁড়িয়ে আছেন, গুলি করো ডান কাঁধে...ডান নিপলের ছয় ইঞ্চি ওপরে।'

মাথাটা ঘুরিয়ে রানার দিকে অবাক হয়ে তাকাল পবন। 'কাঁধে? কিন্তু কেন? আমরা ওঁকে খুন করতে আসিনি?'

খুব নিচু কঠিন সুরে জবাব দিল রানা। 'যা বলছি করো। গুলি করবে ডান কাঁধে।'

'কেন?'

'কারণ জানতে চেয়ো না। পরে আমি ব্যাখ্যা করব। গুলি করবে ডান কাঁধে। অনুষ্ঠান শুরু না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। নিজেদের ইউনিটকে স্যালুট করবেন উনি। ঠিক তখনই গুলি করতে হবে। আবার বলছি, ডান কাঁধে। ঠিক আছে, পবন?'

নির্দেশ মেনে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল পবন। 'ঠিক আছে, মাসুদ ভাই। আপনি যা বলেন।'

ডায়াসের পঞ্চাশ গজ সামনে বিদ্রোহী সার্বদের জাতীয় সঙ্গীত বাজাচ্ছে ওদের এয়ারফোর্স-এর ব্যান্ডপার্টি। একটা হেলিকপ্টার মাথার ওপর চলে আসছে দেখে রানা ও পবন নিজেদের রাইফেল ক্যানভাসের ভেতর লুকিয়ে ফেলল। আওয়াজটা দূরে মিলিয়ে যেতে আবার বেরিয়ে এল ব্যারেল দুটো। শহীদ স্কয়্যারে ডায়াসের সামনে মার্চ পাস্ট শুরু করল ফাইটারদের সারি, নাৎসী বাহিনীর মত রাইফেল ঠেকিয়ে রেখেছে কাঁধে, মুখে শ্লোগান। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল সার্ব বিদ্রোহীদের বিভিন্ন গ্রুপের সদস্য ওরা, জেনারেল কমান্ড-এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশের জন্যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে।

বসনিয়া জেনারেল কমান্ডের কলাম এগিয়ে আসতেই শিরদাঁড়া খাড়া করলেন মেলানজিক বেলোভিচ, চেহারায় ফুটে উঠল গর্ব ও প্রশংসা। হাত বাড়িয়ে সামান্য একটু সাইট অ্যাডজাস্ট করল পবন, আর তারপরই ক্রস হেয়ার মেলানজিকের বুকের সঙ্গে এক লাইনে আনল। এই সময় আবার শোনা গেল হেলিকপ্টারের আওয়াজ, এদিকেই আসছে।

'ডু ইট!' হিসহিস করল রানা। 'দেরি করো না! হেলিকপ্টারের কথা ভুলে যাও···ডান কাঁধে।'

হেলিকপ্টার মাথার ওপর চলে এল, ব্লেডগুলো বাতাসে আলোড়ন তুলছে।

'ওটা সরাসরি মাথার ওপর,' যান্ত্রিক গুঞ্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার কণ্ঠ, 'কাজেই আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছে না···ডান কাঁধ।'

খুবই ধীরে ধীরে সাইটের ক্রস হেয়ার মেলানজিকের ডান কাঁধে নিয়ে এল পবন। বড় করে শ্বাস টানল ও। অনুভব করল হেলিকপ্টারের বাতাস ওর মাথার চুল এলোমেলো করে দিচ্ছে। ওর মনে কোন চিন্তার লেশ মাত্র নেই। রাইফেলটা শরীরেরই একটা অংশ হাত, পা, মস্তিষ্ক বা হৃৎপিণ্ড।

জেনারেল কমাণ্ড-এর কনটিনজেন্ট ডায়াসের সামনে পৌঁছুল। নেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের সময় তাদের চোখে শ্রদ্ধা ও গর্ব ফুটে উঠেছে। মেলানজিকের ঠোঁটে প্রশংসার হাসি, স্যালুট করার জন্যে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ডান হাত তুললেন তিনি।

আদর করার ভঙ্গিতে পবনের আঙুল চাপ দিল ট্রিগারে। আধ সেকেন্ড পর রানার আঙুলও ঠিক তাই করল।

পবনের বুলেট টার্গেট পেয়ে গেল। ঘুরে আড়াআড়ি হয়ে গেলেন মেলানজিক, কাত হয়ে পড়লেন একদিকে। রানার বুলেট তাঁর ইউনিফর্মের আস্তিনে প্রবেশ করল।

পরবর্তী তিন সেকেন্ড স্কোপে চোখ রেখে লোকজনের আতঙ্কিত ছুটোছুটি দেখল ওরা। তারপর রানা বলল, 'লেট'স গো।'

সব জিনিস ওখানে ফেলেই রশির দিকে ছুটল ওরা। বাঁক ঘুরে দ্রুত শহীদ

স্কয়্যারের দিকে ছুটে যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

দেয়ালের গা বেয়ে নেমে এল ওরা, বগলের নিচে রশি। রাস্তার কাছাকাছি এসে প্রথম ভুলটা করল পবন, উত্তেজনার কারণে নামার গতি হঠাৎ খুব বাড়িয়ে দিল। কংক্রিটের মেঝেতে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেলো ও, নিচে নেমেছে শুধু বাম পায়ে। শরীরের নিচে মুচড়ে গেল গোড়ালি।

রানা অনায়াস ভঙ্গিতে দু'পায়ে নামল। অন্ধকার গলিতে পাশ থেকে কাতর শব্দ ঢুকল ওর কানে। গ্রাহ্য করল না, প্রথমে পিস্তল বের করে গলির শেষ মাথায় অর্থাৎ মেইন রোডের দিকে তাকাল। হেলিকপ্টার ফিরে এসেছে মাথার ওপর। গলির ভেতর কেউ নেই।

পবনের ওপর ঝুঁকল রানা। 'ভেঙেছে নাকি?'

'মনে হয় না··· বোধহয় শুধু মচকে গেছে।'

'হাঁটতে পারবে?'

চেষ্টা করে দাঁড়াল পবন, মেঝেতে পা ফেলে পরীক্ষা করল। 'পারব, ধীরে ধীরে।'

দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল রানা। 'তুমি আগে যাও। মেইন রোডে থাকবে, হাঁটবে স্কয়্যারের দিকে। কৌতূহলী মানুষের ভিড়টাকে অনুসরণ করবে। তারপর একসময় সুয়োগ বুঝে তোমার বাম দিকের স্লাইড রোডে ঢুকবে, ফিরে যাবে সেফ হাউসে। আমি তোমার পঞ্চাশ মিটার পিছনে থাকব···যদি দেখো বিপদে পড়তে যাচ্ছ, আমার দিকে ঘুরে যাবে।' ওর গলা কঠিন ও নিচু। 'ওরা আমাদেরকে জীবিত ধরবে না। যদি সেরকম দেখি তাহলে প্রথমে তোমাকে গুলি করব···তারপর নিজেকে···যাও।'

একটাও কথা না বলে গলি ধরে এগোল পবন।

মেইন রোডে চলে এল ও, সাইরেন বাজিয়ে সামনে দিয়ে ছুটে গেল কয়েকটা পুলিস কার। স্রোতের মত ছুটছে মানুষ শহীদ স্কয়্যারের দিকে। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল পবন। রানা ওকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করছে। পিস্তলটা এই মুহূর্তে ওর বাম বগলের নিচে, ওভারকোটের ভেতর।

পবনকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে একটা সাইড স্ট্রীটে ঢুকতে দেখল ও। ভিড় ঠেলে এগোল, তারপর নিজেও ঢুকে পড়ল একই সাইড স্ট্রীটে।

পবন দাঁড়িয়ে আছে তিনজন প্যারামিলিটারীর সামনে। একজন চিৎকার করছে। তিনজনের হাতেই পিস্তল।

রানা দেখল, অসুস্থতার ভান করে পড়ে যাচ্ছে পবন। ডান হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেল, ঠেকল কংক্রিটে, এই ফাঁকে ওভারকোটের ভেতর থেকে হাতে চলে এসেছে হ্যান্ড-গান। সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে গুলি করল ও, আধ সেকেন্ডের মধ্যেই তার পাশের লোকটাকে। বুলেটের ধাক্কায় লোক দু'জন পিছিয়ে যাচ্ছে, ডান দিকের তৃতীয় লোকটা পবনকে গুলি করল।

পিছনে চিৎকার দিল এক মহিলা, সেদিকে কান না দিয়ে পিস্তল বের করেই তৃতীয় লোকটার মুখে গুলি করল রানা।

কাত হয়ে পড়ে রয়েছে পবন। নড়ছে ও, চেষ্টা করছে উঠে বসার। খানিক

দূরে, রাস্তার উল্টোদিকে, এক প্রৌঢ় লোক তার ফিয়াট থেকে অর্ধেকটা বেরিয়ে এসে ইতস্তত করছে। ছুটে এসে তার মাথায় পিস্তল চেপে ধরল রানা। 'চাবি!' সার্বো-ক্রোট ভাষায় হিসহিস করে বলল ও। আতঙ্কিত লোকটা ড্যাশবোর্ডের দিকে ইঙ্গিত করল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে তাকে বাইরে বের করল রানা, খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'বাঁচতে চাইলে পালাও!'

খিঁচে দৌড় দিল লোকটা।

ঘুরল রানা। পবন দাঁড়াতে পেরেছে। বাঁ হাত দিয়ে ডান কাঁধটা খামচে ধরে আছে ও। প্যারামিলিটারীদের একজন ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করছে দেখে তার বুকে গুলি করল রানা। একটা গড়ান দিয়ে স্থির হয়ে গেল শরীরটা। সাইরেনের আওয়াজে কান পাতা দায় হয়ে উঠেছে। টলতে টলতে গাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে পবন। প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলল রানা, তারপর ছুটে এসে দু'হাত দিয়ে ধরে বুকে তুলে নিল ওকে, নামাল গাড়ির সীটে। পাঁচ সেকেন্ড পর রাস্তা ধরে ছুটল ফিয়াট।

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা, সামনে থেকে ছুটে আসা একটা ট্রাককে কোন রকমে এড়াল।

'ডান কাঁধে··· কিংবা ঠিক একটু নিচে।'

বাম দিকে বাঁক নিল রানা, তারপর ডান দিকে। গতি কমাতে বাধ্য হলো ও। দেখে মনে হচ্ছে সমস্ত ট্রাফিক উল্টোদিকে যাচ্ছে।

'পানির মত সহজ,' বলল ও। 'সেফ হাউস থেকে একশো মিটার দূরে নামিয়ে দেব তোমাকে। ওখানে তোমাকে পৌঁছুতে হবে নিজের চেষ্টায়। গাড়িটাকে অন্তত মাইলখানেক দূরে ছেড়ে আসতে হবে, কাজেই ফিরতে খানিক দেরি হবে আমার, আদৌ যদি ফিরতে পারি। তুমি যদি সেফ হাউসে পৌঁছুতে পারো, খানিকটা কাপড় ভাঁজ করে ক্ষতটায় চেপে রেখো। আমি যদি এক ঘণ্টার মধ্যে না ফিরি···গুলি কোরো নিজেকে। সার্বিয়ান টরচার চেম্বারে বেঁচে থাকার চেয়ে এই মৃত্যু অনেক ভাল।'

অন্ধকার মত এক কোণে গাড়ি থামাল রানা। ফুটপাথে লোক কম এদিকটায়। পরপর দুটো লাইটপোস্টে আলো জ্বলছে না। উইন্ডস্ক্রীন দিয়ে সামনেটা দেখাল ও। 'ওদিকে··· তোমাকে বাম দিকে ঘুরে যেতে হবে।' হাত বাড়িয়ে খুলে দিল দরজা। 'যাও, গেট গোইং।'

যন্ত্রণায় কাতর একটা শব্দ করল পবন, মাথা নিচু করে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে ফিয়াট ছেড়ে দিল রানা।

এগারো

সেফ হাউসে পৌঁছুতে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল রানার। বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকতেই

কাঠের মেঝেতে দু'এক ফোঁটা রক্তের দাগ চোখে পড়ল—শুধু মেঝেতে নয়, সিঁড়ির ধাপেও। রুমাল বের করে যতটা সম্ভব মুছল ও।

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর রক্তের ফোঁটা অনেক বেশি, চলে গেছে বেডরুমের দিকে। বেডরুমের দরজা খোলা। দুর্বল একটা গলা ভেসে এল, 'মাসুদ ভাই?'

'হ্যাঁ, আমি।'

বেডরুমের দরজা থেকে পবনের দিকে তাকাল রানা। বিছানায় শুয়ে আছে ও, পিস্তলটা উঁচু করা বাম হাতে। হাতটা ধীরে ধীরে বিছানায় নামাল ও, তারপর আবার ডান কাঁধে জড়ানো তোয়ালেটা চেপে ধরল। ওর চোখে ব্যথা লক্ষ করল রানা। 'তোমাকে কেউ আসতে দেখেছে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'মনে হয় না।'

'অপেক্ষা করো।' কিচেনে চলে এল রানা। চুলোয় পানি বসিয়ে একটা কিচেন সিজার তুলে নিল হাতে।

বেডরুমে ফিরে এসে বিছানার কিনারায় বসল ও, পবনের ওভারকোট আর ভেতরের শার্ট কেটে ফেলল। সাবধানে ক্ষতটা পরীক্ষা করল রানা। আকারে ওটা ছোট, এখনও রক্ত বেরচ্ছে অল্প। বুলেট ঢুকেছে ঠিক কলার-বোনের নিচে। হাড়টার ওপর খানিক চাপ দিতেই খুব জোরে শ্বাস টানল পবন, আর কোন শব্দ করল না। গম্ভীর হেসে রানা বলল, 'ক্ষতটা একটু বড় করতে হবে। একটু ব্যথা পাবে।'

পবনের ঘাড়ের পিছনে হাত রেখে সামনের দিকে টানল রানা। আবার সশব্দে শ্বাস টানল পবন। ডান হাত দিয়ে পবনের ডান দিকের শোল্ডার ব্লেডে চাপ দিল রানা, আপন মনে কি যেন বলল, তারপর ধীরে ধীরে পবনের মাথাটা নামিয়ে রাখল বালিশে।

'ভাল, আবার খারাপও,' বলল ও। 'বুলেট বড় কোন শিরা বা বড় কোন হাড় ছোঁয়নি...কিন্তু ব্যাটা বেরিয়েও যায়নি। কাঁধের পেশীতে ঢুকে বসে আছে। দেখা যাক কিভাবে বের করা যায়।'

কিচেনে ফিরে রানা দেখল সসপ্যানে পানি ফুটছে। কাবার্ড থেকে মেডিসিন বক্সটা বের করল ও, খুলে ভেতরে কি কি আছে দেখে নিল। এরপর একটা দেরাজ খুলে বিভিন্ন আকারের ছুরির ওপর চোখ বুলাল। লম্বা ও সরু একটা বেছে নিয়ে সসপ্যানে ফেলল, তারপর মেডিসিন বক্স নিয়ে ফিরে এল বেডরুমে।

ব্যথায় কাতর পবন চোখ তুলে তাকাল।

'তোমার ভাগ্য ভাল,' বলল রানা। 'আঘাতটা মারাত্মক হতে পারত, তুমি সঙ্গে সঙ্গে মারাও যেতে পারতে। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, মরফিন আছে। তবে দুঃখের বিষয় স্ক্যালপেল নেই।'

'না থাকায়...?'

'না থাকায় কিচেন নাইফ দিয়ে অপারেশন করতে হবে আমাকে। মরফিন সাহায্য করবে, তবু ব্যথাটা টের পাবে তুমি।'

'এই জায়গা ছেড়ে সরে না যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হয় না?' জিজ্ঞেস করল পবন। 'কোন ডাক্তার না পাওয়া পর্যন্ত শুধু ব্যান্ডেজ করে রাখলে চলে না?'

বিছানার কিনারায় বসে মাথা নাড়ল রানা। 'পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত, অর্থাৎ এক হপ্তা এখানে থাকতে হবে আমাদের। অতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বুলেটটা এখুনি বের করতে হবে।'

'এ-ধরনের কাজ আগে আপনি কখনও করেছেন?' জানতে চাইল পবন।

'বহুবার,' সহাস্যে বলল রানা। 'আমাকে তুমি এক্সপার্ট হাতুড়ে বলতে পারো।'

ক্ষতটা বড় করে বুলেট বের করতে পনেরো মিনিট লাগল রানার। দু'আঙুলে সেটা ধরে বলল, 'ভাগ্য ভাল যে এটা স্রেফ সেভেন এমএম। আরও বড় কিছু হলে তোমার কাঁধ বলে কিছু থাকত না।'

পেইন কিলার ইঞ্জেকশন দেয়া সত্ত্বেও ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল পবন, মনে হলো জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। বুলেট বের করার পর ক্ষতটা ধু'লো রানা, ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পবনের মুখ মুছে দিল, তারপর ওকে তুলে পাশের বিছানায় শোয়াল। আরেকটা মরফিন ইঞ্জেকশন দেয়ার পর ঘুমিয়ে পড়ল পবন।

সারা রাত জেগে বসে থাকল রানা, খানিক পরপর ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে দিল পবনের মুখ। চেনে না, জানে না, বোঝে না, অথচ মানে—এরকম একজন সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা জানাল ও।

প্রশ্নটা দু'দিন পর উঠল। বিছানায় বসে মগ ভর্তি ভেজিটেবল সুপ খাচ্ছে পবন, জানতে চাইল, 'তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? মেলানজিক বেলোভিচকে গুলি করেছি আমি, গুলি করেছি তাঁর কাঁধে। জানা কথা তিনি মারা যাননি, প্রমাণ কাঁধে গুলি খেয়ে আমিও বেঁচে আছি।'

'ব্যাপারটা আমি পরে বলব। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে।'

'পরে মানে কত পরে?'

'এখানে থেকে চলে যাবার পর।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'প্রথমে সারায়েভোয়, স্প্লিটে, ওখান থেকে সাইপ্রাসে। তোমাকে একজন ভাল ডাক্তার পরীক্ষা করবেন। তারপর যাব স্টেটস-এ, ডেভিড ক্রিস্টোফারের সঙ্গে দেখা হওয়া দরকার।'

রানার পায়ের কাছে গরম রোদে শুয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে ডোবারম্যান। সুইমিং পুলের ধারে বসে আছে ওরা, হাতে কফির কাপ।

'সব মিলিয়ে আমি বলব, চমৎকার হয়েছে,' রানাকে বললেন সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার। 'বেজন্মাটা অন্তত ভয় কাকে বলে টের পেয়েছে। বুঝতে পেরেছে বিপদ তারও নাগাল পেতে পারে।' রানার সামনে বসেছেন তিনি, পবন বসেছে তাঁর ডান পাশে।

'ব্যাপারটা শুধুই চমৎকার হয়নি, তারচেয়েও বেশি কিছু,' বলল রানা, হাত

নামিয়ে ডোবারম্যানের কান চুলকাল। 'আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট সফল হয়েছি।'

সিনেটরকে হতভম্ব দেখাল। 'কিন্তু আমি তো সিআইএ-র রিপোর্ট দেখলাম। হ্যাঁ, গুলি তাকে লেগেছে, কিন্তু মারা যায়নি—যদিও ডানহাতটা আর কোনদিন ব্যবহার করতে পারবে না। এটাকে আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট সাফল্য বলবেন?'

পবনের দিকে তাকাল রানা, ওর ডান হাত বুকের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। 'মেলানজিকের শুধু হাতে আঘাত লাগেনি,' বলল ও। 'আঘাত গোটা শরীরে লেগেছে।'

'গোটা শরীরে?'

সামনের দিকে ঝুঁকল রানা। 'হ্যাঁ, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে, নার্ভে, ব্রেনে,' বলল ও। 'পবনের গুলিটা কোন সাধারণ বুলেট ছিল না। আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম, মেলানজিক সহজে মারা যাবেন না।'

'বুলেটটা···কি ছিল?' সিনেটর জানতে চাইলেন।

'প্রথম কথা, ওটা ছিল একটা ডামডাম,' জবাব দিল রানা। 'এর মানে হলো, সংঘর্ষের মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়, সেজন্যেই তাঁর হাতটা চিরকালের জন্যে ধ্বংস হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কথা হলো, বুলেটের ভেতর বিষ ছিল—নামটা এত জটিল যে মনে রাখা কঠিন। ওটার সংক্ষিপ্ত নামটাই পরিচিতি পেয়েছে—টিটিকে। এই মুহূর্তে বিষটা মেলানজিকের রক্তস্রোতে মিশে রয়েছে। টিটিকে ছাড়াও ছিল কিছু রোগ-জীবাণু।'

নিস্তব্ধতা নেমে এল, আগের মতই ডোবারম্যানের কান চুলকাচ্ছে রানা। খানিক পর শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর, 'কি কাজ ওটার···মানে,ওই জীবাণু আর বিষের?'

'প্রথমে মনে হবে গুরুতর সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া হয়েছে,' জবাব দিল রানা। 'রক্ত বিষটা বয়ে নিয়ে যাবে মস্তিষ্কে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে জড় পদার্থ বানিয়ে ফেলবে ওটা। নার্ভ বলতে কিচ্ছু থাকবে না। এটাই পরে মৃত্যুর কারণ হবে, কিন্তু সেটা ঘটতে কয়েক মাস কিংবা এমনকি কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। তবে এইডসের জীবাণু কাজ করবে সেই সঙ্গে। আর দু'হপ্তা, তারপর শুরু হবে নরক যন্ত্রণা, টেরোরিস্ট অ্যাটাক-এর কোন প্ল্যান আর করতে পারবেন না, ব্যস্ত থাকবেন এমন একটা রোগ সামলাতে, যার কোনও চিকিৎসা নেই।'

সুন্দরী এক তরুণী এসে সিনেটরকে বলল, 'টেবিলে লাঞ্চ দেয়া হবে আধ ঘণ্টা পর।'

তার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে হাসলেন সিনেটর। মেয়েটা চলে যেতে রানাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেলানজিক জানে?'

উত্তর দিল পবন, 'হ্যাঁ, জানেন। তাঁর ডাক্তাররা ধরতে ভুল করতে পারে ভেবে সাইপ্রাস থেকে আমরা একটা পোস্টকার্ড পাঠিয়েছি তাঁকে, তাতে বলা হয়েছে রক্তটা যেন খুব ভালভাবে পরীক্ষা করা হয়।'

তরুণ পবনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন সিনেটর। তাঁর দৃষ্টি একইভাবে ফিরিয়ে দিল সে। রানার দিকে তাকাবার জন্যে মাথা ঘোরালেন সিনেটর। রানাও তাঁর দৃষ্টি অপলক ফিরিয়ে দিল। রানা সম্পর্কে লী আলেকজান্ডারের একটা মন্তব্য মনে পড়ে গেল তাঁর।

একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো ডোবারম্যান। রানা ওটার পেট চুলকাল। তারপর বলল, 'পোস্টকার্ডে আমরা সই করেছি—সাউদিয়া একশো তিন।'

কথা না বলে পুলের ওপারে তাকালেন সিনেটর।

শান্ত সুরে রানা জিজ্ঞেস করল, 'প্রতিশোধ নেয়ার পর আপনি কি বিবেকের দংশন অনুভব করছেন, সিনেটর?'

মাথা নাড়লেন সিনেটর। 'না। আমি জুডির কথা ভাবছিলাম···সে হয়তো অপরাধ বোধ করত।'

রানা কিছু বলল না।

কাঁধ ঝাঁকালেন সিনেটর, আবার মাথা নাড়লেন। 'না। এটা তার প্রাপ্য ছিল। তা এখন আপনারা কি করতে যাচ্ছেন? মানে, আরও কিছু করার আছে নাকি?'

'পবন বাংলাদেশে যাচ্ছে,' বলল রানা। 'ট্রেনিং নিতে। আমি···আমার কোন ঠিক নেই। দিন দুই ইংল্যান্ডে থাকতে হতে পারে, তারপর অন্য কোন কাজে লেগে যাব—কোথায়, লেগে বলতে পারি না।'

'কেন যেন মনে হচ্ছে, আপনাদের জন্যে আমার কিছু করা দরকার,' বললেন সিনেটর। 'না-না, আমি কোন রকম সাহায্যের প্রস্তাব দিচ্ছি না। শুধু বলতে চাইছি, আমি কি আপনাদের কোন কাজে লাগতে পারি?'

'পারেন,' বলল রানা। 'ছ'মাস বা এক বছর পর আমেরিকায় আসবে পবন। দুনিয়াদারি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকা দরকার ওর। সমাজের ওপর মহলের আদব-কায়দা শেখা দরকার।'

পবন বলল, 'আদব-কায়দা আমি ভালই জানি।'

ওর দিকে তাকাল রানা। 'তুমি কি জানো একশো লোকের একটা ফরমাল ডিনারে তোমার ব্যবহার কি রকম হবে? জানো কোন নাইফ বা ফর্ক ব্যবহার করা যাবে? কখন কথা বলা দরকার, কখনোই বা চুপ থাকতে হয়?'

চুপ মেরে গেল পবন।

সিনেটর হাসলেন। 'নো প্রবলেম,' বললেন তিনি। 'পবন এখানে আমার সঙ্গে থাকতে পারে। ওকে আমি আমার ডানার তলায় ঠাঁই দেব, পরিচয় করিয়ে দেব সবার সঙ্গে—এখানে, ওয়াশিংটনেও। একজন এইড হিসেবে আমার সঙ্গে বেড়াবে ও। এমনকি বিদেশেও যাবে। দুনিয়ার নামকরা, গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা করবে ও। ভাল কনসার্টে যাবে, থিয়েটার দেখবে। আমি এমনকি কিছু সুন্দরী মেয়ের সঙ্গেও ওর পরিচয় করিয়ে দেব!'

লাজুক হাসি ফুটল পবনের ঠোঁটে।

'যেদিন তুমি পৌঁছুবে, তার পরদিন আমি একটা পার্টি দেব,' বললেন সিনেটর। 'এ-বাড়িতে বহুদিন হলো কোন পার্টি হয় না। ভাবছি একটা জাজ ব্যান্ড ভাড়া

করব। আর চিন্তা কোরো না, আমাদের কালোরাডোয় তোমার বয়েসী সব মেয়েই আশ্চর্য সুন্দরী।' রানার দিকে ফিরলেন তিনি। 'জানেন, মি. রানা, পবনের মত আমার একজন দরকারও। জুডি ছিল, নিঃসঙ্গতা কাকে বলে বুঝিনি। এই বয়েসে···তাছাড়া, জুডির জায়গায় আর কাউকে আমি ভাবতে পারি না। তবে যদি একটা সন্তান থাকত, আর কোন চিন্তা ছিল না। ঈশ্বর যখন তা দেননি, কি আর করা। কিন্তু ভাবছি, কারও যদি কোন আপত্তি না থাকে,পবনকে আমার দত্তক নিতে অসুবিধে কোথায়?'

'কোন অসুবিধে আছে বলে তো মনে হয় না আমার,' জবাব দিল রানা। 'তবে এ-প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা হবার আগে, একটা কথা। আপনি পার্টির যে বর্ণনা দিলেন, পবনকে বাংলাদেশে রেখে আমি নিজেই হয়তো চলে আসতে পারি।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন সিনেটর ডেভিড ক্রিস্টোফার। 'আপনিও আমন্ত্রিত, মি. রানা। আপনি যখনই এ-বাড়িতে আসবেন, নিজেকে আমি সম্মানিত মনে করব।'

ভেড়ার পশম কাটার মউশুম চলছে। গরম বিছানায় স্ত্রীর পাশে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছেন জো ফ্রেজার। সারাদিন খুব ধকল গেছে, ভয়ানক ক্লান্ত তিনি।

ভোরের কিছু আগে কুকুরগুলো ডাকাডাকি শুরু করল বাইরে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই ঘুম ভেঙে গেল। আড়ষ্ট হাত-পা নাড়লেন ফ্রেজার, ক্লান্ত সুরে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

'চিন্তা কোরো না,' তাঁর স্ত্রী বললেন! 'কিছু না, সম্ভবত শিয়াল। কুকুরগুলোই খেদিয়ে দেবে।'

কুকুরের ডাক দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। পাশ ফিরলেন কৃষক ফ্রেজার, আবার ঘুমাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঘুম আর তাঁর এল না। এক সময় ঘুমাবার চেষ্টা বাদ দিয়ে বিছানা ছাড়লেন তিনি, কাপড় চোপড় পরে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

কুকুরগুলো এখন আর ডাকছে না। তবে শেষ দিকে মাঠের যে প্রান্তে ওদের ডাক শোনা গেছে আস্তে-ধীরে সেদিকে এগোলেন তিনি। পুব দিকের আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে, তবে সূর্য এখনও পাহাড়ের আড়ালে। পাহাড়টাকে জড়িয়ে রেখেছে হালকা সাদাটে কুয়াশা। শিশির ভেজা ঘাসে এরইমধ্যে কয়েকটা ভেড়াকে দেখলেন তিনি, মায়ের ফুলে থাকা স্তনে মুখ লাগিয়ে দুধ খাচ্ছে। তাঁর কুকুর তিনটে ছুটে এল, ঘন ঘন লেজ নাড়ছে। ওগুলোর একটা, নাম সিলভিয়া, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল, গুড়ি মেরে লক্ষ করছে তাঁকে। ভঙ্গিটা চিনতে পারলেন ফ্রেজার, একটু পা চালিয়ে এগোলেন ওটার দিকে। ঘুরল সিলভিয়া, হাঁটতে শুরু করল। ফ্রেজার পিছু নিলেন।

একটা ঝোপের সামনে এসে দাঁড়াল সিলভিয়া। এগিয়ে এসে ঝোপটার ভেতর উঁকি দিলেন ফ্রেজার। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন।

লাল ও সাদা এক গুচ্ছ গোলাপ। ঘাসের ওপর যত্ন করে সাজানো। জায়গাটা ফ্রেজার চিনতে পারলেন। ফুলগুলো পড়ে আছে ঠিক যেখানে তিনি লাল জ্যাম্পসুট

পরা ছোট্ট মেয়েটাকে পেয়েছিলেন।

চারদিকে তাকালেন তিনি। আশপাশে কেউ নেই। শুধু কয়েকটা ভেড়া আর কুকুর তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে।

ছোট্ট মেয়েটার কথা মনে পড়ল তাঁর। ওর নাম ছিল বৃষ্টি। মনে পড়ল সেই অদ্ভুত মানুষটার কথা, যিনি মেয়েটাকে কোথায় পাওয়া গেছে দেখতে এসেছিলেন। তাঁর ভেড়া হতাহত হওয়ায় সহানুভূতি জানিয়েছিলেন।

***

মাসুদ রানা

সাউদিয়া একশো তিন

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সে আর সবার মত নয়।
লাশ দুটো দেখার সময় তার
চেহারায় কোন ভাব থাকল না। প্রথমে দশ বছরের
মেয়েটাকে দেখল সে, গায়ে একটা আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত
নেই। এরপর সরে এসে তরুণীর লাশটা দেখল।
চাদরের নিচে লাশের গায়ে কিছু নেই। সারা শরীর
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে।

ডাক্তার বিড়বিড় করে বললেন, 'ব্যাপারটা খুব তাড়াতাড়ি
ঘটে গেছে, স্যার। কেউই খুব বেশিক্ষণ কষ্ট পায়নি।'
পরে ডাক্তার চিন্তা করলেন, লোকটাকে তিনি
'স্যার' বললেন কেন?
কাউকে স্যার বলা তাঁর স্বভাব নয়।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০